শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের

করকমলে

। সঙ্গীতবিষয়ে লেখকের অন্য দুটি গ্রন্থ ।

বিষ্ণুপুর ঘরানা

সঙ্গীতসাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত কল্পতরু

নিবেদন

আগেকার আমলের সঙ্গীতজ্ঞদের বিষয়ে এই সব লেখা ইংরিজী সাহিত্যের annals & anecdotes ধরনের রচনা। সেই সঙ্গে, শিল্পীদের সঙ্গীতজীবনের তথ্য যা পাওয়া গেছে তাও দেওয়া হয়েছে। কারণ, শুধু anecdotes-এ মন ভরে না। আমাদের দেশের বেশির ভাগ সঙ্গীত-গুণীরাই তো বিস্মৃতির অতলে বিরাজ করছেন, শিক্ষিত সমাজে তাঁদের পরিচয় প্রায় অজ্ঞাত। বাংলা সাহিত্যও এ যাবৎ তাঁদের দিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত করে নি। অনেক কিছুই লুপ্ত হয়ে গেছে। এখনো সচেষ্ট হলে এই অতীত সম্পদের কিছু রক্ষা পেতে পারে—এই ধারণা থেকে তাঁদের সঙ্গীতকৃতির পরিচয় উদ্ধার করবার প্রেরণা পেয়েছি।

বইয়ের অধ্যায় ভাগ করা হয়েছে আসরের নায়ক নায়িকাদের জীবনকাল অনুসারে, আঠারো শতকের মাঝামাঝি থেকে আরম্ভ করে বিশ শতকের প্রথমে এই সব শিল্পীদের জন্ম। ঘটনাস্থল বেশির ভাগ বাংলাদেশ, পশ্চিম অঞ্চলের কয়েকটি সঙ্গীতকেন্দ্র ও সেখানকার কয়েকজন সঙ্গীতজ্ঞদের কথাও আছে।

অনেকদিন ধরে অনেকের কাছ থেকে এইসব বিবরণ সংগ্রহ করতে হয়েছে। তবে একথা বলা দরকার যে, যাঁদের কাছে anecdotes পেয়েছি, শিল্পীদের জীবনী বা অন্যান্য তথ্য সব সময় তাঁরা দেননি। এসব আমি নানা সূত্রে পেয়েছি, দীর্ঘদিন এই কাজে নিযুক্ত থাকার জন্যে। সন্, তারিখ ও ইতিহাসের অন্যান্য মালমসলা যথাকাজে ব্যবহার করে, নানা আসরের এই সব বিচিত্র কাহিনী—গালগল্প নয়, সত্য ঘটনা—সংকলন করবার কথা আমার মনে হয়। এসবও তো সাঙ্গীতিক ইতিহাসের অতি মূল্যবান উপকরণ। উপরন্তু, বিস্মৃত শিল্পীদের জীবন্ত স্মৃতি, জীবনের আবেদনে ভরা অত্যন্ত আকর্ষক সব আসরের কথা। যা কিছু পেয়েছি, সবই যে সরল বিশ্বাসে প্রকাশ করেছি, তা নয়। যথা সম্ভব অন্যান্য সূত্রের সঙ্গে মিলিয়ে বিচার বিবেচনা করে দেখেছি। নির্বাচন যেমন করেছি, তেমনি বর্জনও করেছি কয়েকটি আসরের গল্প। এইসব বিবরণ কিভাবে পেয়েছি তা অনেক আসরের বর্ণনায় উপস্থিত ব্যক্তিদের নাম থেকে বোঝা যাবে। তা ছাড়া বিধুভূষণ দত্ত, মোহিনীমোহন মিশ্র, কুমুদেশ্বর মুখোপাধ্যায়, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বিনোদ মল্লিক, ডঃ কে. ভট্টাচার্য, শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির কাছেও অনেক কথা

জেনেছি। তাঁরা সকলেই স্বর্গত। কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁদের সহযোগিতার কথা স্মরণ করি। সেই সঙ্গে যতীন্দ্রকুমার সেন (চিত্রশিল্পী), যতীন্দ্রচরণ গুহ (মল্লবীর গোবরবাবু), হৃষীকেশ বিশ্বাস, রাইচাঁদ বড়াল, বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, বিভূতিভূষণ ঘোষ, হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিকেও কৃতজ্ঞতা জানাই নানা বিবরণ দিয়ে সাহায্য করার জন্যে। সঙ্গীতপ্রেমী মন্মথনাথ ঘোষ তাঁর পিতৃদেবের সংগৃহীত চিত্রশালা থেকে পাঁচটি চিত্র এই পুস্তকে মুদ্রণের জন্যে কপি করতে দিয়েছেন, তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। পান্নাময়ীর মাতৃকুলের যে ভদ্রলোক গায়িকার ও তাঁর জননীর জীবনের অপ্রকাশিত অধ্যায় আমায় জানিয়েছিলেন, স্বাভাবিক কারণেই তাঁর নাম গোপন রাখতে হল।

প্রবাসী পত্রিকায় এই লেখা ধারাবাহিক প্রকাশিত হবার সময়ে শ্রদ্ধেয় অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ডঃ কালিদাস নাগ, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, সুধীর-কুমার চৌধুরী, ডঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় (রাঁচি থেকে পত্র লিখে), অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (কথাসাহিত্য পত্রিকার একাধিক সংখ্যায়) প্রভৃতি গুণীজন বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন। এই অবকাশে তাঁদের প্রতি অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

অনেক দুষ্প্রাপ্য ছবিসমেত বইখানিকে বহুব্যয়ে ও সযত্নে 'মিত্র ও ঘোষ' মহাশয়েরা প্রকাশ করলেন, তাঁদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ।

ললিত নিলয়
৩৯ একবালপুর রোড, কলিকাতা ২৩

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

বিষয়-সূচী

গুরু-শিষ্য সংবাদ

এ আবার কেমন তীর্থযাত্রী দল ?

মাথায় পাগড়ি, পোশাক-আশাক আর চেহারা দেখে তো মনে হয়, পশ্চিম থেকে আসছে। কিন্তু সঙ্গে এমন সব বাজনার যন্ত্রপাতি কেন ? বীণা, তম্বুরা, মৃদঙ্গ—এসব নিয়ে তীর্থযাত্রা করা তো বড় একটা দেখা যায় না।

বরাবর পুরী পর্যন্ত চলে গেছে বিষ্ণুপুরের প্রাচীন রাজপথ। তার আধুনিক নাম হয়েছে অহল্যাবাঈ রোড। সেই পথে দেখা গেল ওই নতুন ধরনের যাত্রীদল। বিষ্ণুপুরের লোকেরা তাই কৌতূহলী হয়ে দেখছে আর নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে।

পশ্চিম থেকে তীর্থযাত্রীর দল প্রায়ই এখানে আসতে দেখা যায়। এই পথ বরাবর চলে গেছে দক্ষিণে—উড়িষ্যায়, শ্রীক্ষেত্র পুরীতে। তাই এই পথে এত যাত্রীদের আসা-যাওয়া। সেকালের পথঘাট কিছুই নিরাপদ নয়। দস্যুর ভয় পদে পদে। তাই প্রকাণ্ড এক-একটি দল করে তবে যাত্রীরা দূর তীর্থের পথে যাত্রা করত। আর পশ্চিম অঞ্চল থেকে পুরী যেতে গেলে বিষ্ণুপুর রাজ্যের এই অহল্যাবাঈ পথটি না হলে চলত না।

তাই এ পথে তীর্থযাত্রীদের আনাগোনা কিছু নতুন নয়। আর বিষ্ণুপুরবাসীরা যাত্রীদের বড় বড় দল দেখে আর তেমন কৌতূহলও বোধ করে না। কিন্তু এই দলটি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ওই সব বাজনার জন্যে। এত বাজনার সরঞ্জাম নিয়ে কোন দলকে তীর্থে যেতে দেখা যায় না।

বিষ্ণুপুরের লোকদের মুখে মুখে ছড়িয়ে কথাটা বিষ্ণুপুররাজের কানে গেল। বিষ্ণুপুরের রাজা তখন চৈতন্য সিংহ, দ্বিতীয় রঘুনাথের পৌত্র। সময়টা হল ১৭৮১ কি ১৭৮২ খ্রীঃ। চৈতন্য সিংহের তখন বড় দুরবস্থা। রাজ্যের গৌরব তখন আর কিছু নেই, রাজা রঘুনাথের সঙ্গেই ৭০ বছর আগে সব চলে গেছে। প্রথমে মারাঠা বর্গীদের আক্রমণে, তার পর ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বিষ্ণুপুরের ধ্বংস হতে আর বিশেষ বাকী নেই। রাজা চৈতন্য সিংহ ৭ হাজার টাকায় বিষ্ণুপুরের দেবতা মদনমোহনের বিগ্রহ বন্ধক রেখেছেন বাগবাজারের গোকুল মিত্রের কাছে। এ সেই সময়ের কথা।—

চৈতন্য সিংহের আর বিষ্ণুপুর রাজ্যের তখন অনেক কিছু গেছে বটে।

কিন্তু একটি জিনিস তখনও যায় নি। তাঁর সঙ্গীতপ্রেম ও বিষ্ণুপুর রাজাদের বংশগত সঙ্গীতপ্রেম।

চৈতন্য সিংহ লোকমুখে সংবাদ পেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, পশ্চিম অঞ্চল থেকে কোন সঙ্গীতাচার্য সদলে পুরীতীর্থে চলেছেন তাঁর রাজ্যের মধ্যে দিয়ে।

তাঁর রাজ্যের মধ্যে দিয়ে একজন বড় সঙ্গীতজ্ঞ চলে যাবেন, আর তিনি তাঁকে এমনি যেতে দেবেন, অভ্যর্থনা করে রাজসভায় আনবেন না, তাঁর সঙ্গীত শোনবার সুযোগ পাবেন না—তাও কি হয়?

তিনি একজন কর্মচারী পাঠালেন সেই দলটির কাছে। সে উপস্থিত হয়ে তীর্থযাত্রীদের রাজসভায় উপস্থিত হবার জন্যে রাজার অনুরোধ ও আমন্ত্রণ জানালে।

দলের এক প্রবীণ ব্যক্তি বললেন—আমরা এখন বহুদূর যাব। পথের মধ্যে অযথা বিলম্ব করবার আমাদের ইচ্ছা নেই।

তখন রাজকর্মচারী তাঁকে নিবেদন করলে—কিন্তু আপনারা রাজার আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করলে তিনি বড দুঃখিত হবেন। আপনাদের মধ্যে সঙ্গীতজ্ঞ আছেন শুনে তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন রাজসভায় যেতে। বিষ্ণুপুর রাজ্যের মধ্যে দিয়ে একদল সঙ্গীতজ্ঞ চলে যাবেন, একবার রাজদরবারে আসবেন না—তা হলে মহারাজা মনে কষ্ট পাবেন।

অগত্যা সেই প্রবীণ ব্যক্তিটি সদলে রাজা চৈতন্য সিংহের সমীপে এলেন। রাজা তাঁদের অভ্যর্থনা করলেন রাজসভায়। তারপর আলাপ-পরিচয়ে জানতে পারলেন যে সেই দলে এক সঙ্গীতাচার্য আছেন, তিনি শিষ্য ও পরিজনবর্গ নিয়ে পুরীতীর্থে চলেছেন। তিনি আসছেন সুদূর পশ্চিম থেকে। আগ্রা আর মথুরার কাছাকাছি অঞ্চলে তাঁর বাস।

শুনে চৈতন্য সিংহ বললেন—আপনি আমার রাজ্যে অতিথি। আমার বিশেষ ইচ্ছা, বিষ্ণুপুরে আপনি কিছুদিন অবস্থান করুন। আপনার সঙ্গীত শোনবার জন্যে আমি উৎসুক হয়েছি এবং এ রাজ্যে সঙ্গীতের গুণগ্রাহী আরও অনেক আছেন। আপনি আমাদের বঞ্চিত করবেন না।

তখন সেই প্রবীণ সঙ্গীতজ্ঞ সবিনয়ে বললেন—কিন্তু মহারাজ, আমি পুরুষোত্তমকে সঙ্গীত শোনাবার সংকল্প করে বেরিয়েছি। এখন যাত্রাভঙ্গ করতে পারব না। যদি অনুমতি করেন, তীর্থশেষে ফেরার পথে আপনার সভায় উপস্থিত হব।

চৈতন্য সিংহ তারপর তাঁকে বাস করবার জন্যে আর পীড়াপীড়ি না করে শুধু বললেন—বেশ তাই হবে। আপনি তীর্থযাত্রা সম্পূর্ণ করে এখানে আসবেন। কিন্তু আমার একটি অনুরোধ—অন্তত আজ আপনি এই আসরে আমাদের পরিতৃপ্ত করুন।

রাজার শেষ কথায় আর সেই সঙ্গীতজ্ঞ আপত্তি করলেন না। তিনি সম্মত হলেন গান গাইতে।

রাজ্যের ও রাজসভার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংবাদ দিয়ে আনান হল। তারপর যথা সময়ে পশ্চিমের সেই গুণী গায়ক তাঁর সঙ্গীত পরিবেশন করলেন।

সঙ্গীত-সাধকের গান শুনে সভার সকলেই তৃপ্ত হলেন। রাজা তাঁকে বিশেষ সাধুবাদ জানালেন। তাঁর কথার প্রতিধ্বনি করলেন মুগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলী। পশ্চিমের সেই সঙ্গীতাচার্য যে একজন বড় গুণী একথা সকলেই বুঝতে পারলেন। ধন্য ধন্য শব্দে সভা মুখরিত হল।

সেই আসরের একজন বিশিষ্ট শ্রোতা হলেন—পণ্ডিত গদাধর ভট্টাচার্য। বিষ্ণুপুর-রাজের সভাপণ্ডিত। সংস্কৃতে পাণ্ডিত্যের জন্যে বিষ্ণুপুরে সকলের মাননীয় তিনি। তাঁর সঙ্গে পুত্র রামশঙ্করও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ২০।২১ বছরের তরুণ রামশঙ্কর সংস্কৃতচর্চায় পিতার যোগ্য শিষ্য এবং উদীয়মান পণ্ডিত। এ যাবৎ তিনি কেবল শাস্ত্রচর্চাই করেছেন, সঙ্গীত নয়। সঙ্গীতের প্রতি যে তাঁর আকর্ষণ আছে, একথা আগে কোনদিন জানা যায় নি।

কিন্তু সেই গুণীর গান শুনে তাঁর মধ্যে এক অপূর্ব রূপান্তর ঘটল। সেই অপরূপ সঙ্গীতমাধুর্য তাঁর জীবনে এক সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা হয়ে দেখা দিলে। এমন এক বিচিত্র আনন্দ তিনি অনুভব করলেন, যা তার আগে কখনও হয় নি।

পণ্ডিতজী—রামশঙ্কর সেই গুণীকে পণ্ডিতজী বলে পরে উল্লেখ করতেন—সেদিনের গানের পর সদলে চলে গেলেন পুরীর পথে। যাবার আগে বিষ্ণুপুর-রাজকে কথা দিলেন যে, ফেরার পথে তাঁর আতিথ্য স্বীকার করে যাবেন।

তিনি চলে গেলেন, কিন্তু রামশঙ্করের মনে যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলেন, অনির্বাণ রয়ে গেল তার শিখা। পণ্ডিতজীর সেই সুর-মাধুর্যে রামশঙ্করের সঙ্গীত-সত্তার জন্ম হল। এক অভূতপূর্ব উদ্দীপনার মধ্যে তিনি সঙ্গীতের প্রেরণা লাভ করলেন মনে। সে এক অনির্বচনীয় পুলক। তাঁর সমস্ত অন্তর সেই সুরের মোহিনী মায়ায় বিহ্বল হয়ে উঠল। এমন এক রসের আবেদনে তাঁর মন-প্রাণ ঝঙ্কৃত হল, যার স্বাদ তিনি আগে কখনও পান নি। তাঁর অন্তরাত্মা মুখর হল সেই স্বরলহরীর তরঙ্গে তরঙ্গে। যা ছিল তাঁর

মনের অতলে সুপ্ত, সেই গায়কের স্বরধারার মায়াপরশে তার নব জাগরণ হল। তিনি খুঁজে পেলেন তাঁর জীবনের অর্থ। তাঁর পরম পথ।

সঙ্গীতের আকর্ষণ তাঁর জীবনে দুর্নিবার হয়ে উঠল। পশ্চিমের সেই গুণীর কণ্ঠে শোনা গান রামশঙ্কর সযত্নে মনের মধ্যে লালন করতে লাগলেন। নিভৃতে গুঞ্জন করতে লাগলেন সকলের অগোচরে। আর পণ্ডিতজীর আশাপথ চেয়ে তাঁর দিন কাটতে লাগল। কিন্তু বাইরে থেকে তাঁর মনের নতুন গতির সন্ধান কেউ পেলে না। কারণ, তাঁকে প্রকাশ্যে গান গাইতে কেউ শোনে নি কখনও।

তীর্থ পরিক্রমার শেষে পণ্ডিতজী একসময়ে ফিরে এলেন বিষ্ণুপুরে। তারপর আবার রাজা চৈতন্য সিংহের অনুরোধে তাঁর গানের আসর বসল। এবারেও অনেকে এলেন তাঁর গান শোনবার জন্যে। কারণ, তাঁর সেই প্রথমবারের গানের জন্যে তিনি বিষ্ণুপুরে খ্যাতিমান হয়েছিলেন। তাঁর গানের প্রশংসা মুখে মুখে ছড়িয়েছিল।

এবারকার আসরেও নিমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত হন রাজার সভাপণ্ডিত গদাধর ভট্টাচার্য। তাঁর সঙ্গে রামশঙ্করও আসেন।

সভা তখন পূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিশিষ্ট শ্রোতারা সকলে গায়কের সামনে উপস্থিত। খানিক পরেই গান আরম্ভ হবার কথা।

গদাধর পণ্ডিতজীর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় প্রসঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। আর আসরে সবাই অপেক্ষা করছেন, কখন তাঁর গান আরম্ভ হবে।

এমন সময় রামশঙ্কর তাঁর পিতার কাছে এক অদ্ভুত প্রস্তাব করলেন।

গদাধরকে তিনি জনান্তিকে বললেন—আমি এই আসরে গান গাইব। আপনি মহারাজা এবং পণ্ডিতজীর অনুমতি প্রার্থনা করুন, যেন আমায় গাইতে দেওয়া হয়।

পুত্রের কথা শুনে গদাধর বিস্ময়ে প্রায় হতবাক্। যে রামশঙ্করকে তিনি কোনদিন গান গাইতে শোনেন নি, সে গান করতে পারে এমন কথাও কেউ কখনও তাঁকে বলে নি—সে আজ এই রাজসভায় এত লোকের সামনে, পশ্চিমের এত বড একজন গায়কের সামনে গাইবে কি!

রামশঙ্করের কথায় তিনি একেবারে কান দিলেন না। পুত্রকে জানালেন যে, রাজার কাছে এমন উদ্ভট প্রস্তাব করতে পারবেন না তিনি। সে আবার কবে গান শিখলে?

কিন্তু রামশঙ্কর নিরস্ত হবার পাত্র নন। পণ্ডিতজীর সামনেই তিনি গান

করবার সংকল্প নিয়ে এসেছেন এবং সেজন্যে তিনি প্রস্তুত। নিজের অন্তর থেকেই এমন শক্তি তিনি লাভ করেছেন, যা তাঁকে তাঁরই আদর্শ গায়কের সামনে গাইবার প্রেরণা আর সাহস দিয়েছে।

তিনি আবার বিনীতভাবে পিতাকে বললেন—আমাকে গাইবার অনুমতি দিন, আমি এখানে গাইব। আপনি দেখুন, আমি গান গাইতে পারি কি না।

—তুমি কখনও গান কর নি! কি করে এমন প্রকাশ্য আসরে গান গাইবে? না, রাজার কাছে আমি এ অনুরোধ জানিয়ে অপদস্থ হতে পারব না।

রামশঙ্কর সবিনয় কিন্তু সবিশেষ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আবার বললেন—আমি পারব। আপনি শুধু আমার গাইবার অনুমতির ব্যবস্থা করে দিন। আপনাকে অপদস্থ হতে হবে না।

শেষ পর্যন্ত সম্মত হতে হল গদাধরকে। তিনি রামশঙ্করকে গান গাইবার জন্যে রাজার অনুমতি নিয়ে দিলেন।

পুত্রকে গাইবার সম্মতি তিনি দিলেন বটে, কিন্তু তার কথার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারলেন না। রামশঙ্করের গান আরম্ভ হবার আগেই তিনি সভা ত্যাগ করে গেলেন। কারণ, তাঁর দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে, সভায় গান করতে গিয়ে পুত্র হাস্যাস্পদ হবে এবং সেখানে তাঁর থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। তাকে যখন গাইতে নিরস্ত করা যাবে না, তখন সভায় না থাকাই শ্রেয়। পুত্রের সঙ্গীত-ক্ষমতার ওপর তিনি কিছুতেই ভরসা করতে পারলেন না।

রামশঙ্কর কিন্তু তাঁর সংকল্পে অটল রইলেন। পিতা চলে গেলেও তিনি মোটেই ভয় পেলেন না।

তারপর যথাসময়ে তাঁর গানের পালা এল।

শ্রোতাদের বিস্মিত করে দিয়ে গান আরম্ভ করলেন রামশঙ্কর। স্থির আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ধীর মধুর কণ্ঠে তিনি গাইতে লাগলেন সার্থকতার পরম আনন্দে।

যে-গান তিনি সেবার সেই পশ্চিমা গুণীর মুখে শুনে অভিভূত হয়েছিলেন, যে-গান তিনি এতদিন সাধনা করে এসেছেন সকলের অগোচরে—সেই গান তিনি শোনাতে লাগলেন। নিজের প্রাণের এক বিচিত্র অনুভবে পূর্ণ হয়ে তদ্‌গত চিত্তে সেই সঙ্গীতাচার্যকে তাঁরই সঙ্গীত নিবেদন করলেন। যেন অন্তর থেকে উৎসারিত সুরের নৈবেদ্য অঞ্জলি ভরে সঁপে দিলেন তাঁর চরণে। আর সেই বিদেশী গুণী বিস্মিত পুলকে তাঁর নিজেরই ঘরানা গান এই অপরিচিত তরুণের কণ্ঠে শুনতে লাগলেন।

রামশঙ্করের গান যখন শেষ হল, শ্রোতৃমণ্ডলী তৃপ্ত হলেন তাঁর সুমিষ্ট ও সুরেলা কণ্ঠে। বিষ্ণুপুরের শ্রোতারা সকলেই তাঁর পরিচিত। তাঁদের বিস্ময়ের সীমা রইল না এই দেখে যে, রামশঙ্কর এমন সুন্দর গান গাইতে পারেন।

রামশঙ্করের সুখ্যাতিতে সভাস্থল পূর্ণ হল। সেই তাঁর প্রথম আসরে গান গাওয়া এবং সেই দিন থেকেই তিনি বিষ্ণুপুরে প্রসিদ্ধ হলেন গায়করূপে।

সেই আসরে তাঁর গান শুনে বোধ হয় সবচেয়ে মুগ্ধ হলেন পণ্ডিতজী স্বয়ং। তিনি আশ্চর্য হলেন এই যুবকের অনুকরণ ক্ষমতা ও সুরবোধ দেখে। তিনি বার বার রামশঙ্করের কণ্ঠের প্রশংসা করতে লাগলেন।

তার পর রাজার দিকে ফিরে বললেন—মহারাজ, এই যুবক শ্রুতিধর এবং প্রতিভাবান্। যথোচিত সাধনা করলে যুবকটি পরে উচ্চশ্রেণীর গায়ক হতে পারবে। আপনার কাছে আমার একটি নিবেদন আছে। আমি এই যুবককে সঙ্গীত শিক্ষা দিতে পারি, যদি এখন কারও আপত্তি না থাকে। এবং সেজন্য বিষ্ণুপুরে যতদিন প্রয়োজন বাস করে যেতেও আমি প্রস্তুত আছি। মহারাজের কাছে আমার এই প্রার্থনা।

রাজা আনন্দের সঙ্গে বললেন—এ অতি উত্তম প্রস্তাব। এতে আপত্তি হবার কোন কথাই নেই। আমি আপনাকে সাদরে বরণ করি। আপনার বিষ্ণুপুরে অবস্থানের ফলে রামশঙ্কর সঙ্গীত-শিক্ষা লাভের সুযোগ পাবে এবং সেই সঙ্গে বিষ্ণুপুরও আপনার সঙ্গীতের আস্বাদ পেয়ে ধন্য হবে।

রামশঙ্করও যে পণ্ডিতজীর প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হলেন, তা বলাই বাহুল্য। সঙ্গীতশিক্ষার চেয়ে বড কাম্য তখন রামশঙ্করের আর কিছুই নেই। এবং তাও সেই আচার্যের কাছে, যাঁর গান শুনে তিনি জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা, সর্বোত্তম আনন্দ লাভ করেছিলেন। যাঁর কণ্ঠনিঃসৃত সুরধ্বনি তিনি এতদিন সযত্নে মনের মধ্যে লালন করে এসেছেন। যাঁর সুরলহরী অনুসরণ করেছেন সমগ্র অন্তর দিয়ে। যাঁর সঙ্গীতসুধার আদর্শ রূপায়িত করাই তাঁর নিজের জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা রূপে মনে করেছেন। সুতরাং আচার্যের এই অভাবিত সাদর আহ্বান তাঁর কাছে অন্তর-দেবতার পরম আশীর্বাদ স্বরূপই মনে হল। তাঁর প্রার্থনার শ্রেষ্ঠতম বরদান!

সেইদিন থেকে পণ্ডিতজী বিষ্ণুপুরে বাস করলেন প্রায় দু বছর। এবং একাদিক্রমে রামশঙ্করকে এই দীর্ঘকাল অকপটে সঙ্গীতশিক্ষা দিলেন। রামশঙ্করও

ব্রতের নিষ্ঠা নিয়ে একান্তভাবে সঙ্গীতশিক্ষায় নিজেকে নিয়োজিত করলেন। তাঁর প্রতিভা ও সাধনার সঙ্গে যুক্ত হল গুরুর অকৃপণ বিদ্যাদান।

এমনিভাবে রামশঙ্করকে সঙ্গীতসাধনায় দীক্ষিত করে পণ্ডিতজী বছর দুয়েক পরে স্বদেশে ফিরে গেলেন।

রামশঙ্কর সেই যে সঙ্গীতের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন, তা তাঁর ৯২ বছর বয়সে মৃত্যু পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তিনিই বিষ্ণুপুর ঘরানার আদি সঙ্গীতাচার্য এবং তাঁর সঙ্গীতসাধনায় প্রতিষ্ঠিত করলেন বিষ্ণুপুরের গৌরব। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, রামকেশব ভট্টাচার্য, কেশবলাল চক্রবর্তী, দীনবন্ধু গোস্বামী, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শিষ্য গঠিত করে রামশঙ্কর ঘরানার সঙ্গীতধারা বিষ্ণুপুরে এবং বাংলার নানাস্থানে প্রসারিত করলেন।

জীবনের প্রায় শেষ পর্যন্ত রামশঙ্কর আত্মীয়স্বজনদের কাছে তাঁর একমাত্র সঙ্গীতগুরু সেই পণ্ডিতজীর কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করতেন। আর বলতেন, তাঁর নিজের সেই প্রথম আসরটির কথা—যেদিন বিষ্ণুপুর রাজসভায় গান গেয়ে তিনি ভাগ্যক্রমে সেই গুণীকে গুরুরূপে লাভ করেছিলেন।

এবিষয়ে রামশঙ্কর সচেতন ছিলেন কিনা জানা যায় না, কিন্তু তাঁর সেই প্রথম গানের আসরের দিনটি থেকে বাংলাদেশে সঙ্গীতচর্চার ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় আরম্ভ হয়েছিল।

রামশঙ্করের সঙ্গীতশিক্ষা, সঙ্গীতসাধনা এবং সঙ্গীতশিক্ষা দানের ফলে, শুধু বিষ্ণুপুরে নয়, বাংলাদেশে ধ্রুপদ গানের প্রচলন হয়েছিল। আর প্রবর্তন হয়েছিল বিখ্যাত বিষ্ণুপুর ঘরানার।

বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রবর্তক হলেন রামশঙ্কর ভট্টাচার্য। বিষ্ণুপুরবাসীদের মধ্যে আদি সঙ্গীতগুরু তিনি এবং তাঁরই শিষ্য-প্রশিষ্যের ধারায় বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতচর্চা বিস্তৃতি ও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে। এবং তাঁর এই মহান্ অবদানের মূলে আছেন আগ্রা মথুরা অঞ্চলের সেই সঙ্গীতাচার্য।

রামশঙ্করের সেই অপূর্ব গুরুকরণের এই ঐতিহাসিক তাৎপর্য।

বধ্ বীণা

বারাণসীর সঙ্গীতসাধক, বীণ্‌কার ও রবাবী, সাদিক আলী খাঁ। সঙ্গীত-জগতের মহান পুরুষ তানসেনের একজন দিক্‌পাল বংশধর। পুরুষানুক্রমে রক্ষিত তাঁদের ঘরানা-বিদ্যার এক সুযোগ্য উত্তর'ধিকারী।

স্বনামধন্য তানসেন একটি বিরাট সঙ্গীত-গুণী পরিবারের জনক। তাঁর সঙ্গীত-সম্পদের ধারক ও বাহক তাঁর কন্যা ও পুত্রদের বংশধারা অবলম্বনে সেই পরিবার বিস্তৃত হয়েছিল। তানতরঙ্গ খাঁ, সুরতসেন, বিলাস খাঁ প্রভৃতি পুত্রদের এবং একমাত্র কন্যা সরস্বতীর বংশধারা। সাদিক আলী খাঁ তানসেনের পুত্রবংশীয় ছিলেন বলে কথিত আছে।

তানসেনের এই সাক্ষাৎ বংশধরদের আর কালক্রমে তাঁদের কাছে শিক্ষা পাওয়া শিষ্যদের নিয়ে গঠিত হয় বৃহত্তর সেনী ঘরানা। বৃহত্তর এই জন্যে যে, এই মূল সেনী ঘরানা থেকে নানা শাখা ঘরানার সৃষ্টি হয়েছে—তানসেনের উত্তরাধিকারীদের নানা অঞ্চলে অবস্থান, শিষ্য গঠন এবং (কোন কোন ক্ষেত্রে) সঙ্গীতকেন্দ্র স্থাপনের ফলে।

তানসেন পরিণত বয়সে তাঁর পৃষ্ঠপোষক রেবা রাজ্যের মহারাজা রামচাঁদের আশ্রয় থেকে বাদশা আকবরের দরবারে যোগ দেন। গোয়ালিয়র সঙ্গীতকেন্দ্রের গায়করূপে প্রসিদ্ধ তানসেন সেই থেকে সপরিবারে মোগল রাজধানীর অধিবাসী হলেন। তারপর পুরুষানুক্রমে তাঁর বংশধরদেরও বাস ছিল সেখানে। সঙ্গীত-চর্চাই ছিল তাঁদের জীবনের বৃত্তি, তাই পুরুষানুক্রমে মোগল দরবারে নিযুক্ত সঙ্গীতজ্ঞ থাকেন। একের পর এক মোগল বাদশা দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন এবং যথাকালে বিদায় নেন পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ থেকে। কিন্তু প্রায় সব বাদশার দরবারেই কোন-না-কোন সেনী-বংশীয় সঙ্গীত-গুণীকে পাওয়া যায়। আওরঙ্গজেবের প্রপৌত্র মহম্মদ শা'র আমলেই মোগল সাম্রাজ্য একরকম ধ্বংস হয়ে যায়।

আকবর থেকে আরম্ভ করে মহম্মদ শা'র সময় পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় দুশো বছর তানসেনের বংশধররা রাজধানীতে বাস করেছিলেন। মহম্মদ শা'র আমলে দিল্লীর দরবারে তানসেনের কন্যা-বংশের গুণী নিয়ামৎ খাঁ (সদারঙ্গ্) এবং পুত্রবংশীয় গোলাব খাঁ অবস্থান করেন বলে প্রকাশ। মহম্মদ শা'র পরে দিল্লী

দরবার কার্যতঃ ভেঙে যাওয়ায় সেনী উত্তরাধিকারীরা রাজধানী ত্যাগ করে উত্তর ও পূর্ব ভারতের নানা আঞ্চলিক রাজ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকেন। রাজস্থানের জয়পুর প্রভৃতি রাজ্যে ; পাঞ্জাবের কয়েকটি কেন্দ্রে ; লক্ষ্ণৌ নবাব দরবারে ; রেবা, রামপুর, বেতিয়া ইত্যাদি রাজসভায় সম্মানের আসন লাভ করেন তাঁরা। সেই সব রাজ্যে তাঁদের অনেকে স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন।

এইভাবে তানসেনের কোন কোন বংশধর ভদ্রাসন স্থাপন করেন কাশীরাজ্যে। কাশী-নরেশ হলেন তাঁদের পৃষ্ঠপোষক। এবং তাঁদের এখানে নতুন আবাস হল কবীরচৌরা মহল্লায়।

কাশীতে তানসেনের পুত্রবংশের একটি ধারার বাস আরম্ভ হল। সেই সঙ্গে কন্যাবংশের গুণী নির্মল শা'রও এখানে অবস্থানের কথা শোনা যায়। কিন্তু তাঁর বাস বারাণসীতে বংশানুক্রমে হয় নি, যেমন হয়েছিল (তানসেনের) পুত্রবংশের একটি ধারার। যতদূর জানা যায়, ছজু খাঁ ও তাঁর তিন পুত্রদের সময় থেকে এই ধারার কাশীতে বাসের পত্তন হয়। এবং এই শাখা তানসেনের কনিষ্ঠ পুত্র বিলাস খাঁর অধস্তন পুরুষ, এই প্রসিদ্ধি আছে।

ছজু খাঁ হলেন বাদশা মহম্মদ শা'র দরবারে নিযুক্ত গায়ক গোলাব খাঁর পৌত্র। তানসেনের পুত্রবংশে অনেকেই রবাব-গুণীরূপে সুপরিচিত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁদের ঘরানা ধ্রুপদ গানের চর্চা কখনই বন্ধ ছিল না, একথা বলা বাহুল্য। ধ্রুপদ সঙ্গীতই ছিল তাঁদের ঘরানা তালিমের ভিত্তি এবং তানসেন-রচিত ধ্রুপদ গীতাবলী তাঁদের ধ্রুপদ-চর্চার প্রধান অবলম্বন। অবশ্য তাঁর বংশধরদের রচিত বহু ধ্রুপদ সঙ্গীতের আসরে প্রচলিত আছে।

তানসেনের পুত্রবংশে যেমন রবাবের, কন্যার ধারায় তেমনি বীণার সাধনা। সঙ্গীত-চর্চার ভিত্তিস্বরূপ ধ্রুপদ অবশ্য দুই ক্ষেত্রেই বরাবর আছে। কন্যাবংশে বীণার প্রচলন হয় তানসেনের জামাতা নৌবাৎ খাঁর সময় থেকে। তানসেনের এই দৌহিত্র বংশে অনেক মহাগুণী বীণ্‌কারের আবির্ভাব ঘটে যুগে যুগে। যথা : সদারঙ্গ, প্যার খাঁ (আংলীকট্), নির্মল শা, ওমরাও খাঁ, আমীর খাঁ, উজীর খাঁ প্রভৃতি। তেমনি পুত্রবংশীয় রবাবীদের মধ্যে স্মরণীয় নাম হল—ছজু খাঁ, জাফর খাঁ, বাসৎ খাঁ, সাদিক আলী খাঁ, মহম্মদ আলী খাঁ, কাসিম আলী খাঁ প্রভৃতি।

এই কাহিনীর নায়ক হলেন উক্ত সাদিক আলী খাঁ, রবাবী ছজু খাঁর পৌত্র এবং জাফর খাঁর দ্বিতীয় পুত্র।

ছজু খাঁর তিন পুত্র জাফর খাঁ, প্যার খাঁ এবং বাসৎ খাঁ ছিলেন সঙ্গীত-জগতের তিন দিক্‌পাল। জাফর খাঁর দৌহিত্র এবং সাদিক আলীর ভাগিনেয় ছিলেন বাহাদুর হোসেন বা সেন, রামপুর ঘরানার অন্যতম প্রবর্তক (আমীর খাঁর সহযোগে)। কয়েক পুরুষে এই পরিবার থেকে এত প্রথম শ্রেণীর গুণী সঙ্গীতক্ষেত্রে দেখা দিয়েছেন যে পরিবারটি বিশেষ স্মরণীয় হয়ে আছে।

সাদিক আলীর পিতা জাফর খাঁ হলেন সুরশৃঙ্গার যন্ত্রের প্রচলনকর্তা। কাশীরাজ উদিতনারায়ণের দরবারে তাঁর পরিকল্পিত এই সুরশৃঙ্গার যন্ত্রটি তিনি প্রথম বাজিয়েছিলেন বলে প্রকাশ। তার পর থেকে সেনীঘরের অনেক গুণী ও তাঁদের শিষ্য-প্রশিষ্যের ধারায় এই সুমিষ্ট আলাপচারির যন্ত্রটি বাদিত হয়ে এসেছে এবং এখনও পর্যন্ত এই যন্ত্রের প্রচলন আছে গুণী-মহলে।

সাদিক আলী খাঁ সুরশৃঙ্গার বাজাতেন না। তিনি ছিলেন প্রধানত বীণ্‌কার ও রবাববাদক। তবে তাঁর কোন কোন শিষ্য সুরশৃঙ্গারবাদক ছিলেন।

সাদিক আলী পিতৃবংশের ধারা অনুসারে রবাবী হলেও তাঁর প্রসিদ্ধি সমধিক ছিল বীণ্‌কাররূপে এবং বীণায় তাঁর একাধিক কৃতী শিষ্য গঠিত হন। পরে তাঁদের কথা উল্লেখ করা হবে।

সাদিক আলী শুধু ক্রিয়াসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ ও শিল্পী ছিলেন না। সঙ্গীত-তত্ত্বে পরম প্রাজ্ঞ এবং সুপণ্ডিতরূপে খ্যাতি ছিল তাঁর। তাঁদের স্থায়ীভাবে কাশীতে বসবাস তাঁর পিতার সময় থেকে আরম্ভ হয়েছিল এবং তাঁর নিজের সঙ্গীত-জীবনও প্রধানতঃ এখানে অতিবাহিত হয়। সঙ্গীতজ্ঞরূপে প্রথম জীবনে তিনি বেতিয়া-রাজার দরবারে কয়েক বছর অবস্থান করেন, অবশিষ্ট জীবন নিযুক্ত থাকেন কাশী-নরেশের সঙ্গীত-সভায়। তিনি অত্যন্ত দীর্ঘজীবী পুরুষ ছিলেন, মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স নাকি শতবর্ষ অতিক্রম করেছিল।

তাঁর সঙ্গীতসাধনার ফলে বারাণসীর সঙ্গীতক্ষেত্র তখন বিশেষ সমৃদ্ধ হয়েছিল। কারণ তাঁর প্রধান শিষ্যমণ্ডলী গঠিত হয় এখানেই এবং তাঁদের মধ্যে একমাত্র কাসিম আলী খাঁ ভিন্ন অন্য সকলেই তাঁদের সঙ্গীত-জীবন যাপন করেছিলেন কাশীতে।

সাদিক আলীর শিক্ষাদানের বিষয়ে একটি উল্লেখনীয় কথা হল, তিনি আপন পরিবারের বাইরে এবং হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে যোগ্য শিষ্যকে মূল্যবান ঘরানা সম্পদ বিতরণ করেন—যা সে যুগের ওস্তাদদের মধ্যে নিতান্তই দুর্লভ। তিনি যে অকৃতদার ছিলেন, তা-ই বোধ হয় এই অসাধারণ ঘটনার একমাত্র কারণ

নয়। কেননা, আপন সন্তান না থাকলেও সেকালের সঙ্গীত-ব্যবসায়ীরা অন্ততঃ আত্মীয়দের সে বিদ্যা দান করতেন, অনাত্মীয় ও বিধর্মীকে শেখাতেন কদাচিৎ। সাদিক আলী তেমন হলে শুধু কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিসার আলী কিংবা জ্যেষ্ঠ কাজাম আলীর স্বনামধন্য পুত্র কাসিম আলীকে তালিম দিয়েই শেষ করতেন। কিন্তু তেমন সঙ্কীর্ণমনা ছিলেন না তিনি। আপনার উদার সঙ্গীত-স্বভাবের প্রেরণাতেই তিনি বহু অনাত্মীয় ও উপযুক্ত আধারে দান করে গেছেন তাঁর কষ্টার্জিত সঙ্গীত-সম্পদ।

সঙ্গীত-জগতে তাঁর আসন কোথায় ছিল, তা ধারণা করা যায় তাঁর গঠিত শিষ্যমণ্ডলীর কথা মনে করলে। তাঁর শিষ্যরা সকলেই ছিলেন তন্ত্রকার। সুরশৃঙ্গার, বীণা, রবাব, সেতার ইত্যাদি পৃথক্ যন্ত্রে তাঁরা এক একজন তালিম পান। কেউ বা একাধিক যন্ত্রে—যেমন কাসিম আলী খাঁ।

রবাব যন্ত্রে তাঁর দুই শিষ্য—দুজনেই তাঁর আত্ম-জন—কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিসার আলী খাঁ ও ভ্রাতুষ্পুত্র কাসিম আলী খাঁ। তবে নিসার আলী সুরশৃঙ্গারও বাজাতেন। তাঁর সঙ্গীতজীবনও কাশীতে অতিবাহিত হয় এবং তিনি সাদিক আলীর মৃত্যুর পর হয়েছিলেন কাশী-রাজের সঙ্গীতসভার আচার্য। তাঁর প্রধান দুই শিষ্যও ছিলেন কাশী-নিবাসী। একজন হলেন পান্নালাল জৈন, ইনি সুর-শৃঙ্গারে নিসার আলীর তালিম পান এবং আর একজন অর্জুন বৈদ্য, সেতারী। দুজনেই গুণী বাদক বলে সুপরিচিত হয়েছিলেন। পরবর্তী কালের নেতৃস্থানীয় বীণ্‌কার ও সুরশৃঙ্গার-যন্ত্রী উজীর খাঁ—নিসার আলীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাজাম আলীর দৌহিত্র—কিশোর বয়সে নিসার আলীর তালিম পেয়েছিলেন। বারাণসীর বীণ্‌কার মহেশচন্দ্র সরকারও নিসার আলীর শিক্ষা কিছু লাভ করেন।

সাদিক আলীর সর্বশ্রেষ্ঠ ঘরানা-শিষ্য হলেন কাসিম আলী খাঁ। রবাব ও বীণা দুই যন্ত্রেই তিনি মহাগুণী ছিলেন। সাদিক আলীর শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি বেশি দিন থাকেন নি কাশীতে। উত্তর-জীবনে বাংলার নানা সঙ্গীত-দরবারে অবস্থান করবার পর তাঁর মৃত্যুও হয় এই প্রদেশেই। প্রথমে তিনি এসেছিলেন লক্ষ্ণৌর নির্বাসিত নবাব ওয়াজিদ আলী শা'র মেটিয়াবুরুজ দরবারে বীণ্‌কার নিযুক্ত হয়ে। তার পর বাংলার নানা আঞ্চলিক রাজসভায় সসম্মানে যুক্ত থাকেন। যথা: পঞ্চকোটে কাশীপুরের সঙ্গীতসভায়, ত্রিপুরার রাজ-দরবারে, ভাওয়াল-রাজের সভায় ইত্যাদি। ত্রিপুরায় শ্রুতিধর যদু ভট্ট গুপ্তভাবে তাঁর সঙ্গীত-সম্পদ আহরণ করবার চেষ্টা করায় তিনি বিরক্ত হয়ে ত্রিপুরা ত্যাগ করে ভাওয়াল-রাজার সঙ্গীতসভায় চলে যান। ভাওয়ালেই তাঁর মৃত্যু ঘটে এবং

তাঁর হাতের রবাব যন্ত্র সেখানেই রক্ষিত হয়েছিল। ত্রিপুরায় অবস্থানের সময় আলাউদ্দিন খাঁর পিতা সত্ন খাঁ (ত্রিপুরার শিবপুর নামে গ্রামের অধিবাসী) কয়েকদিন সেতার শিখেছিলেন কাসিম আলী খাঁর কাছে। কাসিম আলীর তুল্য তন্ত্রকার বাংলাদেশে খুব কমই এসেছিলেন—সঙ্গীতজগতের শ্রুতি-স্মৃতিতে এমন একটি ধারণা রয়ে গেছে।

সাদিক আলীর অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে বহু-বিখ্যাত ছিলেন—সেতারী গণেশ বাজপেয়ী, বীণ্‌কার মিঠাইলাল এবং বীণ্‌কার মহেশচন্দ্র সরকার। তিনজনই কাশীনিবাসী এবং প্রথম শ্রেণীর সঙ্গীতজ্ঞ। গণেশ বাজপেয়ীর কাছে বিখ্যাত সেতারী রামেশ্বর পাঠক কিছু তালিম পেয়েছিলেন এবং মহেশচন্দ্র সরকারের প্রথম সঙ্গীতগুরুও তিনি (বাজপেয়ীজী)। মহেশচন্দ্র নিসার আলীর শিক্ষা কিছু লাভ করবার পর সাদিক আলীর তালিম পান এবং গুণী বীণ্‌কাররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস বৃন্দাবন যাবার পথে বারাণসীতে মহেশচন্দ্রের বীণাবাদন শুনে ভাব-সমাধিস্থ হয়েছিলেন, একথা সুবিদিত। সাদিক আলীর অপর শিষ্য মিঠাইলাল একজন শ্রেষ্ঠ বীণ্‌কাররূপে স্বীকৃত হয়েছিলেন এবং বীণাযন্ত্রে তাঁর কৃতী শিষ্য হলেন বারাণসীর শিবেন্দ্রনাথ বসু। বড় ও ছোট রামদাস কণ্ঠসঙ্গীতে মিঠাইলালের দুই খ্যাতনামা শিষ্য। তা ছাড়া, ধ্রুপদী গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও মিঠাইলালের শিক্ষা কিছু পেয়েছিলেন।

এই সব সুপ্রসিদ্ধ শিষ্য ভিন্ন চিন্তামণি বাপুলি নামে সাদিক আলীর একজন বাঙ্গালী শিষ্য ছিলেন। তিনি বাংলার এক শৌখিন সঙ্গীতজ্ঞ, কাশীপ্রবাসী হবার পর সাদিক আলীর শিষ্য হন এবং সুরশৃঙ্গার বাজাতেন।

এই প্রতিষ্ঠাবান শিষ্যগোষ্ঠীর গুরু সাদিক আলী খাঁর সঙ্গীতজগতে কি মর্যাদার আসন ছিল, তা সহজেই অনুমেয়। সেই সঙ্গে স্মরণীয় যে, বেতিয়ারাজার দরবার ত্যাগ করবার পর তিনি কাশী-নরেশের সঙ্গীতগুরুরূপে তাঁর সঙ্গীত-সভায় বিপুল গৌরবে অবস্থান করেছিলেন। তা ছাড়া, সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল এবং বারাণসীর সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমহলে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল তাঁর।

রবাব ও বীণা এই দুই যন্ত্রেই তিনি গুণপনা প্রদর্শন করতেন এবং শোনা যায়, 'লড়ী জোড়' এবং 'লড গুথাও'-এর বিন্যাসে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

তিনি শতায়ু ছিলেন, একথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। আঠারো শতক থেকে আরম্ভ করে তাঁর জীবন এসে পৌঁছেছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত।

তিনি একজন যথার্থ সঙ্গীত-সাধক ছিলেন। চিরকুমার তিনি, আজীবন

সঙ্গীতচর্চায় নিমগ্ন রাখেন নিজেকে। ভারতীয় সঙ্গীতের বিপুল ও গভীর রাগসম্পদ আস্বাদন করেন অনন্যচিত্তে।

সঙ্গীত-সাধনায় তিনি কি একনিষ্ঠ ভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তার উদাহরণ হিসেবে তাঁর একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করা হবে। তিনি তখন পরিণত বয়সে অবস্থান করছিলেন বারাণসীতে। পরবর্তী কালের সুবিখ্যাত রবাবী-ধ্রুপদী মহম্মদ আলী খাঁর সে সময় অল্প বয়স। পিতা বাসৎ খাঁর সঙ্গে তিনি তখন কাশীতে এসেছিলেন এবং কিছুদিন ছিলেন সাদিক আলী খাঁর সঙ্গে। বাসৎ খাঁ হলেন সাদিক আলীর পিতৃব্য এবং জাফর খাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

সাদিক আলীর সঙ্গে কথা-প্রসঙ্গে একদিন মহম্মদ আলী খাঁ তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—বিদ্যা কি ?

অর্থাৎ তিনি জানতে চেয়েছিলেন, রাগবিদ্যার স্বরূপ কি। কেমন করে এই বিদ্যা লাভ করা যায়, কি রকম এ বিদ্যার বিস্তার ইত্যাদি।

সাদিক আলী এইভাবে উত্তর দিয়েছিলেন—বিদ্যা ছড়ান আছে, সকলে যেমন জানে। কিন্তু এ যেন অপার। সীমা-পরিসীমা নেই। এর অন্তও দেখতে পাই না। যত দিন যাচ্ছে, ততই নতুন নতুন রাস্তা বেরুচ্ছে। রাগের বিস্তারের যেন আর শেষ নেই। অন্য সব রাগের কথা কি বলব ? আমি তো তিনটি নিয়ে পড়ে আছি। শুধ্ (শুদ্ধ) কল্যাণ, ইমন কল্যাণ আর দরবারী কানাড়া। কিন্তু তা-ই আমি শেষ করতে পারছি না। দিন দিন এদের নতুন নতুন দিক্ খুলে যাচ্ছে।

শুদ্ধ কল্যাণ, ইমন কল্যাণ ও দরবারী কানাড়া। এই তিনটি রাগ ছিল সাদিক আলীর সবচেয়ে প্রিয় এবং এই তিনে তিনি সিদ্ধ ছিলেন। অন্য বহু রাগেও যে তিনি পারঙ্গম ছিলেন, তা বলা বাহুল্য। ওটি তাঁর বিনয়ের কথা। তাঁর সঙ্গীত-ভাণ্ডার বিপুলভাবে সঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি মাত্র ওই তিনটির নাম করেছিলেন, কারণ ওই তিনটি ছিল তাঁর প্রিয় সাধনের রাগ ; তাই তিনটির সীমার মধ্যেই তিনি অসীমের, অনন্তের আভাস পেয়েছিলেন। শুদ্ধ কল্যাণ, ইমন কল্যাণ আর দরবারী কানাড়ার অগাধ বিস্তারের মধ্যে আত্মসমাহিত হয়েছিলেন তিনি।

এখন খাঁ সাহেবের আর একটি প্রসঙ্গ বর্ণনা করে তাঁর কথা শেষ করা হবে। এটি এক কৌতুককর ঘটনা। তাঁর সুরসিক-মনের একটি দৃষ্টান্ত এবং এই নিবন্ধের শিরোনামার প্রসঙ্গ।

সাদিক আলীর এক বন্ধু ছিলেন, তিনি সঙ্গীতজ্ঞ নন। বাইরে বাইরে থাকতেন আর কাশীতে এলে দেখা করতেন খাঁ সাহেবের সঙ্গে। সঙ্গীত-জগতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক না থাকায় খাঁ সাহেবের অন্তর্জীবনের সংবাদ তিনি কিছু জানতেন না। সাদিক আলী যে কত বড গুণী, তাঁর জীবনে সঙ্গীতের স্থান কোথায় এসব কথা সেই বন্ধুর ধারণা ছিল না। কি সব বাজনা বাজান, এইটুকু মাত্র জানা ছিল তাঁর।

সেবার তিনি কাশীতে এসেছেন অনেক দিন পরে। সাদিক আলীর সঙ্গে সেদিন তিনি দেখা করেছেন এবং তুজনে গল্প হচ্ছে।

কি একটা কথায় তিনি খাঁ সাহেবকে হেসে বললেন—সে-সব আর তুমি কি বুঝবে, বল। সংসার তো আর করলে না। বিয়ে-শাদি হল না—এ আর তুমি কি জানবে? সারাটা জীবন শুধু গান-বাজনা নিয়ে কাটিয়ে দিলে।

সাদিক আলী খাঁ মুখে বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়ে বললেন—বিয়ে করি নি কিরকম? তুমি কি ভেবেছ আমার শাদি হয় নি?

বন্ধু আরও আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—সে কি? তুমি বিয়ে করেছ? কবে, কই আমায় তো কিছু জানাও নি! সত্যি বিয়ে করেছ?

—নিশ্চয়। আর সে কি আজকের কথা। বহুকাল আগে বিয়ে করেছি। বৌ তো পুরনো হয়ে গেছে হে।

বন্ধুর তখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটে নি। তিনি কথাটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছেন না। কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে। সাদিক আলী গান-বাজনা নিয়ে পাগল হয়ে থাকেন, তিনি আবার কবে বিয়ে করলেন, কারুর কাছে তো শোনা যায় নি। এ কেমন কথা?

তখন সাদিক আলী বন্ধুর মুখের দিকে চেয়ে বললেন—বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? আচ্ছা, এস আমার সঙ্গে বাড়ির মধ্যে। আমার বৌ দেখবে এস।

বলে, বাইরের ঘর থেকে বন্ধুর হাত ধরে বাড়ির ভেতরের একটি ঘরে নিয়ে এলেন। ঘরের একদিকে রাখা একটি খাটের দিকে আঙুল তুলে বললেন—ওই দেখ, আমার বৌ এখন শুয়ে আছে।

বন্ধু তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখেন, খাটের ওপর লাল রেশমী কাপড়ে সর্বাঙ্গ ঢেকে—ওই কি সাদিকের পত্নী?

খাঁ সাহেব বন্ধুর সন্দেহ নিরসন করবার জন্যে সেদিকে এগিয়ে গেলেন অপ্রতিভ বন্ধুকে নিয়ে। খাটের ধারে দাঁড়িয়ে, নীচু হয়ে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করবার মতন করে তাকে কিঞ্চিৎ নিরাবরণ করলেন।

বন্ধু সবিস্ময়ে দেখলেন—উজ্জ্বলকান্তি চিক্কণ-তন্ত্র একটি বীণাযন্ত্র !

এই বধূর পাদপদ্মে সাদিক আলী তাঁর মন-প্রাণ সাধ-সাধনা সব সমর্পণ করেছেন !

হাসতে হাসতে বন্ধুর দিকে ফিরে সাদিক আলী বললেন, আমার বৌ দেখলে তো ?

তার পর দুজনেই হাসতে লাগলেন।

বন্ধু বিদায় নেবার পর সাদিক আলী এসে বসলেন খাটের ওপর। বধূ বীণার সজ্জা অপসারণ করে তাকে সাদরে বক্ষ সংলগ্ন করলেন। তার পর তন্ত্রে স্থর সংযোগের পর তার প্রকম্পিত তনুলতা ঝঙ্কৃত করে তুললেন প্রেমিকের আত্মহারা আবেশে।

বজ্রের মতন ধা

কেশব মিত্রের পাখোয়াজ! কথাটা এককালে গান-বাজনার জগতে প্রবাদ বাক্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আজও তাঁর নাম একেবারে লুপ্ত হয় নি। বেঁচে আছে নানা আসরের কথা-কাহিনীতে। আর বেঁচে আছে তাঁর হাতে-গড়া ভবানীপুর সঙ্গীত-সম্মিলনীতে।

কেশববাবুর মতন পাখোয়াজী এদেশে কমই জন্মেছেন, উনিশ শতকের তিনি একজন শ্রেষ্ঠ পাখোয়াজ-বাজিয়ে ছিলেন—এমন সব কথা জানা যায় আমাদের সঙ্গীতচর্চার অলিখিত ইতিহাস থেকে।

তাঁকে যাঁরা দেখেছেন, তাঁর হাতের বাজনা যাঁরা শুনেছেন, তাঁদের মুখে মুখে কেশবচন্দ্রের অনেক গুণপনার কাহিনী একালে এসে পৌঁছেছে। তারই কয়েকটি এখানে বলা হবে। তবে তার আগে তাঁর নিজের কথা কিছু জানান দরকার।

ভবানীপুরের প্রসিদ্ধ মিত্র বংশের সন্তান কেশবচন্দ্র ছিলেন বিচারপতি স্যর রমেশচন্দ্রের তৃতীয় অগ্রজ। আর সেকালের অনেক বাঙ্গালী গুণীর মতন তিনিও ছিলেন শৌখিন, অর্থাৎ অপেশাদার। বরং বাজনার জন্যে দস্তুরমত খরচ করতেন। পেশাদার গায়ক ওস্তাদদের মুজরো দিয়ে নিজের বাড়িতে এনে, সঙ্গত করতেন তাঁদের গানের সঙ্গে। পশ্চিম থেকে কোন বিখ্যাত কলাবত এসেছেন অথচ কেশববাবুর সঙ্গে আসর হয় নি, এমন বড় একটা ঘটত না। মুরাদ আলীর মতন

অত বড় একজন ধ্রুপদীকে তিনি নিজের বাড়িতে ছ'মাস রেখে দেন তাঁর সঙ্গে বাজাবার জন্যে। তিনি ছিলেন কলকাতার আদি মৃদঙ্গাচার্য শ্রীরাম চক্রবর্তীর ঘরের শিষ্য। বাংলাদেশে পাখোয়াজের এত বড় ঘর সেকালে আর ছিল না।

পাখোয়াজ কোলে নিয়ে তিনি যখন গায়কের মুখোমুখি বসতেন, সে আসর একটা দেখবার মতন জমজমাট হয়ে উঠত। কেশববাবু তো নন, যেন সাক্ষাৎ গণেশ।—তাঁর অনুরাগী কোন কোন বৃদ্ধের মুখে এমন প্রশংসার উচ্ছ্বাস শোনা গেছে। বলবার বোধ হয় দরকার নেই যে, গণেশ শুধু সিদ্ধিদাতা নন, পুরাণে তাঁকে আদি মৃদঙ্গাচার্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

মিত্র মহাশয়ের হাত অসাধারণ তৈরী ছিল, রীতিমত রেওয়াজী হাত। শৌখিন হলেও মৃদঙ্গচর্চাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র সাধনা। প্রতিভার সঙ্গে সাধনাকে যুক্ত করে তিনি পাখোয়াজ-সঙ্গতে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। অনর্গল অভ্যাসের ফলে তাঁর হাত তৈরী হয়েছিল যন্ত্রের মতন কৌশলী এবং ক্লান্তিহীন। তিনি যখন 'ধেরে কেটে তেরে কেটে' বোল্ ওঠাতেন, যেন কাঠের মতন আওয়াজ হত। যখন রেলা চালাতেন, আসর ভরে যেত গম্ভীর গুরু গুরু মন্দ্র ধ্বনিতে। আর ধা মারতেন কেমন ? তা একটু পরেই বলা হবে।

কেশববাবুর কঠিন হরফ ছিল—সাঙ্গীতিক পরিভাষায় বলতেন অতি বৃদ্ধ তবলাগুণী বিধুভূষণ দত্ত। লক্ষ্ণৌ ঘরানার বিখ্যাত তবলিয়া বাবু খাঁর শিষ্য (গড়পারের) বিধুভূষণ দত্ত অনেকবার মিত্র মশায়ের বাজনা শুনেছিলেন এবং সেসব গল্পও বেশ বলতেন।

কেশবচন্দ্রের বাজনার বিষয়ে আর একটি বড় চমৎকার কথা জানান প্রাচীন ধ্রুপদী অমরনাথ ভট্টাচার্য। কথাটি ভট্টাচার্য মশায় তাঁর পিতা, ধ্রুপদগায়ক (ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর শিষ্য) কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের মুখে শুনেছিলেন। কালীপ্রসন্ন অনেক আসরে কেশবচন্দ্রের হাতের বাজনা শোনেন আর গল্প করতেন তাঁর বাজনার বিষয়ে। কথাটি হল—কেশববাবু আসরে গানের সঙ্গে সঙ্গত করতে বসে প্রথমেই একটি তেহাই মারতেন। গায়ককে এবং আসরের সবাইকে যেন স্বাগত জানাবার জন্যে একটি তেহাই দিয়ে বাজনা আরম্ভ করতেন কেশববাবু।

বাজনা আরম্ভ করেই এই যে তেহাই মারা, এর একটি তাৎপর্য আছে। কারণ ব্যাপারটি মোটেই সহজ নয়। যে-কোন গায়কের সঙ্গে বাজাতে বসে—তাঁর গায়ন-রীতিনীতি অনেক সময়েই অজানা থাকায় প্রথমেই একটি তেহাই ভাল করে মারা বেশ কঠিন কাজ। তালাধ্যায়ে অসামান্য অভিজ্ঞ না হলে

এমন তেহাইয়ের মুখপাত হতে পারে না। তাল লয় ছন্দ ইত্যাদি নিজের একান্ত দখলে না থাকলে কেশববাবুও তা করতে পারতেন না। তাই মনে হয়, ওটা শুধু তাঁর আসরকে ও গায়ককে অভিবাদন জানানো নয়। ওই মুখপাত তেহাইয়ের ভাষায় তিনি যেন গায়ককে বুঝিয়ে দিতেন—এ সমস্ত আমার অজানা নয়। আমি জানি এখন কি হবে। আমি পাল্লা দিতে পারব তার সঙ্গে। আমি প্রস্তুত।

তাঁর অসাধারণ তৈরি হাতের জন্যে অনেকে যেমন প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতেন, তেমনি কেউ কেউ আবার ঈর্ষাও করতেন মনে মনে। শোনা যায়, এমনি একজন ছিলেন তাঁরই এক গুরু-ভাই মুরারিমোহন গুপ্ত, যিনি নিজেও ছিলেন একজন মৃদঙ্গাচার্য।

কেশবচন্দ্র এবং মুরারিমোহন দুজনেই ঠনঠনিয়ার শ্রীরাম চক্রবর্তীর ঘরের শিষ্য। একই গুরুর শিষ্য অর্থাৎ গুরুভাইদের মধ্যে একটি বিশেষ প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। একসঙ্গে গুরুর কাছে শিক্ষা নেওয়া, একই বিষয় ও ভাবে শিক্ষা পাওয়া, অন্যান্য ঘরানা থেকে পৃথক্ একটি বিশিষ্ট পদ্ধতির চর্চা করা ইত্যাদি কারণে গুরুভাইদের মধ্যে একটি হৃদ্যতা ও ঘনিষ্ঠতা থাকে। আবার সেই সঙ্গে কোন কোন ক্ষেত্রে একটু ঈর্ষার ভাবও দেখা যায়। সঙ্গীত-জগতে এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে এবং এটি অসম্ভবও নয়, অস্বাভাবিকও নয়। এতে আশ্চর্য হবার যেমন কিছু নেই, গুপ্তমশায়ের অনুরাগীদের দুঃখিত হবারও কথা নয়। একটি আসরের গল্পের প্রয়োজনে কথাটার উল্লেখ করতে হল। মানুষের স্বভাবে অনেক রকম রিপু থাকে, এও তার মধ্যে একটি। দোষে-গুণে মানুষ। মুরারিবাবুর যেমন কেশববাবু সম্পর্কে ওইটি ছিল, তেমনি কেশববাবুরও আবার আর একটি দোষ (সেকালের সঙ্গীত-জগতের অনেকের মতন) ছিল। কিন্তু সে-সব দোষের কথা থাক। এখন গুণের গল্প হোক।

তাঁদের গুরুভাইদের মধ্যে বাজিয়ে হিসেবে কেশবচন্দ্রের নাম-ডাক ছিল সবচেয়ে বেশি। তাঁদের ঘরে আর একজন ওস্তাদ সঙ্গতকার হলেন বসন্ত হাজরা। মুরারিবাবু এঁদের তুল্য বাদক না হলেও আর একটি গুণে তাঁর খুব প্রসিদ্ধি ছিল। গুপ্তমশায়ের গুরুভাইদের মধ্যে তাঁরই সবচেয়ে শিষ্য গঠন করবার গৌরব প্রাপ্য। গোপালচন্দ্র মল্লিক, সত্যচরণ গুপ্ত, দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রভৃতি বাংলার স্বনামধন্য পাখোয়াজীদের গুরু হলেন মুরারিমোহন।

কেশবচন্দ্রের কিন্তু একজনও অমন কৃতী শিষ্য হন নি। বলতে গেলে কেশববাবুর কোন শিষ্যই নেই। বিহারী মিশ্র নামে এক ভদ্রলোক অনেকদিন

তাঁর কাছে শিক্ষার্থী হয়ে যাতায়াত করেন। কিন্তু যোগ্যতার অভাবে তাঁর কিছুই হয় নি। বিখ্যাত সঙ্গতকার নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম জীবনে কিছুদিন মিত্র মশায়ের কাছে শেখবার কথা কেবল জানা যায়। নগেন্দ্রবাবু পরে দীননাথ হাজরার কাছে যান শেখবার জন্যে। এই সব কারণে, মৃদঙ্গ-চর্চার ক্ষেত্রে শিক্ষক হিসাবে কেশববাবুর অবদান ধর্তব্য নয়। কিন্তু মুরারিমোহনের দান সে বিষয়ে স্মরণীয় হয়ে আছে। যে তিনজনের নাম আগে করা হয়েছে, তাঁরা ছাড়া আরও কয়েকজন কৃতী শিষ্য তাঁর ছিলেন। যথা : আনন্দনারায়ণ মিত্র, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, চারুচরণ মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ দে (প্রথম জীবনে) প্রভৃতি।

তবে গুপ্তমশায় যত বড় মৃদঙ্গাচার্য ছিলেন, তত বড় মৃদঙ্গী ছিলেন না। তার একটি কারণ হয়তো এই যে, তিনি বেশি বয়সে মৃদঙ্গ শিক্ষা বা চর্চা আরম্ভ করেছিলেন। আসরে তাঁর পাখোয়াজ-সঙ্গত তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারত না, কেশবচন্দ্রের মতন। যত জ্ঞান বা যত বোলের সংগ্রহ তাঁর ছিল, ক্রিয়াসিদ্ধ বাদক হিসেবে তেমন কৃতী ছিলেন না তিনি। সেই কারণে কিংবা অন্য কোন কারণে কেশববাবুর প্রতি একটু অসূয়ার ভাব তাঁর ছিল।

একদিন মিত্র মশায়ের একটি আসরে বাজাবার কথা। বড় আসর। আরও কয়েকজন গুণীর সেখানে গানবাজনা হবে। গায়কদের সঙ্গে সঙ্গত করবার জন্যে অন্য পাখোয়াজীও সেখানে দরকার। সেই আসরে আমন্ত্রিত হয়ে মুরারিমোহন তাঁর দুই কৃতী শিষ্যকে সেখানে পাঠানো স্থির করলেন। তিনি নিজে আসরে উপস্থিত হবেন না। তাঁর সেই দুই শিষ্য হলেন—গোপালচন্দ্র মল্লিক ও সত্যচরণ গুপ্ত। তাঁরা মুরারিবাবুর শ্রেষ্ঠ শিষ্য শুধু নন, তখনকার বাংলায় শ্রেষ্ঠ পাখোয়াজীদের মধ্যেও দুজন।

গোপালচন্দ্র এবং সত্যচরণকে তিনি বিশেষ নির্দেশ দেন, যেন তাঁরা যথাসাধ্য ভাল বাজান সেই আসরে। এত ভাল তাঁদের বাজাতে হবে যাতে কেশবচন্দ্রকে টক্কর দিতে পারেন। মুরারিবাবুর শিষ্যদের গুণপনায় যেন ডুবে যায় কেশববাবুর বাজনা। তাঁদের দুজনের বাজনা শুনে আসরে যেন সকলে ধন্য ধন্য করে।

সে আসরও যেমন-তেমন নয়। জোড়াসাঁকোর সেই বিরাট বাড়ির আসর রোমান স্থাপত্য-শৈলীতে গড়া, বিরাট স্তম্ভ, সুপ্রসর সোপানশ্রেণী আর তোরণে সাজানো সেই প্রাসাদের দোতলার জলসাঘর। এত উচ্চশ্রেণীর জলসা এখানে অনুষ্ঠিত হয়েছে যে, দেশের সঙ্গীতচর্চার ক্ষেত্রে এই অট্টালিকার একটি

ঐতিহাসিক মূল্য আছে। সারা ভারতবর্ষের কত শিল্পীর কত সঙ্গীত-স্মৃতি যে এখানকার বিশাল জলসাঘরের সঙ্গে বিজড়িত! এ প্রাসাদের কথা একবার উল্লেখ না করলে সেকালের সঙ্গীত-জীবনের অনেকখানিই অপরিচয়ের অতলে থেকে যায়। অট্টালিকাটির নিজের ইতিহাসও কি বিচিত্র উত্থান-পতনের কাহিনী! মহাকালের নাটকীয় পটক্ষেপে কতবার উৎক্ষিপ্ত হয়ে গেছে এই প্রাসাদের স্বত্বস্বামিত্ব। শ্রীকৃষ্ণ মল্লিক এবং শ্যামাচরণ মল্লিক, রাজা দুনিয়ালাল শীল এবং হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল, তার পর প্রদ্যুম্ন মল্লিকের হাত-ফের হয়ে অট্টালিকাটি শেষ পর্যন্ত 'লোহিয়া মাতৃ সেবাসদন' নামে হস্তান্তরিত ও রূপান্তরিত হয়েছে। বাংলার এই মহাধনী স্বুবর্ণবণিক গোষ্ঠীর হাত থেকে বর্তমান ভারতের ধনকুবের রাজস্থানী বণিকদের আশ্রয় লাভ করেছে। আর কি বৈচিত্র্যময় জীবন-নাট্যও অভিনীত হয়েছে এখানে। কোটিপতি হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল আমির থেকে ফকির হয়ে এই প্রাসাদের রঙ্গমঞ্চ থেকে অবিচলিত চিত্তে বিদায় নিয়েছেন। প্রদ্যুম্ন মল্লিকের জীবনের চরম ট্র্যাজেডি ঘটবার সময়েও তিনি ছিলেন এই অট্টালিকার মালিক। এমনি কত কাহিনী!

সেই বিলাসভবন রূপান্তর গ্রহণ করে এখন হয়েছে সেবানিকেতন। সঙ্গীতের কল-গুঞ্জরণ সেখান থেকে বহুদিন অন্তর্হিত। শ্যামাচরণ মল্লিক থেকে হরেন্দ্রকৃষ্ণ পর্যন্ত যে সঙ্গীতনির্ঝর সেই সুসজ্জিত জলসাঘরে ছন্দে তানে নিক্বণে মুখরিত হিল্লোলিত ছিল, রোগাবাসের দেওয়ালের অন্তরালে তা স্তব্ধীভূত হয়ে আছে। আর কোনদিন সে মৌন মুখর হতে পারবে না।

যে সময়ের আসরের কথা এখানে বলা হচ্ছে, তখন সেই প্রাসাদের পরিপূর্ণ সাবেকী রূপ বর্তমান। সঙ্গীত-জীবনের সূত্রে বলতে গেলে, তখন তার পরিপূর্ণ যৌবন। সুরের উদ্বোধনে জাগরণে সজীব সেখানকার জলসাঘর।...

এমনি এক সন্ধ্যায় সেই জলসাঘর উৎসবের সাজে সজ্জিত শোভার আসর বসিয়েছে। বেলোয়ারী ঝাড়ের আলো অসংখ্য কাচখণ্ড থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে দেওয়ালের দর্পণে দর্পণে প্রতিবিম্বিত। বহুমূল্য কার্পেটের ওপর আসন নিয়েছেন গুণীজন আর অতিথি-অভ্যাগত ব্যক্তিরা। কলকাতার এবং পশ্চিমের কয়েকজন গায়ক-বাদক এসেছেন। কেশববাবুও উপস্থিত।

এই আসরেই পাখোয়াজ বাজাবার জন্যে গোপালচন্দ্র মল্লিক ও সত্যচরণ গুপ্তকে পাঠিয়েছেন মুরারিমোহন। তাঁদের সেখানে পৌঁছতে খানিক দেরি হয়ে যায়।

তাঁরা যখন ফটক পার হয়ে এসে *সিঁ*ড়ির সারি শেষ করে নীচের অলিন্দে

দাঁড়িয়েছেন, তখন দোতলার দক্ষিণের জলসাঘর থেকে সঙ্গীতধ্বনি শুনতে পেলেন। কোন ওস্তাদ হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ গাইছেন আর তাঁর সঙ্গে পাখোয়াজ বাজাচ্ছেন কেশববাবু।

তাঁর সাধা হাতের পাখোয়াজ থেকে মেঘ-গম্ভীর বোলের আওয়াজ নীচে ভেসে আসছে। সুস্পষ্ট আর সোচ্চার সেই সঙ্গীতের ছন্দমুখর ধ্বনি।

সত্যচরণ সেখানেই থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। কেশববাবুর নিজস্ব ঢঙের বাজনা তাঁর কানে খানিক যেতেই তিনি আর এগোলেন না। উৎকর্ণ হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলেন কেশববাবুর দাপটের বাজনা। তিনি নিজেও গুণী, তাই কেশবচন্দ্রের গুণপনা হৃদয়ঙ্গম করতে তাঁর বিলম্ব হল না।

তাঁর সঙ্গী গোপাল মল্লিক অন্যমনস্ক হয়ে আসছিলেন, অতটা খেয়াল করেন নি। তা ছাড়া, গুরুর নির্দেশ তাঁর কানে রয়েছে : কেশববাবুকে আজ টেক্কা দিতে হবে। তাই আসরে যাবার জন্যে তিনি উন্মুখ। হঠাৎ সত্যচরণকে থমকে দাঁড়াতে দেখে বললেন—কি হল ? দাঁড়িয়ে পড়লে যে ? ভেতরে চল।

সত্যচরণ তাঁর হাত ধরে মৃদু চাপ দিয়ে বললেন—চুপ। কোথায় যাবে ? শুনছ না, ও কি বাজনা ?

গোপালচন্দ্র সবিস্ময়ে গুরুভাইয়ের মুখের দিকে চাইলেন। সত্যচরণের এই আচরণ আর কথার ধরন দেখে বড়ই আশ্চর্য লাগল তাঁর। বিশেষ গুরুর এই সদ্য নির্দেশের পরে। আসরে যেতে এই অযথা দেরি করতে তাঁর মোটেই ইচ্ছা হল না, অথচ সত্যচরণ সেখানে যাবার কোন আগ্রহই দেখাচ্ছেন না—এতে তিনি বিব্রত বোধ করলেন। সঙ্গীকে হয়তো গুরুর কথা একবার স্মরণ করিয়ে দেবেন ভাবছিলেন।

কিন্তু সত্যচরণের তখন প্রায় মন্ত্রমুগ্ধ অবস্থা। তিনি আলঙ্কারিক ভাষায় উপমা সহযোগে কেশবচন্দ্রের বাজনার গুণকীর্তন করে উঠলেন—ওই শোন—কেশববাবুর হাতের বোল। যেন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। কোথা থেকে তেহাই উঠছে আর কিরকম করে এসে পড়ছে, দেখছ ? ধা মারছেন যেন বজ্রপাত হচ্ছে! এক-একটা ধা পড়ছে একেবারে বাজের মতন।

বলে, তিনি তন্ময় হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলেন বাজনা। নিজেও আসরে গেলেন না, গোপালবাবুকেও যেতে দিলেন না। শেষে সেখান থেকেই দুজনে ফিরে এলেন গুরুর বাড়ি।

তাঁরা সে আসরে না বাজিয়েই চলে এসেছেন শুনে মুরারিমোহন বিরক্ত হলেন।
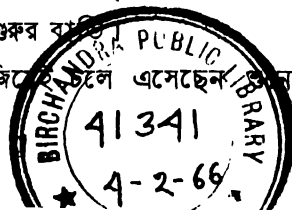
সত্যচরণ ছিলেন সত্যবাদী। তিনি অকপটে নিজের মনের ভাব জানালেন, গুরু-আজ্ঞা পালন না করবার দায়িত্ব নিজের ওপরেই নিয়ে গুরুর মার্জনা ভিক্ষা করলেন। পাছে সতীর্থের ওপরেও গুরু ক্রুদ্ধ হন, তাই বললেন—আমিই গোপালকে আসরে যেতে দিই নি, ও বাজাতে চেয়েছিল। কিন্তু আমরা কেশববাবুর ওই বাজনার পরে আর বাজাব কি? সে কি তেহাই আর .বজ্রের মতন ধা!

গুণগ্রাহী সত্যচরণ সেদিন যথার্থ গুণীর প্রশংসা না করে পারেন নি। সে গুণী যদি গুরুর প্রতিদ্বন্দ্বী হন, তাতেই বা কি? সত্যকার গুণপনা যেখানে, সেখানে কেন তা স্বীকার করব না? তার প্রাপ্য মর্যাদা দেব না কেন? এই মনোভাব থেকেই তিনি সেদিনকার আসরে কেশববাবুর সঙ্গে টক্কর দিতে যান নি। সাহস বা যোগ্যতার অভাবের জন্যে নয়। ও দুটি বস্তু যে তাঁর বিলক্ষণ ছিল, তার একটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া যাক। কেশবচন্দ্রের প্রসঙ্গ আপাতত স্থগিত থাক কিছুক্ষণের জন্যে।

সত্যচরণের এই আসরটি হয়েছিল কাশীতে, কেশববাবুর সেদিনের বাজনার কিছুকাল পরের ঘটনা। সত্যচরণ যে উত্তর-জীবনে কাশীবাসী হয়েছিলেন, সেই সময়ের কথা। তখন কাশী-নরেশের দরবারে উত্তর ভারতের দেশীয় নৃপতিদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। সেই উপলক্ষ্যে আগত রাজাদের সামনে একদিন কাশীরাজের সভায় একটি সঙ্গীতাসর বসে।

সে আসরের যিনি প্রধান গায়ক, তাঁর নাম গুরু বালাজী। গোয়ালিয়রের দুর্ধর্ষ ধ্রুপদী। অতি প্রবীণ—গুণে এবং বয়সেও। তাল-লয়ে অতিশয় দক্ষ। তাঁর সেই বার্ধক্য দশাতেও জরা তাঁর সঙ্গীত-শক্তিকে পরাস্ত করতে পারে নি। সেই বয়সেও তিনি রীতিমত দাপটের সঙ্গে গান করেন এবং তালাধ্যায়ে যেমন কূট তেমনি অটুট নৈপুণ্য। শোনা যায়, তিনি গোয়ালিয়রের স্বনামধন্য গুণী হদ্দু খাঁর শিষ্য ছিলেন।

গুরু বালাজী সেই বিশিষ্ট আসরে রাগমালা গাইতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু একই তালে সব রাগ নয়। প্রতিটি রাগ ভিন্ন তালে পরিবেশন করে তিনি মুন্সীয়ানা দেখাতে লাগলেন। তাঁর গান খুবই উপভোগ করছিলেন শ্রোতারা। কিন্তু বিপদ হল সঙ্গতকারদের।

বালাজীর গানের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে বেসামাল হয়ে পড়তে লাগলেন পাখোয়াজীরা। একজন-দুজন নন। কাশীর কয়েকজন বড় বড় পাখোয়াজ-বাজিয়ে একের পর এক গুরুজীর সঙ্গে সঙ্গত করতে গেলেন, কিন্তু কেউই

বাজাতে পারলেন না হাত খুলে। কাউকেই জমিয়ে ধা মারতে শোনা গেল না। গায়কের মনের মধ্যেও হয়তো সেই কামনা ছিল, মুখে না বলে কাজে দেখাতে লাগলেন।

অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, এক একজন পাখোয়াজ কোলে নিয়ে বসছেন আর বাজনা শেষ করছেন অপ্রস্তুত হয়ে। সেই অতি-বৃদ্ধ ধ্রুপদী, যাঁর মুখের চর্ম লোল হয়েছে, ভ্রূ জোড়া চোখের ওপর ঝুলে পড়েছে, পালোয়ান পালোয়ান পাখোয়াজীদের কচুকাটা করতে লাগলেন গণ্যমান্য শ্রোতাদের সামনে।

গতিক দেখে তখন উদ্‌যোক্তাদের একজন সত্যবাবুকে বাজাতে অনুরোধ করলেন। তিনি একবার চেষ্টা করে দেখুন, যদি আসর রক্ষা হয়।

সত্যবাবুর সেখানে বাজাবার কথা ছিল না। কিন্তু তিনি তাঁদের আবেদন এড়াতে পারলেন না। পাখোয়াজ নতুন করে বেঁধে নিয়ে বালাজীর সঙ্গে বাজাতে আরম্ভ করলেন। এতক্ষণ পরে সত্যিকার সঙ্গতের পরিচয় পেয়ে শ্রোতারা যেমন চমৎকৃত হলেন, তেমনি গায়কও। ভাঙা আসর আবার জোড়া লাগল। সত্যবাবুর তৈরী হাতে, তাল-লয়ের নিখুঁত হিসেবে, ছন্দ-সৃষ্টির নৈপুণ্যে আর উচ্চকিত ধা মারবার কৃতিত্বে শ্রোতারা উল্লসিত হয়ে উঠলেন।

আসরের সব আমন্ত্রিত পশ্চিমা বাদকরা ব্যর্থ হবার পর সেদিন বাংলার মুখোজ্জ্বল করলেন সত্যচরণ।

এবার কেশববাবুর প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক্। আগেই বলা হয়েছে যে, তিনি বিখ্যাত ধ্রুপদী মুরাদ আলীকে কয়েকমাস নিজের বাড়িতে রেখেছিলেন। মুরাদ আলী, শোনা যায়, প্রথমে কলকাতায় আসেন নবাব ওয়াজিদ আলীর মেটেবুরুজ দরবারে নিযুক্ত হয়ে। কিন্তু তিনি বেশীদিন নবাবের বেতনভুক ছিলেন না। কারণ অত্যন্ত মেজাজী মানুষ ছিলেন মুরাদ আলী। আত্মসম্মান এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়েছে মনে করলে কিংবা কোন কারণে মেজাজ একবার বিগড়ে গেলে তিনি কোথাও তিষ্ঠতেন না, তা সে-জায়গায় যতই সুখ-সুবিধা থাক। নবাব ওয়াজিদ আলী তাঁকে নাকি একদিন একটি অসময়ের রাগ গাইতে ফরমায়েশ করায় তিনি দরবারের চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে আসেন, ইতি জনশ্রুতি। তাঁর এমনি স্বভাবের সম্বন্ধে আরও গল্প শোনা যায়। মেজাজের জন্যে তাঁকে রাখা অনেকের পক্ষেই কঠিন হত।

কিন্তু ধ্রুপদ-গায়ক হিসেবে তাঁর ছিল অপরিসীম মর্যাদা। পশ্চিমের নানা অঞ্চল থেকে যত গুণী গায়ক সেকালে বাংলায় আসেন তাঁদের মধ্যে তাঁর তুল্য খুব কমই ছিলেন। গলায় ছিল তাঁর অপূর্ব জোয়ারীর ঐশ্বর্য আর তাল-লয়ের

পাকা ভিত্তিতে স্বরের সূক্ষ্ম অলঙ্করণ। এইসব গুণে গায়ক মুরাদ আলী ভারতের সঙ্গীতক্ষেত্রে একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলে গণনীয় ছিলেন। তাঁর প্রিয় রাগ ছিল মালকোষ আর ইমন এবং সেই দুটিতে সিদ্ধ ছিলেন তিনি। বাংলাদেশে তিনি অনেক বছর বাস করেন এবং কয়েকজন বাঙ্গালী তাঁর কৃতী শিষ্য হয়েছিলেন। যথা—(ময়ূরভঞ্জ রাজার সভাগায়ক) যদুনাথ রায়, কিশোরীলাল মুখোপাধ্যায়, অঘোরনাথ চক্রবর্তী, অবিনাশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি। তাঁর মৃত্যু ও সমাধিও ঘটে কলকাতায় গোয়াবাগান অঞ্চলে, তাঁর শিষ্য অবিনাশ ঘোষের বাড়িতে।

কেশববাবুর (ভবানীপুর) পদ্মপুকুর রোডের বাড়িতে মুরাদ আলী থাকবার সময় নিয়মিত তাঁদের গান-বাজনার আসর বসত। মুরাদ আলী গাইতেন, কেশবচন্দ্র পাখোয়াজ সঙ্গত করতেন। বিচারপতি রমেশ মিত্রও অনেক সময়ে উপস্থিত থাকতেন এই ঘরোয়া আসরে।

সেদিনটা ছিল শনিবার। কেশববাবুর বাড়িতে আসর বসেছে। মুরাদ আলী গাইছেন আর তিনি পাখোয়াজ বাজাচ্ছেন। স্যর রমেশচন্দ্র এবং কয়েকজন বন্ধুবান্ধব আছেন শ্রোতাদের মধ্যে।

বাজাতে বাজাতে কেশববাবু হঠাৎ একটি কাণ্ড করলেন। নিছক নিজের খেয়ালের বশে করলেন, না রমেশচন্দ্র সেদিন আগে থেকে তাঁকে এবিষয়ে প্ররোচনা দিয়েছিলেন (এরকমও শোনা গেছে) ঠিক জানা যায় না। তবে কাণ্ডটা কেশববাবু সেদিনের আসরে ঘটালেন।

তিনি সঙ্গতের একসময়ে পর পর একুশটা ধা মারলেন মুরাদ আলীর গানের সঙ্গে। একুশটা ধা এই ভাবে দেওয়া খুবই শক্ত এবং খুব কম পাখোয়াজীই তা দিতে পারেন। কিন্তু ব্যাপারটি শুধু মুন্সীয়ানার কথা নয়, তার মধ্যে আর একটু বিশেষ তাৎপর্য আছে গায়কের সম্পর্কে। পাখোয়াজী একাদিক্রমে একুশটা ধা মারলে গায়কের পক্ষে নাকি সম্মানহানিকর হয়ে পড়ে। এতে যেন গায়ককে টেক্কা দেবার মতন শোনায়। ধ্রুপদীর ওপর ছাপিয়ে উঠে পাখোয়াজী যেন নিজেকে জাহির করে তাঁকে নস্যাৎ করে দেন, এমন ধারণাও একুশটা ধা মারার জন্যে হতে পারে। গায়কের এটা এক ধরনের পরাজয়ের শামিল।

অন্তত এক্ষেত্রে মুরাদ আলীর তাই মনে হল। কারণ কেশববাবুর বাড়িতে তিনি অতিথি শিল্পী এবং কেশববাবু বাজাচ্ছেন নিজের বাড়িতে বসে। মুরাদ আলী অত্যন্ত আত্মাভিমানী। তিনি মুখে কিছু তখন বললেন না বটে, কিন্তু ব্যাপারটাকে অতিশয় গুরুতর ভাবে নিলেন। গান-বাজনা সেদিনকার মতন

শেষ হল, কিন্তু তার জের সেখানেই চুকল না। মুরাদ আলীর মনের ওপর আরম্ভ হল তার প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া।

অপমানে আর অন্তর্জ্বালায় তিনি সে রাত্রে শয্যার ধারেও গেলেন না, ঘুম দূরের কথা। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে তিনি সারারাত পায়চারি করতে লাগলেন। আর চাকরটিকে মোতায়েন রাখলেন ঘন ঘন তামাক সেজে দেবার জন্যে। তামাকের ধোঁয়া ছাড়া মুখে আর কিছু ঠেকালেন না। তিক্ত বিষাক্ত অন্তর। একটি মাত্র ক্রুদ্ধ চিন্তা তাঁর সমগ্র চৈতন্য আচ্ছন্ন করে আছেঃ কেশববাবু আমায় এমন করে অপমান করলেন। আমি মুরাদ আলী খাঁ! আমায় একুশটা ধা শোনালেন নিজের বাড়িতে, দশজনের সামনে। এর প্রতিশোধ নিতে হবে!

এমনিভাবে শনিবার রাত কাটল। রবিবার সকালে তিনি কেশববাবুকে বলে পাঠালেন—আজ সন্ধ্যের পর আসরের ব্যবস্থা করুন। আমি আজও গাইব। কাল যাঁরা আসরে ছিলেন, তাঁরাও সবাই যেন আজ আসেন।

পরের দিনেই মুরাদ আলী এইভাবে আগের রাত্রের শ্রোতাদের সামনে গাইতে চেয়েছেন শুনে কেশববাবুর সন্দেহ হয়েছিল। গত দিনের আসরে একুশটা ধা মারবার পর গানের শেষে খাঁ সাহেবের মেঘাচ্ছন্ন মুখ দেখে তাঁর মনে হয়েছিল যে, কাজটা ঠিক হয় নি। মুরাদ আলী মনে বড় আঘাত পেয়েছেন। তার পর সকাল বেলা খবর পেয়েছিলেন যে, খাঁ সাহেব সারারাত ঘুমোন নি। ঘরময় পায়চারি করেছেন আর ঘন ঘন তামাক খেয়েছেন। এসবের পর আবার সকালেই যখন খবর পাঠিয়েছেন আজই আসর বসাতে, তখন কেশববাবু আন্দাজ করলেন ব্যাপারটি। কিন্তু আসর তো বন্ধ রাখা চলে না।

সন্ধ্যার পরে শ্রোতারা একে একে এলেন। আরম্ভ হল মুরাদ আলীর গান। কেশবচন্দ্র তাঁর মুখোমুখি পাখোয়াজ নিয়ে বসলেন।

মুরাদ আলী ঢিমা লয়ের গায়ন-পদ্ধতিতে সুদক্ষ ও সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন (এবং তাঁর শিষ্যরাও সেজন্যে ঢিমা চালে নিপুণতার পরিচয় দেন)। সেদিনও তিনি গাইতে লাগলেন অতিশয় বিলম্বিত লয়ে, অতি কূট কায়দায়। পাখোয়াজী যত বড় লয়দারই হোন, এত ঢিমা লয়ে এমন কড়া চালে গানের সঙ্গে হাত খুলে বাজাতে পারেন না, স্ফূর্তি আসে না তাঁর সঙ্গতে। এক্ষেত্রেও গায়ক মৃদঙ্গীর হাত বেঁধে ফেললেন।

কেশববাবু বুঝলেন, খাঁ সাহেব গত রাতের শোধ নিচ্ছেন। তিনি হাত খুলতে পারলেন না, সেই সব বজ্রের মত ধা মারতে অপারগ হলেন। কিন্তু খাঁ

সাহেবকে আর কিছু বলা চলে না তখন। শ্রোতারা কেশববাবুর বেকায়দা অবস্থা দেখলেন। তাঁর বাজনা আদৌ জমল না।

তার পর এক সময়ে গান শেষ হল। কিন্তু সেখানেও শেষ হল না ব্যাপার। খাঁ সাহেব তার পরের দিন সে বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন। কেশববাবুর অনেক অনুরোধেও আর রইলেন না সেখানে।

কেশবচন্দ্রের আর একটি আসরের কথা এবার বলা হবে। তাঁর অদ্ভুত দ্বি-ধার কাহিনী। রাণী রাসমণির জানবাজারের অট্টালিকায় এই আসর হয়েছিল। বেশ বড আসর। কয়েকজন গায়ক বাদক সেই সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু সে আসরে প্রধান গায়ক ছিলেন অঘোরনাথ চক্রবর্তী এবং প্রধান সঙ্গতকার —কেশবচন্দ্র।

অঘোরনাথের সব চেয়ে কৃতী শিষ্য, ধ্রুপদী গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সে আসরে উপস্থিত ছিলেন। এবং পরবর্তীকালে তিনিই সে আসরে অঘোরবাবুর সঙ্গে কেশবচন্দ্রের সঙ্গতের চমকপ্রদ বিবরণ এমনি ভাবে গল্পচ্ছলে বলতেন ঃ চক্রবর্তী মশায়ের গানের সঙ্গে পাখোয়াজ বাজাচ্ছিলেন কেশববাবু। আসরে অনেক সমঝদার ছিলেন। গান-বাজনা খুব জমে উঠেছে। বেশ ভালই হচ্ছিল কেশববাবুর সঙ্গত। কিন্তু তিনি বাজাতে বাজাতে হঠাৎ—বোধ হয় অন্যমনস্ক হয়ে—এক সমের মাথায় দুটো ধা মেরে দিলেন ; যে সব সমঝদার শ্রোতা এক মনে শুনছিলেন, তাঁরা কেশববাবুর অসাবধানে দুটো ধা মারার ভুলটি বুঝতে পারলেন। একজন তো স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন—এটা কি হল ? কেশববাবু কিন্তু অপ্রস্তুত হলেন না। অদ্ভুত ভাবে মানিয়ে নিয়ে বললেন, বাজনা থামিয়ে—ওঃ আপনাদের বলা হয় নি, আজ বাড়ি থেকে বেরুবার সময় মনে আমার দ্বিধা ছিল। আমি ঠিক করেছিলুম একটার জায়গায় দুটো করে ধা মারব। ওটা আমি ইচ্ছা করেই মেরেছি। ভুল নয়।—এই বলে আবার সঙ্গত আরম্ভ করলেন। আর তার পর যতবার ধা মারবার দরকার হল, প্রত্যেক বারই দুটো করে ধা মারতে লাগলেন। অথচ ভুল কিছুই মনে হল না, এখন ঠিক ঠিক মাত্রা হিসেবে ধা পড়তে লাগল। আসরে সকলেই অবাক হয়ে গেলেন। এমন ব্যাপার সত্যিই শোনা যায় না। কেশববাবু ভুলটাকেই সামলে মানিয়ে নিয়ে ঠিক দাঁড় করিয়ে দিলেন। দুটো করে ধা আর মোটেই ভুল শোনাল না। আরও অনেকক্ষণ তিনি এইভাবে বাজালেন। অঘোরবাবু তার পর যে-ক'টি গান গাইলেন সব এক তালে নয়, আলাদা আলাদা তালে তাঁর গান হল। কেশববাবুই তাঁর সঙ্গে বরাবর বাজালেন আর সব রকম তালেই

ওইভাবে দুটি করে ধা মেরে গেলেন। তাঁর ভুল ধরবার ক্ষমতা আর কারুর হল না সে আসরে।

এবারে তাঁর জীবনের শেষ বাজনার কথা বলে তাঁর কথা শেষ করা হবে। তিনি যখন বাজনা ত্যাগ করলেন, তখনও তাঁর হাত বয়সের পক্ষে বেশ তৈরিই ছিল। ইচ্ছে থাকলে আরও কিছুকাল অক্লেশে বাজাতে পারতেন। কিন্তু তিনি নিজে থেকেই ছেড়ে দিলেন বাজনা।

পাখোয়াজ তাঁর শুধু সাধনার বস্তু নয়, শখেরও। আর তিনি ঠিক করেছিলেন, কোন রকম শখ আর জীবনে করবেন না। তাই বিসর্জন দেন জীবনের সব চেয়ে বড শখ। সব চেয়ে বড সাধ।

যে দিনের কথা এখানে বলা হচ্ছে, সেদিন তাঁর সঙ্গতে কে গান গাইছিলেন, তা জানা যায় নি। তবে সে গান আর তাঁর বাজনা বেশ ভালই হচ্ছিল। কিন্তু শ্রোতাদের মধ্যে কেউ জানতেন না, মনের মধ্যে কি গভীর উৎকণ্ঠা আর দুর্ভাবনা নিয়ে কেশববাবু বাজাচ্ছিলেন। তাঁর একমাত্র ও উপযুক্ত পুত্র তখন কর্মস্থলে, কলকাতা থেকে অনেক দূরে, বিহারের একটি শহরে কঠিন রোগাক্রান্ত হয়ে রয়েছেন। তাঁর কুশল সংবাদ এখনও পান নি। বাইরে থেকে মনে হচ্ছিল নিবিষ্ট মনে বাজাচ্ছেন, কিন্তু মনে তখন তাঁর দুশ্চিন্তার কালো ছায়া।

এমন সময় তাঁর নামের একটি টেলিগ্রাম নিয়ে সেই ঘরে লোক এল। তিনি তা দেখে বাজাতে বাজাতেই ইশারা করে টেলিগ্রামটি রেখে দিতে নির্দেশ দিলেন। আর বললেন—এখন খুলো না। আমি জানি ওতে কি আছে।

তার পর যখন গান শেষ হল, কেশববাবু শেষ ঘা দিয়ে পাখোয়াজ কোল থেকে নামিয়ে টেলিগ্রামটি পড়ে দেখলেন। কালো কালো অক্ষরে লেখা কাল সংবাদ : পুত্রের মৃত্যু হয়েছে।

সেই দিন থেকে আর কেউ পাখোয়াজ বাজাতে দেখে নি কেশববাবুকে।

সুরের আগুন

নাম ছিল তাঁর গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী। কিন্তু সে নামে আজ আর ক'জন তাঁকে চিনবে? তাঁর হাত দুটি একটু ছোট ছিল বলে প্রাকৃতজনের মুখে তাঁর নাম দাঁড়িয়ে যায়—নুলো গোপাল। এই ভব্যতাহীন নামেই তিনি প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন, আসল নাম গেছে লুপ্ত হয়ে। অত বড় এক গুণী গায়ক শ্রুতি-

স্মৃতিতে বেঁচে আছেন তাঁর এক শারীরিক ত্রুটিতে চিহ্নিত হয়ে, আমাদের জাতি-গত রুচির কল্যাণে। আমাদের একটি জাতীয় বৈশিষ্ট্য যে অপরের ছিদ্র অনুসন্ধান করা, তা পরের দেহের ত্রুটির কথাও ঘটা করে প্রচার করে। তাই আমাদের সমাজে যেমন, তেমনি সঙ্গীতের আসরেও এক এক গুণীর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে এক একটি অশিষ্ট শব্দ : নুলো, কানা, কুটে ইত্যাদি।

উনিশ শতকের বাংলায় যে ক'জন শ্রেষ্ঠ গায়ক জন্মেছেন, গোপালচন্দ্র তাঁদের মধ্যে একজন। ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা তিন অঙ্গের গানেই তাঁর অসামান্য দক্ষতা ছিল। সেকালের ভারত-প্রসিদ্ধ হিন্দুস্থানী ওস্তাদদের সঙ্গে এক আসরে সমান মর্যাদায় তিনি অনেকবার গেয়েছেন—শুধু বাংলাদেশে নয়, পশ্চিমাঞ্চলেও। খেয়াল গানে বাঙ্গালীদের মধ্যে তাঁকে একজন আদি পুরুষ বলা যায়। তাঁর আগেকার বা তাঁর সমসাময়িক বাঙ্গালী খেয়াল-গায়কদের মধ্যে তাঁর তুল্য খ্যাতিমান আর কেউ ছিলেন কি না সন্দেহ।

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের তিনি ছিলেন প্রধান সভাগায়ক এবং তাঁরই আনুকুল্যে তিনি পশ্চিমাঞ্চল থেকে রীতিমত সঙ্গীত শিক্ষা করে আসেন। তাঁর প্রধান সঙ্গীতগুরু ছিলেন, বারাণসীর শতায়ু ধ্রুপদগুণী গোপালাপ্রসাদ মিশ্র। কাশীর এই ধ্রুপদী পরিবারের কাছে বাংলাদেশের ঋণ কম নয়। গোপালাপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সারদাসহায়ের কাছে তালিম পেয়েছিলেন সে যুগের বিখ্যাত খেয়াল ও টপ্পা গায়িকা যাদুমণি। আর কনিষ্ঠ লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্রের (বীণ্‌কার) কাছে যন্ত্রসঙ্গীত শিখেছিলেন ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও শৌরীন্দ্র-মোহন ঠাকুর। গোপালাপ্রসাদের কাছে গোপালচন্দ্র অনেক বছর ধ্রুপদ শিক্ষা করেন।

তাঁর খেয়ালের ওস্তাদ ছিলেন গোয়ালিয়রের স্বনামধন্য গায়ক হদ্দু খাঁ, হস্‌সু খাঁ। তখনকার কালে সারা ভারতবর্ষে এই দুই খেয়ালিয়া ভাইয়ের মতন প্রসিদ্ধ ও গুণী বেশী ছিলেন না। আর গোপালচন্দ্র ভিন্ন অন্য কোন বাঙ্গালী হদ্দু-হস্‌সু খাঁর তালিম ভালভাবে পেয়েছিলেন বলেও শোনা যায় না।

এমনি সব কলাবতদের শিক্ষা পেয়ে তাঁর সঙ্গীতজীবন বিকশিত হয়। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁর সঙ্গীত-প্রতিভা দেখে যে পশ্চিমে থেকে তাঁর সঙ্গীত-শিক্ষার সুব্যবস্থা করেছিলেন, তাও হয় সার্থক।

ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা তিন রীতির গানেই গোপালচন্দ্র সিদ্ধ ছিলেন এবং আসরে তিন ধরনের গান গাইতেন ইচ্ছা মতন। তার মধ্যে খেয়ালে তিনি নিজস্ব এমন একটি শৈলী গড়ে তুলেছিলেন, যে-জন্যে তাঁর গান শ্রোতাদের

খুবই আকৃষ্ট করত। গানের মধ্যে তিনি চমৎকার তেলেনার প্রয়োগ করতেন প্রয়োজন মতন, আর সেসব ছিল, extempore তা বলাই বাহুল্য। অর্থাৎ তখনকারই রচনা, বাঁধা জিনিস নয়। এমন সুন্দর করে তিনি এইসব তেলেনার সন্নিবেশ ঘটাতেন যে গানের সৌন্দর্য বহুগুণ খুলে যেত এবং অভাবিত পথে। একটা অপ্রত্যাশিত আনন্দে শ্রোতারা অভিভূত হয়ে পড়ত আর গানও সুরের কারুকর্মে জমাট বাঁধত। গোপালচন্দ্র ছিলেন সৃজনশীল শিল্পী।

চিরকুমার গোপালচন্দ্র দীর্ঘকালের একনিষ্ঠ সাধনায় গলাটি অসাধারণ তৈরী করেছিলেন। তাঁর সেই কণ্ঠনৈপুণ্যের কিছু কিছু পরিচয় বিধৃত আছে সঙ্গীত-সমাজের শ্রুতিস্মৃতিতে। তার কয়েকটি উল্লেখ করলে তাঁর গানের বিষয়ে খানিক ধারণা হতে পারে।

তাঁর পরবর্তী যুগের গুণী, সুরশৃঙ্গার বাদক ও ধ্রুপদী প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (গোপালচন্দ্রের চেয়ে ত্রিশ বছরের বয়োকনিষ্ঠ) সঙ্গীতচর্চা বেশ কিছুকাল আরম্ভ করবার পর চক্রবর্তী মশায়ের গান শুনেছিলেন। তিনি বলতেন যে, গোপাল-বাবুর গলার আওয়াজ 'ঝিম' ছিল। তাঁর গলা চড়ত না বলে তারা গ্রামে কাজ করতেন না। মুদারা গ্রামের মধ্যেই তাঁর গলা বেশি খেলত আর যা কিছু কাজ সবই ওই পাঁচ-ছটা পর্দায়। কিন্তু ওই ক'টি পর্দাতেই এমন অদ্ভুত সুরের কাজ তিনি করতেন যে কি বলব!

আধুনিক ঠুংরি গানের অন্যতম প্রবর্তক গোয়ালিয়রের বিখ্যাত গণপৎরাওয়ের (ভাইয়া সাহেব) সুযোগ্য শিষ্য শ্যামলাল ক্ষেত্রী বলতেন যে, গোপালবাবু অতি বুদ্ধিমান ও গুণী গায়ক ছিলেন এবং তাঁর অনুকরণ করবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল।

বাংলা সাহিত্যের বীরবল, সঙ্গীতরসিক ও সঙ্গীত-তাত্ত্বিক প্রমথ চৌধুরী চক্রবর্তী মশায়ের একেবারে শেষ বয়সে তাঁর গান শুনেছিলেন। তবু তা কত উচ্চশ্রেণীর ছিল তা তিনি "আত্মকথা"য় লিখেছেন—(গোপালচন্দ্রকে) "বৃদ্ধ বয়সে আমি দেখেছি। তখন তাঁর গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোত না। তিনি আমার এবং আমার খুড়শ্বশুর মহাশয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুরোধে ফিস্ ফিস করে একটি গান গাইলেন। আমি অবাক হয়ে গেলাম। কি মিষ্টি তাঁর তান। কি দরদী তাঁর মিড। আর বুঝলাম যে এঁর যখন গলা ছিল, তখন ইনি একটি অসাধারণ গাইয়ে ছিলেন।"

আচার্য রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, যিনি প্রথম জীবনে কলকাতায় এসে কিছুদিন গোপালচন্দ্রের কাছে গান শিখেছিলেন, বলতেন যে, অমন সুরেলা গলা খুব কম শুনেছি।

গোপালচন্দ্রের এক প্রশিষ্য (সাতকড়ি মালাকরের শিষ্য) একটি কথা বলেন, যা বোধ হয় সাতকড়িবাবুর মুখেই শোনা—চক্রবর্তী মশায় এমন চরকির মতন তান ঘোরাতেন যে মনে হত যেন ঘরটাই ঘুরে গেল।

এই সব মতামত থেকে তাঁর গানের আর গলার বিষয়ে একটা আন্দাজ করে নিতে হয়। কারণ তাঁর গানের কোন রেকর্ড নেই। তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের সময়ে এ দেশে গ্রামোফোন রেকর্ডের ব্যবসা আরম্ভ হয় নি।

যেমন শৌখিন স্বভাব তেমনি মেজাজী গাইয়ে ছিলেন তিনি। আসরে গাইতে বসতেন দুপাশে ধূপদানিতে সুগন্ধি ধূপ জ্বালিয়ে রেখে। সেই পরিবেশ তাঁর পক্ষে মনোরম ছিল এবং তাঁর মেজাজ স্ফূর্তি লাভ করত। হাত দুটি ক্ষুদ্রাকার হলেও তিনি সুদর্শন পুরুষ ছিলেন এবং কুঞ্চিত কেশগুচ্ছের নীচে তাঁর তন্ময় মুখভাব ও পরিপাটি বেশভূষায় আসরের মধ্যমণি হয়ে শোভা পেতেন। হাত দুটি সঞ্চালিত করতেন তান কর্তব কিংবা মিড় গমকের বিশেষ বিশেষ ঝোঁকের দোলায়। হাতের সেই সব মুদ্রায় তাঁর গানের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হত, সুরের চিত্রডোর যেন মূর্তিধারণ করত। গানকে আরও হৃদয়গ্রাহী করে তুলত তাঁর বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের ব্যঞ্জনা।

সঙ্গীত-জগতে তাঁর স্থান কোথায় ছিল তা বোঝা যায় তাঁর শিষ্যবৃন্দের কথা মনে করলে। যথাঃ সাতকড়ি মালাকর, লালচাঁদ বড়াল, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী (কিছুদিন), বিষ্ণুপুরের রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণনগরের শশী কর্মকার, আলাউদ্দিন খাঁ, রামতারণ সান্যাল (গিরিশচন্দ্রের অনেক নাটকের সঙ্গীত পরিচালক) প্রভৃতি।

আলাউদ্দিন খাঁর প্রথম জীবনে গোপালচন্দ্র যে প্রধান সঙ্গীতগুরু ছিলেন একথা খাঁ সাহেব উল্লেখ না করলে বোধ হয় অজ্ঞাত থেকে যেত। আলাউদ্দিন খাঁর ('আমার কথা'র) বিবৃতি না পেলে আমরা ধারণা করতে পারতুম না, কোন্ স্তরের সঙ্গীতাচার্য ছিলেন গোপালচন্দ্র আর কি কঠিন সাধন-সাপেক্ষ ছিল তাঁর সঙ্গীত-পদ্ধতি।

আলাউদ্দিন অতি তরুণ বয়সে (তাঁর ত্রিপুরা জেলার শিবপুর গ্রামের) বাড়ি থেকে পলাতক হয়ে কলকাতায় এসে যখন গোপালচন্দ্রের কাছে গান শিখতে চান, তখন চক্রবর্তী মশায় তাঁকে বলেন যে, বারো বছর স্বর সাধনা করতে হবে।

আলাউদ্দিন তাতেই রাজী। তাঁকে অনেকদিন কষ্ট করতে দেখে তবে গুরুর শিক্ষাদান আরম্ভ হল। সে শিক্ষার পদ্ধতিতে শিষ্যকে সাধনা করতে হত এইভাবেঃ এক পায়ে তাল, অন্য পায়ে মাত্রা। এক হাতে তানপুরা, অন্য

হাতে তবলা।

গোপালচন্দ্রের নির্দেশে এইভাবে আলাউদ্দিন রেওয়াজ করতেন। সাত বছর গোপালচন্দ্র তাঁকে সার্গম শেখান আর তিনশ' রকম পাল্‌টি। গুরুর কাছে শিক্ষা অবশ্য আলাউদ্দিনের শেষ হয় নি। তার আগেই ছেদ পড়ে, চক্রবর্তী মশায়ের মৃত্যুতে। এবং তাঁর মৃত্যুর পর আলাউদ্দিন খাঁ গান ছেড়ে দেন এবং যন্ত্র ধরেন।

গোপালচন্দ্রের এই সব বিখ্যাত শিষ্য ছাড়া আরও কয়েকজন ছিলেন, তাঁরা তেমন খ্যাতিমান হন নি। যেমন—এণ্টালির ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেব, শোভা-বাজারের বিনোদকৃষ্ণ মিত্র (সরোদ-বাদক নীরেন্দ্রকৃষ্ণের পিতা এবং শোভা-বাজার রাজপরিবারের দৌহিত্র), বরেন্দ্রনাথ ঠাকুর (মহারাজা রমানাথ ঠাকুরের পৌত্র), লক্ষ্মীকান্তপুরের রাজমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

কাশীর বিখ্যাত ধ্রুপদগুণী ও সঙ্গীত-গ্রন্থলেখক হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়কে চক্রবর্তী মশায় কল্যাণের রাগমালা ও দরবারী কানাড়া শিক্ষা দেন, এ কথা হরিনারায়ণ তাঁর একটি পুস্তিকায় উল্লেখ করেছেন।

গোপালচন্দ্রের কণ্ঠস্বরের প্রসঙ্গ একটু আলোচনা করে তাঁর একটি আসরের ঘটনার কথা বলা হবে।

সুরশৃঙ্গার-বাদক প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় দেখা গেছে যে, চক্রবর্তী মশায়ের গলা ছিল চাপা, ঝিম্‌। চড়ার দিকে গলা একেবারে উঠত না।

শুধু প্রমথনাথ নয়, যাঁরা গোপালচন্দ্রের পরিণত বয়সের গান শুনেছেন, তাঁদের সকলেরই ঐ মত। তেমনি শ্রোতা-পরম্পরায় আরও একটি কথা চলিত আছে: ঐ রকম বসা গলা তাঁর প্রথমে ছিল না। হয়েছিল পরিণত বয়সে। কিন্তু বয়সের বা জরার জন্যে তা নয়।

এক ব্যক্তি আক্রোশের বশে তাঁর গলার এই সাংঘাতিক ক্ষতি করেছিল। চক্রবর্তী মশায়ের পানের সঙ্গে কিছু বিষাক্ত জিনিস মিশিয়ে তাঁকে নাকি খাওয়ানো হয়, যার ফল তাঁর সেই স্বরবিকৃতি।

সেকালে সঙ্গীতক্ষেত্রে রেষারেষির ফলে কখনও কখনও এমন ঘটতে শোনা যেত। গোপালচন্দ্রের এই ঘটনাটিও একাধিক সূত্রে শোনা যায়। তাঁর সঙ্গে যে এই শত্রুতা করেছিল, সে কিন্তু তাঁরই এক ছাত্র। তবে তাঁর যে শিষ্যদের নাম আগে জানানো হয়েছে সে তালিকায় তার নাম নেই। এমনি ভাবে বৃত্তান্তটি পাওয়া যায়: তাঁর সেই ছাত্রটি সঙ্গীত-শিক্ষার আশায় অনেক দিন তাঁর কাছে ধর্ণা দিয়েছিল। কিন্তু তিনি তাকে আদৌ আমল দিতেন না তার যোগ্যতার

অভাবের জন্যে। শিক্ষার্থীটি ছিল ধনীর সন্তান আর গুরুর মন আকর্ষণ করবার জন্যে খরচও বেশ করত। সঙ্গীত বিষয়ে তার শক্তির অভাব বা অক্ষমতার কথা কিন্তু সে বুঝতে চাইত না। তার ধারণা হয়েছিল যে গুরু তাকে বিদ্যা দান করতে নারাজ হয়েছেন অকারণে, অন্যায় ভাবে। শেষ পর্যন্ত সঙ্গীত-বিদ্যা তাঁর কাছে কিছুই পাবার আশা নেই দেখে সে গুরুর কণ্ঠের সর্বনাশ করে দিতে চায় প্রতিশোধ নেবার জন্যে। একদিন চক্রবর্তী মশায়কে পানের সঙ্গে পারা আর সিঁদুর নাকি খাইয়ে দেয়। তার পর থেকেই তাঁর গলার আওয়াজ যায় বসে। আর তা আগেকার শক্তি ফিরে পায় নি।

এবারে তাঁর সেই আসরের গল্প। সে ১৮৯১-৯২ সালের কথা।

আসর সেদিন ভালই ছিল। বাংলার ক'জন শ্রেষ্ঠ গায়ক-বাদক সেখানে ছিলেন। আর ছিলেন সমঝ্‌দার অনেক শ্রোতা। জম্‌জমাট আসর।

গায়কদের মধ্যে গোপালচন্দ্র ছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন অঘোরনাথ চক্রবর্তী। অঘোরবাবুর (চক্রবর্তী মশায়ের চেয়ে কুড়ি বছরের বয়োকনিষ্ঠ) তখন বয়স প্রায় চল্লিশ বছর। আর তাঁর সঙ্গীত-প্রতিভার পূর্ণ বিকশিত অবস্থা। শিক্ষাপর্ব সমাপ্ত করে গায়করূপে তাঁর তখন খুব নাম-ডাক। ওস্তাদ আলীবক্সের কাছে তিনি রীতিমত তালিম পেয়েছেন। তার পর মহাগুণী ধ্রুপদী মুরাদ আলী আর দৌলৎ খাঁর কাছেও ধ্রুপদ শিখেছেন। তা ছাড়া, শ্রীজান বাঈয়ের কাছে করেছেন টপ্পা সংগ্রহ। আবার ভোলানাথ দাসের কাছে নিয়েছেন ভজন গীতাবলি। এমনি ভাবে তাঁর সঙ্গীত-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে। তার ওপর তাঁর গলা ছিল যেমন তৈরি, তেমনি মাধুর্যে ভরা। কণ্ঠসম্পদের জন্যই অঘোরনাথ অনেক সময়ে আসর মাৎ করতেন আর নিজের গলার সেই জাদু বিষয়ে সচেতন ছিলেন। যখনকার কথা বলা হচ্ছে, তখনও কণ্ঠে তাঁর যৌবনের সতেজ সজীবতা। জরার আক্রমণ থেকে নিরাপদ দূরত্বে অঘোরনাথ বিরাজ করছেন প্রখর প্রতিভার মধ্যগগনে।

আর তখন ষাট উত্তীর্ণ গোপালচন্দ্র বার্ধক্যের কবলে। যৌবনের সে পরিশীলিত, শাণিত কণ্ঠস্বর, যে কারণেই হোক আর তাঁর বশে নেই। ইচ্ছামত তাকে তাঁর সুরসত্তার বাহন করে উত্তরাঙ্গে আত্মপ্রকাশ করতে পারতেন না। যত সাধন ও সাধ্য তাঁর আগে ছিল, তা আর শ্রোতাদের পরিপূর্ণ করে দান করবার ক্ষমতা ছিল না তখন। কিন্তু আসরে গান করতেন তখনও, অনুরোধে-উপরোধে। কারণ সুরের ঐশ্বর্য তখনও তাঁর নিঃশেষ হয়ে যায় নি।

সে আসরে গায়কদের মধ্যে অঘোরবাবুর গান আগে হল। তিনি সাধা

গলায় বেশ মেজাজের সঙ্গে গাইলেন—তাঁর সুকণ্ঠে শ্রোতারা যেমন মুগ্ধ হতেন, পরিতৃপ্ত বোধ করতেন—এখানেও তাই হল। সকলের ভাল লাগল তাঁর গান। অনেকে তাঁর গানের সুখ্যাতি করতে লাগলেন। আসরে সৃষ্টি হল সুরের বেশ একটি প্রসন্ন আবহ।

তার পর কার গান আরম্ভ হবে সেজন্যে শ্রোতারা অপেক্ষা করছেন। কেউ কেউ নিজেদের মধ্যে আলোচনায় মেতেছেন অঘোরবাবুর গানের কথা নিয়ে। এমন সময় অঘোরবাবু এমন একটি কথা বলে ফেললেন যে, আসরের সুসমঞ্জস পরিবেশটি একেবারে বদলে গেল।

অঘোরবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন—আগুন জ্বেলে দিয়েছি। এর পরে আর কি গান হবে ?

সঙ্গীতের সেই সূক্ষ্ম ও অনাবিল অনুভবের পরেই তাঁর এই কথাটি বড় স্থূল আর দাম্ভিক শোনাল। আর হৃদয়হীনও বটে। কারণ চক্রবর্তী মহাশয়ের তুল্য প্রবীণ গুণী যখন স্বয়ং আসরে উপস্থিত। তাই অঘোরবাবুর কথাটি অনেকেরই মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলে। হয়তো অঘোরবাবু গোপালচন্দ্র কিংবা অন্য কোন গায়ককে কটাক্ষ করে কথাটি বলেন নি। হয়তো অহঙ্কারে মত্ত হয়েও মন্তব্যটি করেন নি তিনি। হয়তো সার্থকতার আনন্দে সরল প্রাণেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু সেই স্থান-কালে কথাটি আদৌ ভাল শোনাল না। শ্রোতাদের মধ্যে অনেকেই চঞ্চল হয়ে উঠলেন, মনে তাঁদের ক্ষোভ জাগল। আর অনেকের আপনা থেকেই চোখ পড়ল চক্রবর্তী মশায়ের মুখের দিকে।

তাঁর হৃদয়ও সরাসরি বিদ্ধ হয়েছিল। আর অচিরেই তার প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। তিনি একটু নড়ে-চড়ে বসে যেন আত্মস্থ হয়ে নিলেন। তার পর মুখে-চোখে ভয়ের ভাব ফুটিয়ে ব্যঙ্গের সুরে বললেন অঘোরনাথের দিকে ফিরে—ওরে বাবা, আগুন জ্বালিয়ে দিলি ? বলিস্ কি রে ? আমি বুড়োমানুষ, ছুটে পালাতেও পারব না। পুড়ে-ঝুড়ে মরব নাকি ? আচ্ছা মুশকিলেই পড়া গেল তো ?

তার পর কণ্ঠ আরও কঠিনে পরিবর্তিত করে নিয়ে শুভ্র কুঞ্চিত কেশভরামাথা উঁচু করে আর দীর্ঘ বপু ফুলিয়ে অঘোরবাবুকে বলে উঠলেন—আচ্ছা, এবার আমি একটু গান আরম্ভ করি। শোন্। শুধু তুই কেন ? তোর বাক্স-টাক্স* কি সব আছে নিয়ে আয়। শোনাই একটু।

*অঘোরবাবুর প্রধান ওস্তাদ আলী বক্স তীব্র ব্যঙ্গের চোটে এই অপভ্রংশে পরিণত।

বলে সেই এক-আসর শ্রোতাদের চকিত করে গান আরম্ভ করলেন মর্মাহত বৃদ্ধ। 'বাক্‌স-টাক্‌স' আনবার জন্যে ধৈর্য ধরে আর অপেক্ষা করতে পারলেন না। অঘোরবাবু অবশ্য কোন উত্তর দিলেন না। রইলেন মৌন। শ্রোতারা বিস্মিত কৌতূহলে চক্রবর্তী মহাশয়ের গান শুনতে লাগলেন।

সিংহ বৃদ্ধ হলেও সিংহ! শ্রোতাদের এই কথাই মনে হতে লাগল তাঁর গান শুনতে শুনতে, তাঁর কণ্ঠ থেকে উৎসারিত সুরের নির্ঝরিণীর পরিচয় পেতে পেতে। এত সুর এখনও আছে এই বৃদ্ধের মধ্যে? আছে এখনও এমন বিচিত্র, এমন লীলাময় স্বরলহরী? অন্তরের কোন্ গোপন মর্মতল থেকে এই সুরের চঞ্চল ধারা ঝঙ্কারিত হয়ে চলেছে?

মৃদু গুঞ্জরণে স্পন্দিত কণ্ঠে কখন রাগের উদ্‌বোধন করেছিলেন সঙ্গীত-প্রবীণ। বিস্ময়ের ঘোরে তখন আসর নিথর নিষ্কম্প। কখন রাগ বিস্তারের নব নব পথে, রাগরূপের অভাবিত উন্মোচনে শ্রোতাদের মায়ালোকে নিয়ে চলেছেন সুরসাধক —সে চেতনা কারও নেই! সুরের অপরূপ মোহিনী স্পর্শে সকলের চৈতন্য যেন আচ্ছন্ন, মগ্ন হয়ে গেছে। স্তবকে স্তবকে সুর নিঃসারিত হয়ে পরিপূর্ণ করে দিয়েছে আসরের শ্রোতাদের মনের সমস্ত শূন্যতা। সুরের মূর্তিহীন আত্মা যেন শরীরী হয়েছে, স্বরের মুক্ত পক্ষে ভর করে আন্দোলিত হচ্ছে আসরের হাওয়ায় হাওয়ায়! যেন তাকে স্পর্শ করা যায়!

অবশেষে চক্রবর্তী মশায় যখন গান শেষ করলেন, তখন আর বলে দিতে হয় নি যে সুরের আগুন জ্বলেছে কি না। সমস্ত আসর সুরের অপূর্ব আবেশে স্তব্ধ। প্রশংসা করবার কথা ধৃষ্টতা মনে হয়েছে অনেকের।

অঘোরবাবু নির্বাক্, নতমস্তক। তাঁর গানের পরেও এমন গান সে আসরে সম্ভব হল! আর তাও এই বৃদ্ধের কণ্ঠে!

অঘোরবাবুর গানের পরে তাঁর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে চক্রবর্তী মশায় নতুন করে আসর মাত করলেন। কিন্তু তাঁর পরে আর কেউ গান গাইবার কথা কল্পনাও করতে পারলেন না। তাঁর সুরের আগুনে আসর জ্বলে গেছে যে।

নুনের গুণ সবাই গায় না

আমাদের সঙ্গীতক্ষেত্রে all-rounder বা সর্বমুখী গুণী কমই দেখা গেছে। কারণ, ভারতীয় সঙ্গীত শুনতে যতই মধুর হোক, শিখতে বড় কঠিন। এ বিদ্যা যেমন গভীর, তেমনি জটিল। যেমন বিপুল, তেমনি বিচিত্র।

গানেরই কত ভিন্ন ভিন্ন রীতি। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী। বাজনার রকমারি যন্ত্র—বীণা, সেতার, সরোদ, এসরাজ, বেহালা, বাঁশী। সঙ্গতের জন্যে পাখোয়াজ, তবলা। এই সব বাজনা আর গানের এক-একটি শাখা ধরে কত সঙ্গীত-সাধক আজীবন সাধনা করে গেছেন—এত অফুরন্ত তার ভাণ্ডার।

বহুমুখী গুণী তাই ভারতীয় সঙ্গীতে দুর্লভ। এমনি একজন শক্তিধর সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন লক্ষ্মীনারায়ণ বাবাজী।

জীবনের অনেকখানি তিনি সন্ন্যাসীর মতন কাটিয়ে ছিলেন। বেশভূষাও ছিল সন্ন্যাসীর মতন। তাই বাবাজী কথাটি বরাবরের জন্যে তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

প্রথম জীবনে তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যান পশ্চিমের নানা অঞ্চলে। জানা-অজানা বহু ওস্তাদের কাছে অদম্য আগ্রহ নিয়ে সঙ্গীতশিক্ষা করতে যান। অনেক বাধা-বিঘ্ন দুঃখ-কষ্ট সয়ে সঙ্গীতসাগরের বহু রত্ন উদ্ধার করেন তিনি। এক সঙ্গীত-গুরুর সঙ্গলাভ করবার জন্যে তো তীর্থে তীর্থে বহুকাল ঘুরেছেন। সঙ্গীত-শিক্ষায় তাঁর কোনদিন যেন বিরাম ছিল না।

এমনি করে বছরের পর বছর চলে যায় তাঁর নানা কলাবতের কাছে শিক্ষা করতে। তার পর তিনি ফিরে আসেন কলকাতায়। কলকাতায় বাস করবার সময়েও তিনি কয়েকজন ওস্তাদের কাছে তালিম নেন। তখন তাঁর পরিণত বয়স, তবু অফুরন্ত উৎসাহে নতুন করে বিদ্যা অর্জন করেছেন।

যেখানে যাঁর কাছে ভাল কিছু আছে জেনেছেন, তাঁর কাছেই গেছেন শিক্ষার্থী হয়ে। শিক্ষার বিষয়ে তাঁর কোন অহঙ্কার বা অভিমান ছিল না। গুণী পেলে বয়সে তাঁর চেয়ে ছোট হলেও শিখতে দ্বিধা করতেন না। তাই নিজে যখন তিনি কলকাতার সঙ্গীত-সমাজে ধ্রুপদীরূপে সুপ্রতিষ্ঠ, তখন বয়সে ছোট রমজান খাঁর কাছে টপ্পা গান নিতে কোন রকম সঙ্কোচ বোধ করেন নি।

নানা তীর্থের বারি নিয়ে তাঁর সঙ্গীতের ঘট ভরেছিলেন লক্ষ্মীনারায়ণ। তাই তাঁর পরিচয় দিতে গেলে বলতে হয়, একাধারে তিনি ছিলেন খেয়াল-গায়ক ও ধ্রুপদী। ঠুংরী ও টপ্পা গানেও পারদর্শী। তা ছাড়া, বীণকার, সেতার-বাদক ও এস্রাজী। আবার তবলাবাদক ও পাখোয়াজী। এমন বহুমুখী সঙ্গীত-প্রতিভা শুধু বাংলাদেশে নয়, ভারতবর্ষেও দুর্লভ ছিল।

তাঁর সঙ্গীত-কৃতির এই বর্ণনা অবিশ্বাস্য মনে হয়। কিন্তু তা মোটেই অতিকথন নয়। সঙ্গীতের ওই সব শাখায় তাঁর সত্যকার দখল ছিল, তিনি **master of none** ছিলেন না। কারণ তাঁর শিক্ষার মধ্যে কোন ফাঁকি ছিল না।

তাঁর সব ক'টি গুণের মধ্যে ধ্রুপদীর পরিচয়ই অবশ্য বড় ছিল। বাংলার সঙ্গীত-সমাজে তিনি সুপরিচিত ছিলেন ধ্রুপদ-গায়ক বলে। কারণ, আসরে তিনি সাধারণত ধ্রুপদ গাইতেন।

ধ্রুপদের শিক্ষা তিনি লাভ করেন একাধিক কলাবতের কাছে।

গোয়ালিয়রের ধ্রুপদী হায়দর খাঁ এ বিষয়ে তাঁর এক ওস্তাদ ছিলেন। বেতিয়া ঘরানার প্রবর্তক, তানসেনের পুত্রবংশীয় যে হায়দর খাঁ ছিলেন—ইনি সেই ব্যক্তি কি না জানা যায় না। এই দুই হায়দর খাঁ অভিন্ন হতেও পারেন।

হায়দর খাঁ ভিন্ন রামকুমার মিশ্রের কাছেও ধ্রুপদের তালিম নেন লক্ষ্মীনারায়ণ। রামকুমার মিশ্র ছিলেন কলকাতায় সুপরিচিত বীণকার-ধ্রুপদী-খেয়াল-গায়ক লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্রের পিতা এবং কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর বাঙ্গালী সঙ্গীতজ্ঞের গুরু। রামকুমার মিশ্রের অধীনে লক্ষ্মীনারায়ণ ধ্রুপদ ও খেয়াল দুই শিখেছিলেন।

বিখ্যাত শ্রীজান বাঈয়ের কাছে তিনি অনেক ঠুংরী গান নেন। শ্রীজান বাঈ অবশ্য শুধু ঠুংরী-গায়িকা ছিলেন না। তাঁর মতন কলাবতী সঙ্গীতজ্ঞা খুব কমই জন্মেছেন এদেশে। তিনি ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী চার রীতির গানেই অসামান্যা পারদর্শিনী ছিলেন। তাঁর গানের গলা ছিল মর্দানা ঢঙ-এর। তিনি বাংলাদেশে বহু বছর অবস্থান করেন। শ্রীজান কোন্ শ্রেণীর গায়িকা ছিলেন, তা হৃদয়ঙ্গম করা যায় তাঁর বাঙ্গালী শিষ্যদের কথা মনে করলে। বাংলার কয়েকজন দিক্‌পাল সঙ্গীতজ্ঞ—অঘোরনাথ চক্রবর্তী, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শশীভূষণ দে (অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে-র প্রথম জীবনের এক সঙ্গীতগুরু), রানাঘাটের নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (নগেন্দ্রনাথ দত্ত এবং পদ্মবাবু নামে সুপরিচিত নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গীত-শিক্ষক) প্রভৃতি শ্রীজানের

কাছে কোন না কোন সময়ে শিক্ষার্থী হয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে লক্ষ্মীনারায়ণের নামটিও যোগ করতে হয় এ প্রসঙ্গে।

বীণা, সেতার ও এস্রাজ যন্ত্রের শিক্ষা লক্ষ্মীনারায়ণের কাশীতে হয়েছিল। এই সব বাজনায় গুরু তাঁর কে বা কারা ছিলেন, তা সঠিক জানা যায় না।

তেমনি তবলাও তিনি প্রথমে শিখেছিলেন কাশীতে। তাঁর কাশীর তবলা শিক্ষকের নামও পাওয়া যায় নি। কিন্তু তার পর তিনি কলকাতায় তখনকার প্রসিদ্ধ তবলিয়া বাবু খাঁর কাছেও তালিম পান। বাবু খাঁ প্রথমে নবাব ওয়াজিদ আলীর মেটিয়াবুরুজ দরবারে তবলা বাদক ছিলেন। তার পর নবাবের মৃত্যু হলে তিনি পূর্ব-উত্তর কলকাতায় রাজাবাজারের বাসিন্দা হন এবং কয়েকজন কৃতী বাঙ্গালী শিষ্য গঠন করেন, যাঁদের অন্যতম ছিলেন মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (বিখ্যাত হীরুবাবুর পিতা)। লক্ষ্মীনারায়ণ বাবাজীও তাঁর এক গুণী শিষ্য।

তাঁর পাখোয়াজের গুরু ছিলেন, পশ্চিম অঞ্চলের এক সন্ন্যাসী পাখোয়াজী-ধ্রুপদী। তাঁর নাম হল—ঠাড়ীদাস। তিনি অনেক সময় ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব কাজ করতেন, তাই এই নামকরণ। ঠাড়ীদাস নানা তীর্থে পর্যটন করতেন এবং লক্ষ্মীনারায়ণও তাঁর সঙ্গে পশ্চিমের তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ ও শিক্ষা করতেন। ঠাড়ীদাসের কাছে তিনি শুধু পাখোয়াজ নয়, ধ্রুপদও কিছু কিছু শিখেছিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ টপ্পাশিল্পী রমজান খাঁর কাছে তাঁর টপ্পা গান নেবার কথা আগেই বলা হয়েছে।

এই পর্যন্ত লক্ষ্মীনারায়ণের গুরুকরণের বৃত্তান্ত।

পশ্চিমাঞ্চল থেকে বাংলায় ফেরবার পর তিনি কলকাতাতেই জীবনের শেষ পর্যন্ত কাটান এবং গত শতকের শেষ দু' দশকে এখানকার সঙ্গীতক্ষেত্রে ছিলেন বিখ্যাত ব্যক্তি। পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ি ইত্যাদি সমস্ত বড় বড় আসরে তিনি সাধারণত ধ্রুপদ গাইতেন, কখনও কখনও পাখোয়াজও বাজিয়েছেন। স্বনামধন্য ধ্রুপদী মুরাদ আলীর—যাঁর তুল্য ধ্রুপদগুণী পশ্চিম থেকে বাংলায় অতি অল্পই এসেছিলেন—সঙ্গেও এক আসরে পাখোয়াজে সঙ্গত করেন তিনি।

লক্ষ্মীনারায়ণের গানের সঙ্গে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ পাখোয়াজীই বাজিয়েছেন—কেশব মিত্র, বসন্ত হাজরা, মুরারি গুপ্ত, নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। কেশববাবু তাঁকে অনেকবার নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সঙ্গত করেন তাঁর গানের সঙ্গে।

বিখ্যাত টপ্পা ও খেয়াল গায়ক সাতকড়ি মালাকর এবং অন্য এক অন্ধ-গায়ক

শরৎচন্দ্র মিত্র এক সময়ে লক্ষ্মীনারায়ণের শিষ্যত্ব স্বীকার করেছিলেন। তা ছাড়া, রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ (গড়পার), নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (ভবানীপুর), যোগেন্দ্রনাথ রায় (ব্যারাকপুর), লালমোহন বসু, ব্রজজীবন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিও ছিলেন তাঁর শিষ্য।

আচার্য রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী তাঁকে গুরুর মতন শ্রদ্ধা করতেন। বহরমপুরে মহারাজা মণীন্দ্র নন্দীর যে সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের তিনি অধ্যক্ষ হন, সেখানকার এক অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি করে লক্ষ্মীনারায়ণকে একবার নিয়ে যান গোসাঁইজী।

লক্ষ্মীনারায়ণ নিজে পাখোয়াজ ও তবলায় অভিজ্ঞ থাকায় তাল ও লয়ের ওপর তাঁর অসাধারণ দখল ছিল। এ বিষয়ে তিনি কত বড় কলাবত ছিলেন, তার একটি দৃষ্টান্ত পাখোয়াজী নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের একটি আসরের প্রসঙ্গে পরে দেওয়া হবে।

গানের সময়ে সুরের কাজও তাঁর কম ছিল না। আর তেমনি গলাও তৈরী। একদিকে তার যেমন মিষ্টত্ব ছিল, তেমনি অনায়াসে গলায় তিন সপ্তকের পরিধি শ্রোতাদের সবিস্ময় আনন্দ জাগাত।

রাগের ওপর তাঁর এমন দখল ছিল যে, একই গান ইচ্ছা মতন তিনি আলাদা আলাদা রাগে গাইতে পারতেন।

একদিন তিনি দরবারী কানাড়া গাইছিলেন ঘরে বসে। এমন সময় তাঁর এক শিষ্য এলেন এবং দরবারীটি শেষ হবার পর, ভৈরব শুনতে চাইলেন।

তখন লক্ষ্মীনারায়ণ আর ভৈরবের জন্যে অন্য গান ধরলেন না। যে গানে দরবারী কানাড়া গাইছিলেন, সেই বাণীতেই তৎক্ষণাৎ ভৈরব আরম্ভ করলেন এবং সম্পূর্ণ গাইলেন।

তাঁর জীবনের অবলম্বন ছিল সঙ্গীত। সঙ্গীত ভিন্ন জীবন তাঁর কাছে অর্থহীন, যদিও এখনকার অর্থে তিনি পেশাদার ছিলেন না। কোন অর্থকরী কাজে সময় ও শক্তির অপচয় যাতে না করতে হয়, সঙ্গীতের সাধনায় যাতে কোন বিঘ্ন না আসে সেজন্যে তাঁর কয়েকজন গুণগ্রাহী পৃষ্ঠপোষক বৃত্তির ব্যবস্থা করে দেন এবং তিনিও ছিলেন অল্পে সন্তুষ্ট।

পাকপাড়ার সিংহ পরিবারের পূর্ণচন্দ্র সিংহ তাঁকে যে মাসিক ১৫৲, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ১০৲ আর শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ১০৲ বৃত্তি দিতেন, তাইতেই সেই সস্তার বাজারে তাঁর চলে যেত 'রাজার হালে'। আর সে-যুগের অনেক বাঙালী ওস্তাদের মতন তিনিও তাই অপেশাদার থাকতে পেরেছিলেন।

অর্থাৎ সঙ্গীতকে দৈনন্দিন পেশায় পরিণত করেন নি। ভাল ভাল আসরে নিমন্ত্রিত হয়ে যেতেন এবং গান গাইতেন বা বাজাতেন বিনা পারিশ্রমিকে। প্রতিদিন টাকার বিনিময়ে গান-বাজনা করবার তাঁর প্রয়োজন হত না, প্রবৃত্তিও ছিল না। তখনকার অনেক গুণীর মতিগতিই এই রকমের ছিল, তাই তাঁদের এখনকার হিসেবে ঠিক পেশাদার বলা যায় না। পৃষ্ঠপোষকদের অর্থসাহায্য নিয়েও তাঁরা ছিলেন শৌখিন।

যাক সে কথা। তাঁর সঙ্গীতের আসর সব ভাল ভাল বাড়িতেই বসত। পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়ি থেকে আরম্ভ করে অনেক বড় বড় আসরেই আমন্ত্রণ হত তাঁর। কিন্তু সবচেয়ে বেশী তিনি গাইতেন গড়পারের নিবারণচন্দ্র দত্তের বাড়িতে। এখানে নিয়মিত তাঁর গানের আসর হত। নিবারণবাবুও তাঁর এক পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সেখানেই এই ঘটনাটি ঘটে।

লক্ষ্মীনারায়ণ বাবাজী ছিলেন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। নিরীহ এবং শান্ত প্রকৃতির। পারতপক্ষে কারও সঙ্গে তাঁর বাদ-বিসম্বাদ হত না। কিন্তু তাঁর স্বভাবের আর একটি দিক্ ছিল। তিনি বড় serious ছিলেন সঙ্গীত বিষয়ে। সে ব্যাপারে এমন তেজস্বী ছিলেন যে, কারও খাতির বা পরোয়া তিনি করতেন না।

সেদিন সন্ধ্যার পর তাঁর আসর বসেছে নিবারণবাবুর বৈঠকখানায়। ঈষৎ খর্বাকৃতি, শ্যামবর্ণ লক্ষ্মীনারায়ণ বেশ খুশী মেজাজে ধ্রুপদ ধরেছেন। নিবারণবাবু তাঁর বন্ধু-বান্ধব নিয়ে শুনতে বসেছেন সামনে।

এখন, নিবারণবাবুর ছিল নুনের কারবার। বাবাজীর গান আরম্ভ হবার পর হঠাৎ তাঁর ব্যবসার কি দরকারী কথা মনে পড়ে গেল। তিনি পাশের একজনের সঙ্গে নুন-সংক্রান্ত কথাবার্তা বলতে লাগলেন।

দরবারী আসর তো নয়, বৈঠকখানার বৈঠক। গানে মগ্ন হলেও লক্ষ্মীনারায়ণের কানে গোটাকতক নুনের কথা ঢুকল এবং মনের সুর কেটে গিয়ে বিস্বাদ হয়ে গেল মেজাজটি। বিরক্ত হয়ে তিনি গান বন্ধ করলেন।

—এ কি! গান বন্ধ হয়ে গেল কেন? কারণ বুঝতে না পেরে অন্যমনস্ক গৃহস্বামী প্রশ্ন করলেন।

লক্ষ্মীনারায়ণ তীব্র শ্লেষের সঙ্গে বললেন, 'আজ নুনের গল্প হোক। কাল গুণ গাইব।'

বলতে বলতে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, আসর থেকে চলে যাবার জন্যে।

তখন অনেক অনুরোধ ইত্যাদি করা হল তাঁকে গান গাওয়াবার জন্যে।

আসর যাতে মাটি না হয় সেজন্যে গৃহকর্তা থেকে আরম্ভ করে অনেকেই তাঁকে ক্ষান্ত হতে বললেন। কিন্তু ভাঙা আসর আর সেদিন জোড়া লাগল না।

গানে বিঘ্ন ঘটায় লক্ষ্মীনারায়ণের ক্রোধ আর শান্ত হল না। কোন অনুরোধ-উপরোধ আর স্পর্শ করতে পারলে না তাঁর সুর-ক্ষুণ্ণ মন। সব নস্যাৎ করে দিয়ে তিনি আসর ত্যাগ করলেন। যাবার আগে গায়কের এক মর্মান্তিক অভিমান ব্যক্ত করে গেলেন—'বত্রিশ নাড়ি ছিঁড়ে গান গাইতে হয়। তখন কেউ সামনে বসে যদি গল্প করে, তা হলে সেখানে আর গানের দরকার কি?'

কেউ আর তাঁকে আসরে সেদিন ফিরিয়ে আনতে পারলেন না।

বঙ্কিমচন্দ্র ও যদু ভট্ট

বঙ্কিমচন্দ্র এবং যদু ভট্ট। বাংলার দুই দিক্‌পাল একং ক্ষণজন্মা পুরুষ। আপন আপন আসরে তাঁদের নাম অমর হয়ে আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র ও যদু ভট্ট দুটি নামই চিরজীবী বটে। কিন্তু দুরকমে।

বঙ্কিমচন্দ্রকে অমরত্ব দিয়েছে তাঁর রচনার কীর্তি। তাঁর রচিত অপূর্ব সাহিত্য। যার আস্বাদ গৌড়জন এখনো লাভ করতে পারেন এবং অনেকে করেও থাকেন।

কিন্তু সে যুগের গায়ক যদু ভট্টের বেলা তা হবার নয়। মহাকাল লুপ্ত করে দিয়েছে তাঁর কীর্তি—তাঁর অপরূপ সঙ্গীত। নশ্বর দেহপটের সঙ্গে বিলীন হয়ে গেছে তাঁর সুরসৃষ্টি, যা অবিনশ্বর হতে পারত যন্ত্রবিজ্ঞানের যুগ হলে। শুধু তাঁর নামটি বেঁচে আছে সঙ্গীত জগতের শ্রুতিস্মৃতিতে।

তাঁদের প্রতিভার ক্ষেত্র এক নয়, একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তাঁদের দুজনের মধ্যে একটি যোগসূত্র ছিল। সেই সূত্রটি হল—সঙ্গীত। এই দুই প্রতিভাধরের জীবনে সঙ্গীত একটি চমৎকার যোগাযোগ ঘটায়।

তাঁরা শুধু পরস্পরের পরিচিত ছিলেন না। তার চেয়ে আরও বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল তাঁদের মধ্যে। অন্তত কিছু কালের জন্যে। কারণ—কথাটি অনেকের কাছেই এক আশ্চর্য সংবাদ মনে হতে পারে—বঙ্কিমচন্দ্র সঙ্গীত বিষয়ে যদু ভট্টের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। বঙ্কিমের বয়স সে সময় বছর ত্রিশ হবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গীত-প্রসঙ্গ নিয়ে বিশেষ আলোচনা কেউ করেন নি। যদিও

তা করবার মতন। সেজন্যে অনেকেরই জানা নেই যে, তাঁর রীতিমত সঙ্গীত-জ্ঞান ছিল এবং তিনি যদু ভট্টের তুল্য গুণীর অধীনে সঙ্গীত-চর্চা ও শিক্ষা করেন। যে ঘটনাটির কথা বর্ণনা করা হবে, সেই উপলক্ষেই দুজনের মধ্যে পরিচয়ের আরম্ভ।

সেই গল্পটি বলবার আগে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গীত বিষয়ে কিছু বলা দরকার। যদু ভট্টের পরিচয় পরে অনেক আসরের গল্পে পাওয়া যাবে। এখন বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গীত-প্রসঙ্গের ভূমিকা হিসেবে কিছু আলোচনা করা যাক।

বঙ্কিম যে যদু ভট্টের কাছে সঙ্গীত-শিক্ষা করেছিলেন, সে বিষয়ে প্রামাণিক নজিরটি প্রথমে দিয়ে রাখা ভাল। তা হলে হয়তো পাঠক-পাঠিকাদের পক্ষে সূত্র অনুসরণ করবার একটি বিশ্বাসযোগ্য ভিত্তি পাওয়া যাবে।

তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "বঙ্কিম-জীবনী"তে (৩৬৯ পৃঃ) বলেছেন—

"ত্রিশ বৎসরের পর মৃণালিনী লিখিবার সময় বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস ও বিজ্ঞান পাঠ আরম্ভ করেন।

"এই সময় সঙ্গীত-শিক্ষার ঝোঁক চাপিয়াছিল। সুযোগও বেশ হইয়াছিল। কাঁটালপাড়ায় একজন বঙ্গবিশ্রুত গায়ক বাস করিতেন, তাঁহার নাম যদু ভট্ট তান্‌রাজ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতন দিতেন। এই যদু ভট্টর নিকট বঙ্কিমচন্দ্র সঙ্গীতাদি শিক্ষা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সুকণ্ঠ ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার তান-লয় বোধ অনন্যসাধারণ ছিল। হারমনিয়ম যন্ত্রে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

"একদিন তিনি রঙ্গমঞ্চে মৃণালিনী অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। গিরিজায়া গাহিতেছিল—

বিকচ নলিনে, যমুনা পুলিনে,
বহুত পিয়াসা—রে।
চন্দ্রমা-শালিনী, যা মধু যামিনী,
না মিটিল আশা—রে।

"সুর বঙ্কিমচন্দ্রের মনোমত হইল না। তিনি সাতিশয় বিরক্তিসহকারে রঙ্গালয় পরিত্যাগ করিলেন। এবং পরদিন তিনি তাঁহার দৌহিত্র দিব্যেন্দুসুন্দরকে এই গানটির সুর লয় শিক্ষা দিয়াছিলেন। সেই সময় শ্রীমতী সরলা দেবীও এই গানটির একটি সুর দিয়াছিলেন, এবং দিব্যেন্দুসুন্দরকে হারমনিয়ম সাহায্যে শিখাইয়াছিলেন।"

যদু ভট্টের কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গীত শিক্ষার বিষয়ে এই বিবৃতিটি একটি নির্ভরযোগ্য প্রমাণ।

বঙ্কিমচন্দ্র যদু ভট্টের কাছে সঙ্গীত শিক্ষার্থী ছিলেন ঠিক। নচেৎ তাঁর জীবনীকার এমন স্পষ্ট করে উল্লেখ করতেন না। বঙ্কিমচন্দ্র যে কণ্ঠসাধনা করে গায়ক হবার জন্যে যদুর কাছে তালিম নিয়েছিলেন, তা নয়। রাগ-বিদ্যা অর্থাৎ বিভিন্ন স্বরের পদ্ধতির বিষয়ে বিশেষ ভাবে জানাই সম্ভবত তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। যদু ভট্টের কাছে তাঁর সঙ্গীত-শিক্ষার এই তাৎপর্যই মনে হয়। বঙ্কিমের শিল্পী ও সংস্কৃতিবান্ সত্তা এবং তাঁর জ্ঞানপিপাসু মন তাঁকে রাগ-বিদ্যার পরিচয়-লাভে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বিশেষ যদু ভট্টের মতন গুণীর সাহচর্য তিনি যখন পেয়েছিলেন।

সঙ্গীত-বিষয়ে বঙ্কিমের যে অভিজ্ঞতা ছিল, তার একটি সামান্য নিদর্শন উদ্ধৃত অংশের মধ্যে আছে। তিনি গিরিজায়ার গানটির সুর পছন্দ না হওয়ায় পরদিন দৌহিত্রকে তা অন্য সুরে শিখিয়েছিলেন।

আসলে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গীত-জ্ঞান বহুমুখী ছিল। তার প্রচুর দৃষ্টান্ত তাঁর রচনাবলীতে ইতস্তত চিহ্নিত আছে। সঙ্গীত-প্রসঙ্গে তাঁর সেইসব অভিজ্ঞ বর্ণনা আর-একবার পাঠক-পাঠিকাদের দৃষ্টির সামনে তুলে ধরতে ইচ্ছা হয়। কারণ তাঁর গ্রন্থাবলী পড়বার সময় সেসব কথায় হয়তো অনেকে তেমন মনোযোগ দেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গীত জীবনের ভূমিকা হিসেবেও সেসব মনে রাখবার মতন। তাঁর সেই পরিচয় নেবার পর তাঁর ও যদু ভট্টের সেই গল্পটি বলা হবে।

সঙ্গীত বঙ্কিমের কতখানি প্রিয় ছিল, সুর-রসের তিনি কি মার্জিতরুচি রসিক ছিলেন, সঙ্গীতের তত্ত্ব ও ক্রিয়াংশের নানা দিকে তাঁর কি গভীর জ্ঞান ছিল, তার ভূরি ভূরি নিদর্শন তাঁর বিভিন্ন রচনার মধ্যে রয়েছে।

কমলাকান্তের দপ্তরে সেই "একা"—"কে গায় ওই?"—"বহুকাল বিস্মৃত সুখ স্বপ্নের ন্যায় ঐ মধুর গীতি কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। এত মধুর লাগিল কেন?..." তাঁর সঙ্গীতপ্রেমের একটি চমৎকার নিদর্শন।

তার পর ঐ দপ্তরের আর একটি আবেগ-গাঢ় রচনা—"একটি গীত"। "সুর করিয়া...আমি গীতটি আদ্যোপান্ত গায়িলাম।

এসো এসো, বঁধু এসো, আধ আঁচরে বসো,
নয়ন ভরিয়ে তোমায় দেখি।
অনেক দিবসে, মনের মানসে,
তোমা ধনে মিলাইল বিধি।

মণি নও মাণিক নও যে হার করে গলে পরি,
ফুল নও যে কেশের করি বেশ।
নারী না করিত বিধি, তোমা হেন গুণনিধি,
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ।

"মিল ত চমৎকার, 'দেখি' আর 'বিধি' মিলিল। কিন্তু বাংলা ভাষায়, এইরূপ মোহমন্ত্র আর একটি শুনিব, মনে বড় সাধ রহিয়াছে। যখন এই গান প্রথম কর্ণ ভরিয়া শুনিয়াছিলাম, মনে হইয়াছিল, নীলাকাশতলে ক্ষুদ্র পক্ষী হইয়া এই গীত গাই—মনে হইয়াছিল, সেই বিচিত্র সৃষ্টিকুশলী কবির সৃষ্টি দৈববংশী লইয়া, মেঘের উপর যে বায়ুস্তর—শব্দশূন্য, দৃশ্যশূন্য, পৃথিবী যেখান হইতে দেখা যায় না, সেইখানে বসিয়া, সেই মুরলীতে, একা এই গীত গাই—এই গীত কখনও ভুলিতে পারিলাম না ; কখনও ভুলিতে পারিব না।

এসো এসো বঁধু এসো…।"

সঙ্গীতপ্রিয় বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পী-মনের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ এখানে পাওয়া গেল।

আর "কৃষ্ণকান্তের উইলে" রোহিণীর অন্তরে প্রেম সঞ্চারের প্রসঙ্গে, তার ব্যর্থ যৌবনের তৃষ্ণা ও আকুতিকে প্রকাশ করতে বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্ব প্রকৃতির অন্তস্তলে যে সুরের ঐকতানের সন্ধান দিয়েছেন, তা তাঁরই সুর-শিল্পী সত্তার রূপায়ন :

"রোহিণী চাহিয়া দেখিল—সুনীল, নির্মল, অনন্ত গগন—নিঃশব্দ, অথচ সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা। দেখিল নব প্রস্ফুটিত আম্রমুকুল—কাঞ্চন-গৌর, স্তরে স্তরে শ্যামলপত্রে বিমিশ্রিত, শীতল সুগন্ধ পরিপূর্ণ, কেবল মধুমক্ষিকা বা ভ্রমরের শব্দ গুঞ্জনে শব্দিত, অথচ সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা। দেখিল—সরোবরতীরে গোবিন্দলালের পুষ্পোদ্যান, তাহাতে ফুল ফুটিয়াছে—ঝাঁকে ঝাঁকে, লাখে লাখে, স্তবকে স্তবকে, শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায়, যেখানে সেখানে, ফুল ফুটিয়াছে ; কেহ শ্বেত, কেহ রক্ত, কেহ পীত, কেহ নীল, কেহ ক্ষুদ্র, কেহ বৃহৎ—কোথাও মৌমাছি, কোথাও ভ্রমর—সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা।"

"মৃণালিনী" উপন্যাসের জন্যে তিনি ক'টি উৎকৃষ্ট গান রচনা করেন। গিরিজায়ার মুখে সে-সব গান শুনে হেমচন্দ্র ও মৃণালিনীর মনে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটে তারও হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা তাঁর লেখায় আছে। এসব থেকেও বোঝা যায় যে, সঙ্গীতকে তিনি কতখানি অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন এবং সঙ্গীতরস তাঁর হৃদয়ে কি গভীরভাবে বিদ্যমান ছিল।

তাঁর "বিবিধ প্রবন্ধ"র "সঙ্গীত" লেখাটি থেকে ধারণা হয় যে, বিভিন্ন রাগের ধ্যানরূপ থেকে আরম্ভ করে সঙ্গীতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পর্যন্ত সব বিষয়েই তাঁর যথাসম্ভব জ্ঞান ছিল। তাঁর সময়ে সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিভাগে যতদূর পর্যন্ত চর্চা হয়েছিল, বঙ্কিম ছিলেন তার সব বিষয়ের সঙ্গেই সুপরিচিত। তাঁর সঙ্গীত প্রসঙ্গেও সেকথা সমান সত্য। "সঙ্গীত" প্রবন্ধটি তার একটি সার্থক পরিচয় বহন করছে।

কিন্তু এহ বাহ্য! ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয় সঙ্গীত-রচয়িতা যে সঙ্গীতবেত্তা হবেন, এ তো স্বাভাবিক। তিনি ছিলেন শিক্ষিত এবং সমঝদার সঙ্গীতপ্রেমী। তাই শুধু হৃদয় দিয়ে তিনি সঙ্গীত উপভোগ করতেন না, সঙ্গীত বিষয়ে তাঁর ছিল পরিশীলিত ও পরিমার্জিত মন। সেজন্যে সাধারণভাবে সঙ্গীতপ্রীতি তো তাঁর ছিলই, রাগসঙ্গীতেও ছিল রীতিমত বোদ্ধার অধিকার। শুধু বিভিন্ন রাগে নয়, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের বিষয়েও তিনি অবহিত ছিলেন। তাঁর নানা উপন্যাসের নানা স্থানে তাঁর রাগসঙ্গীতে অভিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। সেসব কথা এবারে চয়ন করে দেওয়া হবে। আমাদের বক্তব্য কাহিনীটির সঙ্গেও বঙ্কিমচন্দ্রের রাগসঙ্গীতপ্রীতি জড়িত! তাই রাগসঙ্গীতের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতার নিদর্শন হিসেবে তাঁর উপন্যাসগুলি থেকে এখানে একে একে উদ্ধৃত করা হল।

একথা অনেকেরই জানা আছে, বঙ্কিমচন্দ্র "বন্দেমাতরম্" গান রচনা করে "আনন্দমঠ" গ্রন্থে তার জন্যে প্রথম সুর নির্দিষ্ট করেন—মল্লার। শুধু তাই নয়। তার তাল উল্লেখ করে "কাওয়ালী তাল যথা" বলে তার মাত্রা বিভাগও দেখিয়ে দেন "আনন্দমঠ" পুস্তকে। এই গ্রন্থে আর একটি গানের ("দড়বড়ি ঘোড়া চড়ি কোথা তুমি যাও রে…") তিনি সুর ও তাল নির্দেশ করেন—"রাগিণী বাগীশ্বরী—তাল আড়া।"

মল্লার রাগে "বন্দেমাতরম্" গান 'শিক্ষিত' শ্রোতার মনে কেমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তার আভাস বঙ্কিমচন্দ্র এইভাবে দিয়েছেন—"ভবানন্দ আবার বন্দেমাতরম্ গাহিতে লাগিল। মহেন্দ্রের গলা ভাল ছিল, সঙ্গীতে একটু বিদ্যা ও অনুরাগ ছিল—সুতরাং সঙ্গে গাহিল—দেখিল যে গাহিতে গাহিতে চক্ষে জল আইসে।" (আনন্দমঠ)

সারঙ্গ নামক যন্ত্রের সহযোগিতায় গান করবার রীতি বঙ্কিমের সবিশেষ জানা ছিল: "আবার কোথায় সারঙ্গের মধুর নিক্কণে বাজিল…এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে?"…"জীবানন্দ বসিয়া সারঙ্গ বাজাইতেছিলেন।…" (আনন্দমঠ)

"শান্তিদেবী আবার সারঙ্গ লইয়া মৃদু মৃদু রবে গীত করিতে লাগিলেন—প্রলয় পয়োধিজলে ধৃতবানাস বেদং···।" (আনন্দমঠ)

"মৃণালিনী"তে গিরিজায়ার মুখে "মথুরাবাসিনী মধুরহাসিনী শ্যামবিলাসিনী রে" গানখানি দিয়ে তিনি লেখেন—"ঢিমে তেতালা জয়জয়ন্তীতে গেয়।"

বীণাবাদনের ধ্বনি-মাধুর্য বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনায় এইভাবে পাওয়া যায়—"সেই ···রূপবতী মূর্তিমতী সরস্বতীর ন্যায় বীণা বাজাইতেছিল। ঝম্ ঝম্, ছন্ ছন্ ঝনন্ ঝনন্, ছনন্ ছনন্, দম্ দম্, দ্রিম্ বলিয়া বীণে কত কি বাজিতেছিল। বীণা কখন কাঁদে, কখন রাগিয়া উঠে, কখন নাচে, কখন আদর করে, কখন গর্জিয়া উঠে—বাজিয়ে টিপি টিপি হাসে। ঝিঁঝিট, খাম্বাজ, পিলু—কত মিঠে রাগিণী বাজিল—কেদার, হাম্বীর, বেহাগ—কত গম্ভীর রাগিণী বাজিল—কানাড়া, সাহানা, বাগীশ্বরী—কত জাঁকাল রাগিণী বাজিল—নাদ, কুসুমের মালার মত নদী-কল্লোল স্রোতে ভাসিয়া গেল। তার পর দুই-একটা পরদা উঠাইয়া-নামাইয়া লইয়া, সহসা নূতন উৎসাহে উন্মুখী হইয়া সে বিদ্যাবতী ঝন্ ঝন্ করিয়া বীণের তারে বড় বড ঘা দিল।···বীণে নট রাগিণী বাজিতে লাগিল।···" (দেবী চৌধুরাণী)

এখানে একটি কথা বলা দরকার, এই পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় একটি সামান্য ত্রুটি আছে মনে হয়। বীণাবাদনের শেষ দিকে বীণের দু-একটি পরদা উঠিয়ে-নামিয়ে বাজাবার কথা যে বলা আছে, তা সঠিক নয়। বীণার কোন পরদা ওঠানো-নামানোর প্রয়োজন নেই। এ যন্ত্রের ২০টি পরদা বাঁধা থাকে, তাদের সরানো হয় না। সে জন্যে বীণাকে বলা হয়—অচল ঠাট। সেতারের মুদারা গ্রামের রেখব ও ধৈবত এবং তারা গ্রামের রেখব ও গান্ধার কোমল করবার জন্যে সরানো হয়ে থাকে, বিশেষ বিশেষ রাগের প্রয়োজনে। বঙ্কিমচন্দ্র, খুব সম্ভব, সেতারের এই রীতিকে বীণের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছেন। তবে এটা তাঁর কোন বড় ত্রুটি নয়। তিনি বলেই যন্ত্রের এই পরদা ওঠানো-নামানোর এত খুঁটিনাটি লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু অসাবধানে ভুল করে সেতারের ব্যাপারটি বীণের বলে লিখেছেন।

"দেবী চৌধুরাণী"র আর এক জায়গায় তিনি দেবীর সঙ্গিনী নিশির বাঁশী বাজাবার কথা উল্লেখ করেছেন—"নিশি বাঁশীতে ফুঁ দিয়া মল্লারে তান মারিল।"

সঙ্গীতের সময়ে মেজাজের যে গুরুত্ব আছে, সে বোধও বঙ্কিমচন্দ্রের বিলক্ষণ ছিল! দলনী বেগমের গান-বাজনার কয়েকটি বর্ণনায় তার পরিচয় পাওয়া যায়:

"তখন সুন্দরী এক ক্ষুদ্র বীণা লইয়া তাহাতে ঝঙ্কার দিল এবং ধীরে ধীরে… গীত আরম্ভ করিল।"

…"বীণার তার অবাধ্য হইল—কিছুতেই সুর বাঁধে না। বীণা ফেলিয়া দলনী বেহালা লইল, বেহালাও বেসুরা বলিতে লাগিল, বোধ হইল। নবাব বলিলেন, 'হইয়াছে, তুমি উহার সঙ্গে গাও।' তাহাতে দলনীর মনে হইল যেন নবাব মনে করিয়াছেন, দলনীর সুরবোধ নাই।…" (চন্দ্রশেখর)

যন্ত্রের বেসুর থাকা, সুর বাঁধা ইত্যাদি ব্যবহারিক বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ ধারণা ছিল। তার আরও পরিচয় আছে: "দেবেন্দ্র সেই বেহালা আনিয়া তাহাতে ছড়ি দিলেন। বেহালা ঘাঁকর ঘোঁকর করিতে লাগিল।" (অর্থাৎ বেসুরো ছিল)…"দেবেন্দ্র বেহালা হাতে লইয়া এক প্রকার চলনসই করিয়া লইলেন (অর্থাৎ তার বেঁধে সুর মিলিয়ে নিলেন) এবং তাহার সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া…গাইলেন।"…"দেবেন্দ্র তানপুরা লইলেন…এবং গীতারম্ভ করিলেন।" (বিষবৃক্ষ)

"কৃষ্ণকান্তের উইল" উপন্যাসে গোবিন্দলাল ও রোহিণীর নিভৃত বাসকুঞ্জে যখন নিশাকরের আবির্ভাব ঘটে, সে সময়ের কথায় বঙ্কিম অনেক সঙ্গীতযন্ত্রের ক্রিয়া বর্ণনা করেছেন। যথা—

"গোবিন্দলাল তবলা লইলেন…কিন্তু আজি দানেশ খাঁর সঙ্গে তাঁর সঙ্গত হইল না, সকল তালই কাটিয়া যাইতে লাগিল।…তখন গোবিন্দলাল একটা সেতার লইয়া বাজাইবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু গৎ সব ভুলিয়া যাইতে লাগিলেন।"

সেখানে রোহিণী ও তার ওস্তাদের সঙ্গীতের জন্যে প্রস্তুতির কথাও বলেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। তার মধ্যে তবলার সঙ্গে মিলিয়ে তানপুরায় সুর বাঁধবার বর্ণনা সকৌতুক মুন্সিয়ানার সঙ্গে করেছেন—"একজন…একটা তম্বুরার কান মুচড়াইতেছে—কাছে বসিয়া এক যুবতী ঠিং ঠিং করিয়া একটি তবলায় ঘা দিতেছে। তম্বুরার কান মুচড়াইতে মুচড়াইতে দাড়িধারী তাহার তারে অঙ্গুলি দিতেছিল। যখন তারের মেও মেও আর তবলার ঘ্যান্ ঘ্যান্ ওস্তাদ্‌জীর বিবেচনায় এক হইয়া মিলিল…।" (কৃষ্ণকান্তের উইল)

তানপুরায় নিবিষ্ট হয়ে সুর বাঁধার এই প্রসঙ্গটি লক্ষণীয়।

অনেকক্ষণ ধরে তানপুরার তার বাঁধবার জন্যেই একদিন বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে যদু ভট্টের সংঘর্ষ হয়েছিল। সেই আসরের কাহিনীটিই এখন বিবৃত করা হবে।

সে কাহিনী সত্য হলেও নাটকীয়। আর সে নাটিকার প্রধান চরিত্র দুটি:

বঙ্কিমচন্দ্র এবং যদু ভট্ট। সেদিন তাঁরা এক অদ্ভুত ঘটনাচক্রে পরস্পর পরিচিত হন।

যতদূর জানা যায়, তা ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের কিংবা তার কিছু আগেকার কথা। ঠিক কোন্ সাল বলা যায় না। তবে বঙ্কিমের "দুর্গেশনন্দিনী" ও "কপালকুণ্ডলা" তখন প্রকাশিত হয়েছে। তিনি তখন খ্যাতিমান হতে আরম্ভ করেছেন। কিন্তু সুপ্রসিদ্ধ হন নি।

যদু ভট্টের বিষয়েও প্রায় সেই কথাই বলা যায়। তাঁর খ্যাতি তখনও সীমাবদ্ধ ছিল কয়েকটি সঙ্গীত-গোষ্ঠীর মধ্যে। বৃহত্তর সমাজের দিগন্তে তা বিস্তৃত হয় নি। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের দু বছরের বয়োকনিষ্ঠ ছিলেন।

তাঁদের দুজনের মধ্যে তখন পরিচয় ছিল না। তাঁরা চিনতেনও না পরস্পরকে। কিন্তু একে অন্যের নাম বা গুণের কথা কিছু শুনে থাকবেন।

এমনি এক সময়ের কথা। ঘটনাস্থল—চুঁচুড়া।

সন্ধ্যার পর একটি গানের আসর বসেছে। যদু ভট্টকে সেখানে আনা হয়েছে গাইবার জন্যে। সাজানো আসরে শ্রোতারা উপস্থিত হয়েছেন। তাঁদের প্রথম সারিতে আছেন বঙ্কিমচন্দ্র।

এইবার গান আরম্ভ হবে। সভার একজন উদ্যোক্তা যদু ভট্টকে অনুরোধ জানালেন গান করতে।

ভট্টজী সুর বাঁধবার জন্যে কোলের ওপর তানপুরা তুলে নিলেন। তার পর তার বাঁধতে আরম্ভ করলেন নিবিষ্ট মনে।

এক-একজন গায়ক তানপুরা বাঁধতে অনেক সময় নেন। তাঁর মনের মতন নিখুঁত করে সুর না বেঁধে তিনি কিছুতেই গান আরম্ভ করেন না। তানপুরা বাঁধা পছন্দসই না হলে গানের মেজাজ আসে না তাঁর। কোন শ্রোতার ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে কি না সেদিকে তাঁর খেয়াল থাকে না।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম জীবনে যখন গায়ক ছিলেন, তখনকার এই রকম কথা জানা যায়। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে গান শোনাবার সময় কতদিন এমন হয়েছে: নরেন্দ্রনাথ গান আরম্ভ করবার আগে অনেকক্ষণ ধরে তানপুরা বেঁধেছেন। আর অধৈর্য হয়ে উঠেছেন তাঁর শ্রোতারা। এমন কি শ্রীরামকৃষ্ণ পর্যন্ত। এ পর্যন্তও হয়েছে যে শ্রীরামকৃষ্ণ ধৈর্য হারিয়ে বলে উঠেছেন—'ইচ্ছে হচ্ছে তানপুরাটা ভেঙে ফেলি।'—কিন্তু নরেন্দ্রনাথ অবিচল। মনের মতন করে সুর না বেঁধে তিনি গান আরম্ভ করেন নি।

যদু ভট্টের স্বভাব ছিল অনেকটা সেই রকম। অন্তত সেদিনের আসরে তেমনি ব্যাপার ঘটে।

অনেকক্ষণ ধরে যদু নিখুঁত ভাবে তানপুরা বাঁধতে লাগলেন। শ্রোতাদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র এই বিলম্বের জন্যে অস্বস্তি বোধ করলেন। এবং বিরক্ত হয়ে উঠলেন শেষে। যদুর কান তখনও তানপুরার চারটি তারকে অনুমোদন করে নি। তিনি একাগ্রচিত্তে মাথা নীচু করে সুর বাঁধছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র আর ধৈর্যধারণ করতে পারলেন না। তিনি যদুর হাতের তাম্বুরাটির দিকে চেয়ে শ্লেষাত্মক কণ্ঠে বললেন—'লাউ-কুম্‌ড়ো বাঁধা কখন্ শেষ হবে ?'

এই বেসুরো মন্তব্য শুনে যদুর মেজাজটিও বিগড়ে গেল। তিনিও চড়া গলায় বঙ্কিমকে কটাক্ষ করে জানালেন—'এমন গোয়াল ঘরে আমি গাইব না।'

(অর্থাৎ এখানে গো-জাতীয় জীবেরা আছে, যারা সুরের ধার ধারে না। এখানে যদুর গান কি করে হবে ?)

এই বলে তিনি যন্ত্রটি কোল থেকে নামালেন। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। রাগ তখন তাঁর মাথায় চড়েছে। তিনি তাই তাম্বুরাটিকে তুলে একটি আছাড় দিলেন। লাউয়ের সুরলীলা সাঙ্গ করে উঠে পড়লেন আসর থেকে। গান তিনি গাইবেন না।

যদুর এই ব্যবহারে বঙ্কিমচন্দ্রও ঘোর অপমানিত বোধ করলেন। তাঁরও কোপন স্বভাবের খ্যাতি কম নয়। তাই চট্টোপাধ্যায় মশায় চটে উঠে দাঁড়ালেন আসর ত্যাগ করে যাবার জন্যে।

ততক্ষণে আসরে হুলুস্থুল পড়ে গেছে। এ কি বিভ্রাট ! সুরের আসরে এ কি কাণ্ড। চার দিকে হৈ চৈ আরম্ভ হয়ে গেল। অনেক শ্রোতা কলরব করে উঠলেন। কোথায় গান আরম্ভ হবে, না তার বদলে ঘটে গেল বিশ্রী বিবাদ ? আর তাও এত বড় গায়ক আর এমন বিশিষ্ট শ্রোতার মধ্যে !

অনেকেই হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন। চলে যাবার জন্যেও তোড়জোড় করলেন কেউ কেউ। এমন ভাল আসর ভেঙে যাবার উপক্রম হল।

কিন্তু উদ্‌যোক্তারা তৎপর হয়ে উঠলেন। তাঁরা চেষ্টা করতে লাগলেন, আসর যাতে মাটি না হয়। শ্রোতাদের স্থির হয়ে বসতে বললেন। তার পর কয়েকজন মিলে, একদিকে নিয়ে গেলেন যদু ভট্টকে। আর একদিকে নিয়ে গেলেন বঙ্কিমচন্দ্রকে। তাঁদের ক্রোধ শান্তির আশায়।

অনুনয় এবং অনুরোধ করে তাঁরা তাঁদের শান্ত করবার চেষ্টা করলেন।

যদু ভট্টকে একপাশে এনে জনান্তিকে বলা হল—উনি কে তা বোধ হয় আপনি জানেন না? ওঁর নাম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, আর এই বয়সেই মস্তবড় লেখক হয়েছেন। দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা এসব বই ওঁরই লেখা। উনি গান-বাজনা বড় ভালবাসেন। আপনি ওঁর কথায় রাগ করবেন না। আপনি গান গাইলে ওঁর নিশ্চয় ভাল লাগবে, দয়া করে আসরে আসুন। আপনার গান শোনবার জন্যে অনেকে অনেক দূর থেকে এসেছেন। তাঁদের আপনি নিরাশ করবেন না।

তাঁদের কথায় যদু অবশেষে শীতল হলেন। তার পর আসরে এসে বসলেন।

ওদিকে বঙ্কিমচন্দ্রকে কয়েকজন এক পাশে নিয়ে গিয়ে বললেন—উনি কে তা জানেন তো? ওঁর নাম যদু ভট্ট। এমন ধ্রুপদ গান খুব কম লোকই এখন গাইতে পারেন। আপনি অনুগ্রহ করে বসবেন চলুন। যা হবার হয়েছে। ওসব কথা আর ধরবেন না। ওঁর গান শুনলে আপনি নিশ্চয় তৃপ্তি পাবেন। আসুন।

বঙ্কিমচন্দ্রও এই সনির্বন্ধ অনুরোধ আর এড়াতে পারলেন না। উপস্থিত হলেন আসরে।

ভাঙা আসর আবার জোড়া লাগল।

অন্য একটি তানপুরা আগেই যদুকে দেওয়া হয়েছিল। তিনি যথারীতি তার সুর বাঁধলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এবার বসে রইলেন ধৈর্য ধরে।

তার পর যদু ভট্ট গান আরম্ভ করলেন। উদাত্তকণ্ঠে ধরলেন দরবারী কানাড়া।

অন্য অনেক আসরে যেমন করেন, এখানেও গাইতে লাগলেন নিজের লেখা ধ্রুপদ গান। কি হিন্দী, কি বাংলা, তাঁর রচিত সব গানেরই যেমন চমৎকার বন্দেশ, এ গানটির মধ্যেও তার অভাব নেই। ঝাঁপতালে তিনি স্বরচিত ধ্রুপদ-খানি গাইতে লাগলেন। তাঁর দরাজ গলায়, নিপুণ মীড়ের কাজ দিয়ে, গমকের তরঙ্গ বিচ্ছুরিত করে। মেঘমন্দ্রধ্বনিতে মৃদঙ্গের সঙ্গত হতে লাগল।

আসরে অপূর্ব ভাবের সঞ্চার হল। যদু ভট্ট দরবারী কানাড়ায় সিদ্ধ ছিলেন। শ্রোতারা তার পরিচয় পেলেন। যদুর সুরের সুরধুনীতে দোলায়িত হতে লাগলেন সকলে।

বিস্মিত পুলকে তন্ময় হয়ে শুনছেন বঙ্কিমচন্দ্র।

যদু সমস্ত শ্রোতার মন সুরের মন্ত্রে আকর্ষণ করে নিয়ে গাইতে লাগলেন—

রাধারমণ মদনমোহন মাধব মুকুন্দ মুরারি।
মধুসূদন মনোহর ময়ূরপুচ্ছধারী ॥

ব্রজরাজ গোপাল বাঁকে বিহারী।
নীল নীরদ শ্যাম, নব লোকেশ্বর, জয়তি যদুনাথ
শ্রীনাথ গোপীনাথ গোলোকনাথ শ্রীহরি ॥…

শ্রোতৃমণ্ডলীকে সুরের ধারায় অবগাহন করিয়ে যদু ভট্টের দরবারী কানাড়ার সেই গান এক সময়ে শেষ হল।

আসরের অন্য শ্রোতাদের কথা বলা বাহুল্য। আর বঙ্কিমচন্দ্র? তিনি স্পষ্টই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর দুচোখ তখন অশ্রুসজল। মুখমণ্ডলের ভাব অতি কোমল।

গান আরম্ভ হবার আগেকার সেই রুদ্রমূর্তি তখন কোথায় অন্তর্ধান করেছে। কোন্ মায়াবলে যেন রূপান্তরিত হয়েছেন সেই অধৈর্য, ক্রুদ্ধ মানুষটি। ইনি যেন আর এক বঙ্কিমচন্দ্র!

তিনি স্বল্পভাষী এবং বাইরে গম্ভীর স্বভাবের ছিলেন। তাই বেশি কথা বললেন না। কিন্তু সেই অল্প ক'টি কথাতেও ফুটে উঠল তাঁর অন্তরের অকুণ্ঠ প্রশংসা, অপূর্ব আনন্দ পাওয়ার স্বীকৃতি আর গুণীর প্রতি বিনয়।

যদু ভট্টও শ্রোতাকে তৃপ্ত করতে পেরেছেন জেনে পরিতৃপ্ত হলেন।

দুজনের সেই প্রথম সাক্ষাৎ ও পরিচয়। আর বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনীতে দেখা গেছে যে, তিনি ভট্টজীর কাছে সঙ্গীতাদি শিক্ষা করেছিলেন। সুতরাং অনুমান করলে ভুল হবে না যে, তাঁর সেদিনের অভিজ্ঞতার জন্যেই তা সম্ভব হয়। পরে যখন বঙ্কিম রাগবিদ্যা শেখবার জন্যে উপযুক্ত ওস্তাদের প্রয়োজন অনুভব করেন, তখন যদু ভট্টের নামই তাঁর প্রথম মনে পড়ে। কিংবা এমনও হতে পারে, সে রাতের পরেই তিনি মনে মনে সংকল্প করেন—এমন গায়কের কাছেই সঙ্গীতবিদ্যা ভাল ভাবে শিক্ষা করা উচিত।

আগেই বলা হয়েছে যে, বঙ্কিমচন্দ্র বয়সে যদু ভট্টের চেয়ে দু বছরের বড় ছিলেন। তবু তিনি যদুর শিষ্য হতে দ্বিধা করেন নি। কারণ গুণীর যোগ্য সমাদর করবার মতন তাঁর হৃদয় ছিল উদার ও গুণগ্রাহী!…

দুটি সূত্রে চুঁচুড়ার সেই আসরের স্মৃতি একালে এসে পৌঁছেছে। পণ্ডিতপ্রবর, স্বর্গত ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামীজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা) একদিন গল্প করবার সময় ঘটনাটির বিষয় লেখককে বলেন। বিশ্বস্তসূত্রে তিনি শুনেছিলেন বঙ্কিম-যদুর ওই যুদ্ধ ও শান্তির কাহিনী। একথা অনেকের জানা নেই যে, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে কিছুদিন সঙ্গীতশিক্ষা করেছিলেন এক গায়কের কাছে। এবং সঙ্গীত-বিষয়ে তাঁর প্রাথমিক জ্ঞান ছিল, যদিও পরে আর তার চর্চা করবার সুযোগ পান নি।

ওই আসরের কথা বলতেন বিখ্যাত মৃদঙ্গবাদক নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও এবং তিনি ঘটনাটির কথা শুনেছিলেন স্বয়ং যদু ভট্টের মুখে। দুটি বিবরণ হুবহু এক। ঘটনাটির সত্যতার এও এক প্রমাণ।

সুরসিক এবং সুরতাল-রসিক নগেন্দ্রনাথের নানা কথা পরে আসবে। এখানে তাঁর বিষয়ে সেজন্যে আর কিছু বলা হবে না, শুধু যদু ভট্টের প্রসঙ্গ ছাড়া। যদু-ভট্টের গানের কথা মুখুজ্যে মশায় অতি আবেগের সঙ্গে বলতেন। যদু ভট্টের মুখে পরবর্তীকালে শোনা ওই স্মরণীয় আসরটির কাহিনী।

কি ভাবে নগেন্দ্রনাথ যদুর সাক্ষাৎ পান, কেমন ভাবে তাঁর গান শোনেন আর ওই আসরের কথা তাঁর নিজের মুখে জানতে পারেন—সেসব কথাও শোনবার মতন।

তাই নগেন্দ্রনাথ যেমন করে বলতেন, তেমনি করে (অর্থাৎ তাঁর নিজের ভাষাতেই) তাঁর কথা এখানে দেওয়া হল—

যদু ভট্টের গান একদিন আমি খুব ভাল করে শুনে নিয়েছিলুম। একেবারে তাঁর সামনাসামনি বসে। একটি ছোট্ট ঘরে। আমরা দুজন ছাড়া সে ঘরে আর কেউ ছিল না। কি করে হঠাৎ সে সুযোগটা এসে গেল, বলি।

তখন আমার বয়েস খুব কম। ঠিক করে আর এখন তা বলতে পারব না। হয়তো এদিক্-ওদিক্ হতে পারে। তবে সব কথাই আমার বেশ মনে আছে। যতদূর মনে পড়ে, তখন আমার বয়েস ১৪।১৫ বছর হবে। সেই সময় আমি একদিন শুনলুম যদু ভট্টের কথা।

শুনলুম তিনি মস্ত বড় গাইয়ে। আর এসে রয়েছেন ঝামাপুকুরে। আমাদের বাড়ি পটলডাঙ্গায়। তাই আমাদের বাড়ির কাছেই। একদিন সন্ধান নিয়ে তাঁর কাছে হাজির হলুম। তিনি ছিলেন রাজা দিগম্বর মিত্রের বাড়ির বাইরেকার একটি ঘরে। একতলার সেই ছোট ঘরটিতেই তিনি তখন থাকতেন। তার কিছুদিন পরেই তিনি সেখান থেকে চলে যান।

সে যা হোক, আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললুম, 'আপনার গান শুনতে এসেছি।'

বয়েস তখন অত কম ছিল বলেই যদু ভট্টের কাছে গিয়ে অমন করে গান শুনতে চেয়েছিলুম। এখন ভাবলে আশ্চর্য লাগে।

আমি তখন নেহাত ছেলেমানুষ। কিন্তু তবু যদু ভট্ট আমার কথায় বিরক্ত হলেন না, বা আমায় হাঁকিয়েও দিলেন না। তখন দুপুরবেলা। তিনি একলাটি ঘরে ছিলেন।

আমার কথা শুনে হাসিমুখে বললেন—'গান শুনবে? কিন্তু এখন তো হবে না। তা হলে আজ মাঝ-রাত্তিরে এসো।'

তাঁর কথায় তখন চলে এলুম। আমাদের বাড়ি থেকে তো তেমন দূরে নয়। তাই বেশ রাত করে আবার হাজির হলুম তাঁর সেই ঘরটিতে। তখনও তিনি একাই ঘরে ছিলেন। আমাকে দেখে বসতে বললেন।

একটু পরে তিনি গান আরম্ভ করলেন—দরবারী কানাড়া। রাধারমণ মদনমোহন মাধব মুকুন্দ মুরারি…

আমার তখন সব বোঝবার মতন বয়েস নয়। কিন্তু এটুকু বেশ মনে আছে—আহা, সে কি গলা আর কি সুর! অমন দরবারী আর তো শুনলুম না।

চোখ দুটি বুজে তন্ময় হয়ে তিনি গাইতে লাগলেন। আমাকে তিনি গান শোনাবেন কি? আমি তো একটি উপলক্ষ। গান গাইতে লাগলেন তিনি নিজের প্রাণের আবেগে। সে কি ভাবের গান। চোখ দিয়ে তাঁর টপ্ টপ্ করে জল গড়িয়ে পড়ছে। আর তিনি একমনে গেয়ে চলেছেন সেই দরবারী কানাড়া।

কতক্ষণ তিনি গাইলেন, কত সময় কেটে গেল—তার কিছুই আমার খেয়াল নেই।

যখন তিনি গান শেষ করলেন, জানলা দিয়ে চেয়ে দেখি, কোথায় রাতের অন্ধকার? আকাশে ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। ঘরের মধ্যেও এসে পড়েছে প্রথম সকালবেলার সেই আলো। এক গানেই রাত কাবার। আমি তাঁর মুখের দিকে এতক্ষণ ভাল করে দেখি নি—গানের সুরে এমন মন্ত্রমুগ্ধ আর অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম। এখন তাঁর দিকে চোখ পড়তে দেখি, চোখের জলে মুখ বুক ভেসে যাচ্ছে। সে একটা দৃশ্য। নিজের সুরসৃষ্টিতে নিজেই আত্মহারা হয়ে নিজের অন্তরকে যেন উজাড় করে দিয়েছেন। আমার বয়স তখন যত কমই হোক, তাঁর চোখের দৃষ্টি দেখে বুঝতে পারলুম, তিনি যেন অন্য মানুষ। যে যদু ভট্ট দুপুরবেলা আমায় হাসিমুখে গান শোনাবার কথা বলেছিলেন, তিনি যেন আর একজন। এখন সেদিনের কথা মনে হলে বুঝতে পারি, তিনি আপনার সুরসৃষ্টিতে আপনি আত্মহারা হয়ে তখন সুরের জগতে চলে গিয়েছিলেন। তাই তাঁর চোখের দৃষ্টি অমন হয়েছিল।

যাই হোক, আমার মুখ দিয়ে কোন কথা তখন বেরুল না। গান শুনে তারিফ করে কিছু বলবার বয়েসও তা নয়।

গান শেষ করে তিনি খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। যেন এই জগতের মাটিতে ফিরে আসতে কিছু সময় লাগছিল!

তার পর আমার দিকে ফিরে বললেন—জানো, এই গানটার একটা ইতিহাস আছে। এই দরবারী কানাড়া গাইবার আগে একবার বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে হাতাহাতি হবার যোগাড়। তানপুরা বাঁধা নিয়ে আসরে একটা কাণ্ড ঘটে যায়। সে এক মজার ব্যাপার।

এই বলে যদু ভট্ট সেদিন আমায় বঙ্কিমবাবুর ওই আসরের কথা আগাগোড়া বললেন।

যদু ভট্ট যে কত বড় গুণী গায়ক ছিলেন, সেকথা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন। বিশেষ রবীন্দ্রনাথ। যদু ভট্টের প্রতি তিনি যে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, তেমন বোধ হয় অন্য কোন কলাবত বা রাগসঙ্গীত গায়ককে জানান নি। সে-সব কথা উদ্ধৃত করে লেখা আর ভারী করবার দরকার নেই। তবে তার মোদ্দা কথাটা শুধু উল্লেখ করা যায়। এবং তা হল—যদু গানের মধ্যে রসসঞ্চার করতে পারতেন। তাই তাঁর গান অত হৃদয়গ্রাহী হত।

যদু অসাধারণ শ্রুতিধর ছিলেন। আর তেমনি ছিল তাঁর সুরসৃষ্টির ক্ষমতা। রবীন্দ্রনাথ সে গল্পও করতেন। সেই যে ত্রিপুরার রাজসভায় এক পশ্চিমী গায়ক একদিন গাইলেন নটনারায়ণ রাগের একটি ছোট গান। যদু ভট্ট তখন সেখানে বসে শুনছিলেন। গাইবার পর সেই ওস্তাদ যদুকে বললেন যে, সেই গানের জুড়ি কোন গান শোনাতে পারলে বেশ হয়। যদুর কাছে তিনি তেমনি একটি গান শোনবার আশা করেন।

যদু বললেন—বেশ, আমি কাল এই রাগের গান এই দরবারে শোনাব।

নটনারায়ণ রাগ যদুর তার আগে জানা ছিল না। কিন্তু তাতে কি? রাগের কাঠামোটি তিনি মনের পটে এঁকে নিয়ে গেলেন সেই আসর থেকে। তার পর ঘরে গিয়ে সে রাতেই ওই সুরে আর চৌতালে তিনি নিজে একটি গান তৈরি করলেন। আর পরের দিন রাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের সামনে, সেই ওস্তাদের সামনে দরবারে গেয়ে শোনালেন সেই গান। যদুর মুখে নটনারায়ণের এমন বিস্তার শুনে সভায় সকলে চমৎকৃত হলেন। আর সেই ওস্তাদও।

এমন প্রতিভা ছিল যদু ভট্টের। তাঁর এই গল্পটি রবীন্দ্রনাথ বলতেন। যদুর সেই নটনারায়ণ গানটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এত ভাল লাগে যে, তার অনুকরণে তিনি পরে একটি বাংলা গান রচনা করেন।

পরম্পরায় যতদূর জানা যায়, যদু ভট্টের তুল্য গায়ক বেশি জন্মান নি। শুধু

বাংলাদেশে নয়, ভারতবর্ষেও। তার কিছু পরিচয় এ পর্যন্ত পাওয়া গেল। আরও কিছু দেওয়া হবে পরে ; তাঁর আরও দু তিনটি আসরের গল্পে।

সে-সব গল্প করবার আগে তাঁর বিষয়ে আর কয়েকটি কথা বলে নিলে হয়। তাঁর সঙ্গীত-শিক্ষার আর প্রথম জীবনের কথা। তাঁর অসাধারণ গায়ক হবার আর খ্যাতি লাভের কথা।

তাঁর মতন গুণী যেমন কম ছিলেন, তাঁর মতন বিখ্যাতও তেমনি কম ছিলেন। অন্তত বাঙালী গায়কদের মধ্যে। বাঙালী ধ্রুপদ-গাইয়েদের মধ্যে।

এদিকে ত্রিপুরার রাজসভা। ওদিকে পশ্চিমের নানা দরবার পর্যন্ত তাঁর নাম-ডাক ছড়িয়েছিল। পশ্চিমাঞ্চলের অনেক দরবারে তিনি সম্মান পেয়েছিলেন। কিন্তু, শোনা যায়, যদু বেশি দিন কোথাও থাকতে পারতেন না চঞ্চল স্বভাবের জন্যে। একমাত্র ত্রিপুরার দরবারে তিনি প্রায় ছ'বছর টিকে ছিলেন। কিন্তু তা তাঁর জীবনের একেবারে গোধূলি বেলায়। সেই শেষ পর্বে তাঁর চাঞ্চল্য অনেকখানি স্তিমিত হয়ে আসে।

মাত্র ৪৩ বছরের জীবন। তারও প্রায় অর্ধেক কালের সঙ্গীত-জীবন। তার মধ্যেও থাকত না নিয়ম-শৃঙ্খলা, সঞ্চয় আর হিসেবের বুদ্ধি, ভবিষ্যতের জন্যে কোন চিন্তা। শুধু সুরের ডানায় ভর দিয়ে মুক্ত পাখীর মতন বিহার। আর আসক্তি একটি জিনিসে। বাকি সমস্ত বিষয়ে উদাসীন।

বিষ্ণুপুরের সন্তান। প্রথম কিছু সঙ্গীত শিক্ষাও সেখানে। বিষ্ণুপুরের আদিগুরু রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের কাছে। কিন্তু কতটুকুই বা সে শিক্ষা! রামশঙ্করের যখন মৃত্যু হল, যদুর বয়েস তখন ১৩ কি ১৪ বছর। আর গুরুর বয়েস ৯২!

তাঁর মৃত্যুর বছর খানেকের মধ্যেই যদু চলে এলেন কলকাতায়। লেখাপড়ার সেখানেই ইতি। তখন মনে তাঁর আকুল আগ্রহ—ভাল করে গান শিখতে হবে। সঙ্গীতের অদম্য আকর্ষণ সেই বালককে একলা কলকাতায় টেনে নিয়ে এল। কলকাতায় অনেক বড় বড় গাইয়ের বাস। সেখানে ভাল করে গান শেখবার সুযোগ পাওয়া যাবে।

এই আশায় যদু বাড়ি থেকে একরকম পলাতক হয়ে এলেন কলকাতায়। সহায়-সম্বলহীন একটি মফস্বলের ছেলে। তাই দুঃখকষ্ট কম পেতে হয় নি। দুর্ভোগ হয়েছে নানা রকম। শেষ পর্যন্ত গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের আশ্রয় পান।

গঙ্গানারায়ণ ইংরেজ আমলের কলকাতার আদিযুগের মহা গুণী ধ্রুপদী।

পশ্চিমাঞ্চল থেকে খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদ শিখে এসেছেন। বাংলাদেশে তখন তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই ধ্রুপদে। যদুর অসাধারণ গলার পরিচয় একদিন হঠাৎ গঙ্গানারায়ণ পেলেন।

শোনা যায়, যদু নাকি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়িতে প্রথমে পাচকের কাজ নিয়েছিলেন কিছুদিন। একে বয়সে কম, তা ছাড়া অন্য কোন কাজও জানতেন না। কলকাতার আসরে গানকে পেশা করে জীবিকা অর্জন করবার মতন গায়কও তখন হন নি। তাই হয়তো রান্নার কাজ করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন সে সময়। কিংবা হয়তো সেই অজুহাতে গঙ্গানারায়ণের বাড়িতে প্রবেশ করেন তাঁর আসল উদ্দেশ্যের জন্যে। গঙ্গানারায়ণ এত বড় গায়ক। তাঁর গান বাড়িতে থেকে নিত্য শোনা যাবে। সুতরাং শিখে নেবার সুবিধে। এই আশাতেও গঙ্গানারায়ণের বাড়ি কাজ নিতে যদু পারেন। খুব সম্ভব সেই লক্ষ্যই ছিল তাঁর।

যা হোক একদিন গঙ্গানারায়ণ যদুকে আনমনা গান গাইতে শোনেন, আর শুনেই বুঝতে পারেন—সে কি বস্তু।

তাকে জিজ্ঞেস করেন—গান শিখবে আমার কাছে?

সে আর বলতে। চাটুয্যে মশায় যদি শেখান দয়া করে। যদুর তার চেয়ে বড় সাধ আর কিছু নেই। যদু তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে যান।

গঙ্গানারায়ণ বলেন—বেশ! এবার থেকে আমার কাছে গান শিখবে। আর শোনো। রান্নাঘরে আর তুমি যেও না, ওসব তোমার আর করবার দরকার নেই।

শুধু গান শেখা নয়। যদু গঙ্গানারায়ণের বাড়ি আশ্রয়ও পেলেন। সেকালে এমন হত। আরও কারও কারও জীবনে ঘটেছে এরকম।

যদু রয়ে গেলেন গুরুর বাড়ি। প্রাণ ভরে গান শিখতে লাগলেন সেখানে থেকে। জোড়াসাঁকো, বলরাম দে স্ট্রীটের সেই বাড়িটিতে।

কয়েক বছর ধরে তিনি গঙ্গানারায়ণের কাছে ধ্রুপদ গান শিখলেন। খাণ্ডারবাণী রীতির ধ্রুপদ, যাকে তানসেন বলেছেন—গানের রাজ্যে সেনাপতি (ফৌজদার)।

গঙ্গানারায়ণের কাছে শেখবার পর, যদু পশ্চিমে চলে যান। পশ্চিমাঞ্চলের অনেক রাজ্যে ঘোরেন। অনেক দরবারে গান করেন, গান শোনেন। আর শোনা যায়, কোন কোন ওস্তাদের কাছে শেখেনও এক এক সময়। কখনও জানিয়ে, কখনও না জানিয়ে।

এমনি করে তিনি হন বিখ্যাত গায়ক যদু ভট্ট।

সঙ্গীতের আসরে তিনি সাধারণত খাণ্ডারবাণীতে গাইতেন, শ্রুতিস্মৃতিতে তাই বলে। তাঁর গানে গমকের কাজ খুব বেশি থাকত। আর গলা চড়ত খুব। তারা গ্রামে অনায়াসে তাঁর কণ্ঠ যথেচ্ছ সুর বিহার করত আর সেই সঙ্গে তাঁর স-দাপট গমক।

সব সময়েই তিনি যে গমক-প্রধান পশ্চিমী ধ্রুপদ গান গাইতেন, তা নয়। বাংলা ধ্রুপদও গাইতেন, সেরকম আসর হলে। তাঁকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কিছুদিন আদি ব্রাহ্ম সমাজের গায়ক নিযুক্ত করেছিলেন। তখন সমাজে (এবং জোড়াসাঁকো মহর্ষি ভবনেও) তিনি অনেক ব্রহ্মসঙ্গীত গেয়েছেন। ব্রাহ্ম সমাজে গাওয়া তাঁর সেই সব বাংলা ধ্রুপদও তখন বিখ্যাত হয়েছিল। যেমন —"বিপদ ভয় বারণ, যে করে ওরে মন, তাঁহারে কেন ডাক না" (ছায়ানট, ঝাঁপতাল)। "দেখিয়ে হৃদয় মন্দিরে, ভজ না শিবসুন্দরে" (দেশ, সুরফাঁক্তা) ইত্যাদি।

অত বড় গাইয়ে ছিলেন যদু, কিন্তু নিজের গানের বিষয়ে কোন অহঙ্কার বা অভিমান ছিল না। গানের আসর হবে খবর পেলে কত সময় নিজেই চলে আসতেন সেখানে। তাঁকে সেখানে গাইবার জন্যে আগে হয়তো আমন্ত্রণও জানান হয় নি। কিন্তু সভায় এসে বসবার পর তাঁকে গাইতে অনুরোধ করা হয়েছে। আর গেয়েছেনও তিনি। তখন অত নামডাক—কিন্তু সে বিষয়ে কোন অভিমান নেই।

বাহ্য অনেক ব্যাপারেই আন্‌মনা। বেশভূষার পারিপাট্যও তেমনি। পরনে যেমন-তেমন একটি কাপড়। গায়ে উড়ুনি জড়ানো। আর পায়ে এক জোড়া চটি। এই বেশে কত বড় বড় আসরেই আসীন হয়েছেন। কৃশ, দীর্ঘকায়, শ্যামবর্ণ শরীর যদু ভট্টের। কত আসরের শ্রোতারা প্রথমে গ্রাহ্যই করত না। তার পর স্তম্ভিত হয়ে যেত তাঁর গান শুনে।

পাখোয়াজী কেশব মিত্রের সঙ্গত যদু বড় ভালবাসতেন। কত আসরে যদু গান গেয়েছেন তাঁর বাজনার সঙ্গে। তাঁদের দুজনের মধ্যে বেশ একটি অন্তরঙ্গতার ভাব ছিল। কেশববাবুর বাজনা হবে শুনে অনেক সময়ে যদু নিজের থেকে উপস্থিত হতেন আসরে। তাঁর সঙ্গতে গান গেয়ে তিনি বড় তৃপ্তি পেতেন।

যদু ভট্টের গানের সঙ্গে কেশব মিত্রের পাখোয়াজ; এমন জুটি কমই ছিল তখনকার আসরে।

যদুর সাহসও ছিল খুব। ভয়ডর কাকে বলে, একেবারে জানতেন না। মহা মহা গুণীর পাশে বসে তেজের সঙ্গে গেয়ে গেছেন। পরোয়া করেন নি কাউকে। বড় বড় ওস্তাদের দাপটের সঙ্গে গানের পরে, জমাট আসরে তিনি গান ধরেছেন। তার পর নিজের দিকে ঘুরিয়ে এনেছেন আসরকে। অন্য অনেক গাইয়ে সেখানে হয়তো গান ধরতে সাহস করতেন না, যদু সেখানে গেয়েছেন এবং আসর মাত করেছেন। এমন হয়েছে অনেকবার।

সুবিখ্যাত ধ্রুপদী মুরাদ আলী খাঁ। তাঁর মতন মেজাজী আর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন গাইয়ে সারা ভারতে তখন কমই ছিলেন। সেই মুরাদ আলী এক আসরে গাইছেন। যদু এসে হাজির হলেন সেখানে। মুরাদের গলায় আর সবই ছিল, শুধু তেমন চড়ত না। একেবারে যে চড়ত না, তা নয়। যাঁদের চড়া গলা, তাঁদের হিসেবে গলা সে রকম চড়ার কাজ করতে পারত না মুরাদ আলীর।

সেই আসরটিতেও মুরাদ ডি-তে গাইলেন। গান খুবই ভাল হল। আসর জমজমাট।

তাঁর পরেই যদুর গাইবার পালা। গান আরম্ভ করবার আগে তিনি হাতে সেই তানপুরা তুলে নিলেন। মুরাদের সামনে বসেই তাঁর নিজের হাতে ডি-তে বাঁধা তানপুরার সুর চড়িয়ে নিলেন এফ্-এ। তার পর দরাজ গলায় গাইতে লাগলেন। আর সেই অসম্ভবকেও সম্ভব করে তুললেন। অর্থাৎ, মুরাদ আলীর সেই অপূর্ব জোয়ারীদার গলার পরেই আবার নতুন করে জমালেন আসরকে।

এমন সাহস আর এমন সুর যদু ভট্টের ছিল।

আর একটি আসরের গল্প শোনা যায় তাঁর। এই আসর হয়েছিল রূপচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে, ভবানীপুরে।

নবাব ওয়াজিদ আলী শা'র এক উচ্চ কর্মচারী ছিলেন রূপচাঁদ মুখোপাধ্যায়। লক্ষ্ণৌর শেষ নবাব ওয়াজিদ আলী শা' নির্বাসিত হয়ে এসে মেটিয়াবুরুজে ছিলেন। তাঁর সঙ্গীতপ্রিয়তা আর তাঁর মেটিয়াবুরুজ দরবারের কথা পরে অনেকবার আসবে। এখানে আর সে-সব বলবার দরকার নেই।

রূপচাঁদের কথা বরং একটু বলে নিলে হয়। তিনিও ছিলেন বড় সঙ্গীতপ্রিয়। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই তাঁর বাড়িতে গান-বাজনা হত। আর সেই জলসায় অনেক বড় বড় গাইয়ে-বাজিয়ে আসতেন। বাঈজীদেরও আগমন ঘটত মাঝে মাঝে। মেটিয়াবুরুজের নবাবের প্রিয় এক উচ্চ কর্মচারী ছিলেন বলে তাঁর খাতিরে সেখানকার গাইয়ে বাজিয়ে থেকে আরম্ভ করে বাঈজীরাও তাঁর বাড়ির আসরে গান-বাজনা করতেন। তাঁর বাড়ির জলসা হত উঁচুদরের।

রূপচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের নামে ভবানীপুরে একটি রাস্তা আছে, রসা রোডের পশ্চিমে। সেই রূপচাঁদ মুখার্জী লেন যেখানে কালীঘাট রোডের সঙ্গে মিলেছে, সেইখানে রূপচাঁদের বাড়ি। এখনও সে বাড়ির অস্তিত্ব আছে বটে। কিন্তু তার পূর্বরূপ আর নেই। আকার-প্রকারে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে! একটি পরিবর্তন হল—রাস্তার দিকে অনেক ওস্তাদের অনেক গান-বাজনার স্মৃতি-জড়ানো সেই দোতলার প্রকাণ্ড ঘরখানি এখন নিশ্চিহ্ন।

কিন্তু যখন সে বাড়ির মালিক ছিলেন রূপচাঁদ মুখোপাধ্যায়, যখন সেই জলসাঘর সপ্তায় সপ্তায় গুণীজনের সুরধারায় মুখরিত হয়ে উঠত—তখনকার একদিনের এই কাহিনী। আর সেদিনের নায়ক যদু ভট্টের কথা এখানে বলা হবে।

রাস্তার ধারের দোতলায় রূপচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের জলসাঘর। সেখানে সেদিন বড় আসর বসেছে। কয়েকজন ওস্তাদ এসেছেন। কয়েকটি বাঈজীও উপস্থিত। প্রায় সকলেই মেটিয়াবুরুজ দরবারের। আন্‌সাদ দৌলা, মুস্তাকিন্‌ দৌলা প্রভৃতি ওস্তাদ। বাঈজীদের নাম জানা যায় নি।

মেটিয়াবুরুজের বাইরেকার যাঁরা, তাঁদের মধ্যে ছিলেন পাখোয়াজী কেশববাবু। কোথা থেকে খবর পেয়ে যদু ভট্ট এসে পড়েছেন। তাঁকে গাইবার জন্যে সেদিন নিমন্ত্রণ করে পাঠানো হয় নি। তিনি এসেছেন কেশব মিত্রের বাজনা হবে শুনে। এরকম ভাবে যদু অনেক সময় আসরে চলে আসতেন। তারপর আসর বা বাড়ির কর্তা তাঁর পরিচয় পেয়ে খাতির-যত্ন করতেন। অনুরোধ করতেন আসরে গাইবার জন্যে।

সেদিন এই আসরে দুজন বাইরেকার গায়ককে গাইবার জন্যে আনা হয়েছিল। তাঁরা পেশাদার এবং ভাল গাইয়ে। কিন্তু কলকাতার সঙ্গীত-সমাজে অপরিচিত। তাই উদ্দেশ্য ছিল এই আসরে তাঁদের গুণপনার পরিচয় দিয়ে কলকাতার সঙ্গীতক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ করে দেওয়া। স্থানীয় সঙ্গীতপ্রেমী এবং গুণীদের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ঘটানো।

এখনকার মতন সেকালেও অবস্থা অনেকটা একরকম ছিল। এখনও যেমন, তখনও তেমনি কলকাতাই ছিল সঙ্গীত ও সঙ্গীতজ্ঞদের শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে। সে প্রায় ৯০।৯৫ বছর আগেকার কথা। কলকাতা তখন ভারতবর্ষের রাজধানী। শুধু রাষ্ট্রনীতিক নয়, সাংস্কৃতিক জীবনেরও রাজধানী কলকাতা। সঙ্গীতকে যিনি জীবনের অবলম্বন করতে চান, বৃত্তিরূপে তার চর্চা করতে চান, তাঁকে কলকাতায় আসতে হবে। অন্তত কখনও কখনও। এলে

তাঁরই সমাদর বাড়বে, তাঁর গুণপনা প্রতিষ্ঠা লাভের সুযোগ পাবে। আজও কলকাতা সঙ্গীত বিষয়ে তেমনি অতিথি-বৎসল, সঙ্গীতজ্ঞদের পৃষ্ঠপোষকতায় তেমনি অকৃপণ, যদিও বাহ্যত রাজধানীর গৌরব তার অনেককাল নেই।

যাক সে কথা।...সেদিনের আসরে পশ্চিমের সেই দুই গায়কের গান হল। আসরে তাঁদের গানের সকলে সুখ্যাতি করলেন। তাঁদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল উপস্থিত গুণীদের সঙ্গে। তাঁদের গান শুনে সকলের মনে বেশ ভাল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। আসরে তাঁরা বেশ প্রভাব বিস্তার করেছেন, বলা যায়।

এমন সময় গাইতে অনুরোধ করা হল যদু ভট্টকে। তিনি যখন এসেছেন আসরে, তখন তাঁকে গাইতে না বলার কথা কেউ ভাবতে পারেন না। আর অনুরোধ করলে তিনি গাইবেনই। গাইবেন আপনার অন্তরের তাগিদে। গানের আসরে গান না গেয়ে তিনি পারেন না। কারণ গান তাঁর দ্বিতীয় সত্তা। গাইবার জন্যে নিমন্ত্রিত হয়ে আসেন নি, অতএব 'আজ গলা খারাপ আছে' এমন মিথ্যে অজুহাত দিয়ে এড়িয়ে যাবার পাত্র নন তিনি। গানের ব্যাপারে কোন ন্যাকামি কিংবা বাজে অহমিকাবোধ তাঁর ছিল না।

তিনি সম্মত হয়ে তানপুরাটি তুলে নিলেন। সুর নতুন করে বাঁধবেন। এই তানপুরাতেই গান গেয়েছেন আগেকার সেই দুই গায়ক। তাঁদের বয়েস খুব বেশি নয় আর গলাও বেশ তেজী।

কিন্তু যদু তাঁদের বাঁধা তানপুরা হাতে নিয়েই তিন পর্দা চড়িয়ে বাঁধলেন। সুর করে নিলেন মধ্যমকে—মুদারার মা-কে করলেন সা। তার পর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ দরাজ কণ্ঠে গান আরম্ভ করে দিলেন। তাঁর গানের প্রথম চোটেই সেই দুই গায়ক যে কোথায় তলিয়ে গেলেন তা জানতেও পারলেন না তিনি।

তবে সে বেচারাদের তা বুঝতে বাকি রইল না। আর যাঁরা তাঁদের সে আসরে গাইবার ব্যবস্থা করেছিলেন, তাঁরাও বুঝলেন বিলক্ষণ। সে দুজনের গানে আসরে যে ছাপ পড়েছিল, যদুর ওই মধ্যমকে সুর করে আর সেই অপূর্ব গলায় গান আরম্ভ করবার সঙ্গে সঙ্গেই তা একেবারে মুছে গেল। কিন্তু কি আর করেন তাঁরা। বসে বসে শুনতে লাগলেন।

যদু ততক্ষণে সমস্ত আসরটিকে বেঁধে ফেলেছেন সুরের জালে। পাখোয়াজ সঙ্গত করছেন কেশব মিত্র।

খানিক পরেই আবার একটি ছোট্ট ঘটনা ঘটল। যদুর গানই তখন চলছে। তিনি যেখানে বসে গাইছিলেন, তাঁর অনতিদূরে বসেছিল বাঈজীরা।

তারাও যদুর গান শুনছিল বটে, কিন্তু বোধ হয় কিছু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। কিংবা হয়তো ঠিক খেয়াল করে নি যদুর গানের পদ্ধতি।

তিনি তখন খানিকক্ষণ ধরে খাদের কাজ করছিলেন। বাঈজীরা তা মন দিয়ে না শোনার জন্যেই সম্ভবতঃ বুঝতে পারে নি যে গায়ক স্বেচ্ছায় উদারায় নেমেছেন। তারা ভাবলে, তিনি বোধ হয় ঠিক সুরে ফিরতে পারছেন না। বেসুর হয়ে পড়ছেন।

তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল—সুরমে গানা বহুৎ কড়া হ্যায়। (সুরে গাওয়া বড়ই কঠিন।)

কথাটা হঠাৎ যদুর কানে গেল। শোনবামাত্র তিনি এক মুহূর্ত গান থামিয়ে তাদের দিকে গর্জন করে উঠলেন—চোপ্ রও।

বলেই একেবারে গলা চড়িয়ে তারা গ্রামে এমন গমক ছাড়লেন যে আসরে যেন বিদ্যুতের চমক খেলে গেল।

সচকিত বাঈজীরা স্বতস্ফূর্তভাবে বলে উঠল—শের হ্যায়!

অর্থাৎ যদু যেন বাঘের মতন।

যদু গান শেষ করলেন, শ্রোতাদের প্রশংসায় ধন্য হয়ে। কিন্তু সে আসরের জের সেখানেই মিটল না।

সেই আসরের সূত্র ধরে যদু ভট্টের সুখ্যাতি পৌছল মেটিয়াবুরুজ দরবারে। সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীতপ্রেমী নবাব ওয়াজিদ আলী যদু ভট্টের গুণপনার কথা শুনলেন: অসাধারণ সেই বাঙ্গালী গায়কের গলা। তাঁর গান শোনবার জিনিস, ইত্যাদি।

সেই বাঈজীরা এবং মুস্তাকিন্ দৌলা, আন্‌সাদ দৌলা সকলেই ফিরে গিয়ে যদু ভট্টের গানের গল্প করতে লাগলেন নবাব দরবারে। তাঁদের মুখে নবাব যদু ভট্টের গানের কথা শুনলেন। মুস্তাক ও আন্‌সাদ নবাবকে জানালেন যে, এমন ওস্তাদের গান খুব কমই শুনেছেন তাঁরা।

বাঈজীরা সেই মন্তব্যই করলে—শের হ্যায়।

নবাব তার আগে যদু ভট্টের কথা কিছু জানতেন না। এই সব শুনে যদু ভট্টকে একদিন মহ্ফিলের নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। কেশববাবুকেও আমন্ত্রণ করা হল তাঁর সঙ্গে পাখোয়াজ সঙ্গত করবার জন্যে।

মহ্ফিলের দিন স্থির হল একটি শনিবার। যদুর গানের জন্যেই সেদিন বিশেষ জলসার আয়োজন হয়েছে দরবারে।

যদু ভট্ট উপস্থিত হয়েছেন। কেশববাবুও এসেছেন। অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা, গায়ক-বাদক আর শ্রোতারাও এসে গেছেন সকলে।

নবাব তাঁর দরবারের নিজস্ব আসনে বসলেন। এইবার যদুর গান আরম্ভ হবে। যথারীতি কায়দামাফিক তাঁকে অনুরোধ জানানো হল।

তিনি তানপুরার সুর মিলিয়ে নিলেন মনের মতন করে। কেশববাবুও তার সঙ্গে পাখোয়াজ বাঁধলেন।

এবার যদু ভট্ট গান আরম্ভ করবেন। নবাব এবং আসরের অনেকেই তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে।

কিন্তু যদুর গান আরম্ভ হচ্ছে না। তিনি উসখুস করছেন। এদিক্-ওদিক্ চাইছেন আর মুখ খোলবার যেন লক্ষণ নেই।

কি ব্যাপার? গান আরম্ভ করছেন না কেন?

শ্রোতাদের সঙ্গে নবাবও কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। একজন অনুচরকে দিয়ে জানতে চাইলেন—কি হয়েছে গায়কের? এবার গান ধরবেন তো?

নবাবের হয়ে যদুর কাছে এসে সেকথা জিজ্ঞেস করলেন একজন। সেই সঙ্গে গান আরম্ভ করবার জন্যে আর একবার অনুরোধ জানালেন।

যদু তখন সেই ব্যক্তির প্রশ্নের সদুত্তর দিলেন কানে কানে।

সুর ভিন্ন জীবনে যদু ভট্টের দ্বিতীয় আসক্তি আর একটিমাত্র বস্তুতে। শুনতে তা অনেকটা সুরেরই মতন।

গান আরম্ভ করবার আগে এখন একটু হলে ভাল হয়। এখানে সুবিধে হবে কি?

এই ইচ্ছা সবিনয়ে এবং ইশারায় যদু সেই ব্যক্তিকে জনান্তিকে জানালেন, নবাবের সম্মতির জন্যে।

নবাব তা জানতে পেরে বললেন যদুকে দরবারেরই লাগাও একটি ঘরে নিয়ে যেতে।

যদু উঠে গেলেন নির্দিষ্ট কামরায়। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এলেন। আসরের কেউ কেউ বুঝতে পারলেন, কেউ বা বুঝলেন না এই যাতায়াতের কারণটি। কেশববাবু বিলক্ষণ বুঝলেন।

যদু এবার বেশ প্রফুল্ল হয়ে গান ধরলেন। গান আরম্ভ করবার আগে শুধু একবার কেশববাবুর কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন—ওঃ, কি জিনিস! আমার চোদ্দ পুরুষে কখনও এমন···

কথা শেষ করেই তিনি গান শুরু করে দিলেন। মেজাজ তখন শরীফ!

তখন আসরের যদু ভট্ট! অন্য কোন ভাব নেই। অন্য কোন ভাবনা নেই। সুরের মধ্যে তন্ময় হয়ে গেলেন নিজে। আর শ্রোতাদের তন্ময় করতে

আরম্ভ করলেন।

সমস্ত তুচ্ছতাকে নীচে ফেলে রেখে তিনি যেন কোথায় উঠে গেলেন, অসীম আকাশে স্বরচারী হয়ে। সঙ্গে মৃদঙ্গের মেঘধ্বনি। সারা দরবার স্থরে স্থরে ভরে উঠল।

নবাব স্থরের আবেশে আপন আসন ছেড়ে যদুর সামনে এসে শুনতে লাগলেন।

আসরের সবাই মোহিত হয়ে গেলেন যদুর গান শুনে। নবাবও পরম পরিতৃপ্ত হলেন।

গান শেষ হতে সকলে সাবাস বলতে লাগলেন যদুকে।

নবাব এতদূর মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। উচ্ছ্বসিত হয়ে উর্দুতে যদুকে যা বললেন, তার অর্থ—আপনার গান শুনে আমি আজ বড় খুশী হয়েছি। আপনাকে আমি পুরস্কার দিতে চাই। কি নেবেন, কি চান আপনি, বলুন।

যদু ততক্ষণে স্থরের নভোমণ্ডল থেকে নেমে এসেছেন কাদামাটির পৃথিবীতে।

তাই নবাবের 'কেয়া মাংতা, বলিয়ে'-র জবাবে সাফ বললেন—ওই চীজ!

তখন নবাবের হুকুমে আবার যদুকে নিয়ে যাওয়া হল, দরবারের পাশের সেই ঘরটিতে।

যদু ভট্টের অনেক গল্পের মতন এটিও বলেন কেশববাবু।

সেই আসরের কথায় তিনি বলতেন—যদু ভট্টের গান শুনে নবাবের তখন এমন খোশমেজাজ যে সেদিন সে লাখ টাকা চাইলেও নবাব পেছপা হতেন না। কিন্তু যদু চেয়ে বসল—ওই চীজ্!

সেকালের সেতার ডুয়েট

ইদানীং কালে সঙ্গীত সম্মেলন ইত্যাদিতে ডুয়েট বাজনা শোনা যাচ্ছে। রবিশঙ্কর ও আলী আকবর সেতার সরোদ ডুয়েট বাজিয়ে কত আসর মাত করেছেন। হাফিজ আলী খাঁ তাঁর কিশোর বয়সী পুত্র আমজাদ আলীর সঙ্গে জুড়িতে সরোদ বাজিয়েছেন, ছেলেটি পরিচিত হয়েছে সঙ্গীত-সমাজে। ওস্তাদ

আলাউদ্দীন খাঁ পৌত্র আশীষকুমারকে নিয়ে দ্বৈত সরোদ শুনিয়েছেন, অতীত ও বর্তমানের স্বরসেতু রচনা করে! এমনি কত গুণী ডুয়েট বাজিয়েছেন।

শুধু বাজনা কেন। দ্বৈত কণ্ঠে গানও কেউ কেউ গেয়েছেন। সালামৎ ও নাজাকৎ আলীর খেয়ালে অপূর্ব স্বর বিহার। ডাগর ভ্রাতাদের কণ্ঠে অভিনব ধ্রুপদ।

এসব সাম্প্রতিক কালের ঘটনা। এর আগেকার যুগে ললিতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী তাঁদের অপরূপ কণ্ঠে দ্বৈত ধ্রুপদ শুনিয়ে গেছেন। তার আগের যুগে, তালাধ্যায়ে বিখ্যাত শিবসেবক ও পশুপতিসেবক মিশ্র জুড়িতে ধ্রুপদ গান করেছেন বহু আসরে।

এমনিভাবে দেখা যায়, জুড়িতে বাজানো বা গান গাওয়া এদেশে নতুন নয়। যাঁদের নাম করা হল, তাঁদেরও অনেক আগে থেকে ডুয়েট গান-বাজনা চলে আসছে। অন্ততঃ আজ থেকে প্রায় ৮০ বছর আগে একটি ডুয়েট বাজনার কথা পাওয়া যায়। সেটি বলবার মতন। অতদিন আগেও যে এখানে রাগসঙ্গীতে ডুয়েট বাজানো হয়েছিল, তা হয়তো অনেকেরই জানা নেই। আর তাও যেমন-তেমন বাজানো নয়, অতি উঁচু দরের বাজনা। একথা একজন যথার্থ সঙ্গীত-শিল্পীর লেখা থেকে জানা যায়।

সেই ডুয়েট সেতার বাজিয়েছিলেন রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

দ্বৈত গান বা বাজনার অনুষ্ঠান করেন সাধারণতঃ গুরু-শিষ্য কিংবা দুই গুরুভাই। কারণ একই রীতিতে সঙ্গীত-চর্চায় যাঁরা অভ্যস্ত তাঁরাই ডুয়েট গান-বাজনা করে থাকেন। দুটি ভিন্ন ঘরের শিল্পীর পক্ষে দ্বৈত সঙ্গীত সার্থক হয় না। প্রথমে যাঁদের নাম করা হয়েছে, তাঁরা হয় গুরু-শিষ্য, নচেৎ একই গুরুর শিষ্য অর্থাৎ গুরুভাই।

শৌরীন্দ্রমোহন ও কালীপ্রসন্নও গুরুভাই ছিলেন। আচার্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর দুই প্রিয় শিষ্য।

ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী অনেক কারণে ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। সে-সব কথা এখানে সবিস্তারে বলবার দরকার নেই। শুধু উল্লেখ করে রাখা যাক যে—তিনি ভারতবর্ষে সবার আগে ঐকতান বাদন (কন্‌সার্ট) গঠন করেন। স্বরলিপিও এদেশে প্রথম রচনা করেন তিনি। বাংলা ভাষায় (এবং প্রথম ভারতীয় ভাষায়) প্রণালীবদ্ধ ভাবে সঙ্গীততত্ত্বের আলোচনাতেও তাঁকে একজন পথিকৃৎ বলা যায়।

তাঁর এই দুই শিষ্যের মধ্যে কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি আসরের কাহিনী এর পরেই বলা হবে।

এখন শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কথা। তাঁকে এদেশের সঙ্গীত-রেনেসাঁসের একজন প্রধান পুরুষ বললে বেশি বলা হয় না। সঙ্গীতচর্চার সব বিভাগে তাঁর এত দান আছে যে, তাঁর নাম ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। —যথা—বাংলা ভাষায় বহু মূল্যবান সঙ্গীতগ্রন্থ রচনা ও সঙ্গীতে একাধিক বিষয়ে প্রথম পুস্তক প্রণয়ন। পদ্ধতিগত ভাবে সঙ্গীত শিক্ষাদানের জন্যে সুপরিকল্পিত সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপন। প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রের পুনরুদ্ধার ও মুদ্রণের ব্যবস্থা। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী প্রবর্তিত স্বরলিপি প্রণালীর প্রচার এবং নিজে বহুল পরিমাণে স্বরলিপি রচনা ও প্রকাশ। বহু সঙ্গীতগুণীর পৃষ্ঠপোষকতা এবং তাঁদের দ্বারা উৎকৃষ্ট সঙ্গীতের প্রচলনে সাহায্য। ভারতীয় সঙ্গীতকে প্রণালীবদ্ধ ও বিভিন্ন মতের সমন্বয় করবার জন্যে কলকাতায় প্রথম বিরাট সম্মেলনের অনুষ্ঠান। ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রগুলির সংগ্রহশালা স্থাপন। দক্ষ শিল্পীদের দ্বারা বিভিন্ন রাগরূপের চিত্রাবলী অঙ্কন। প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত গুরুর কাছে শিক্ষালাভের সুব্যবস্থা। ইংরেজীতে পুস্তকাদি রচনার দ্বারা পাশ্চাত্য জগতে ভারতীয় সঙ্গীতবিদ্যার পরিচয় দান ও তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি।

এই সবের সঙ্গে বিশিষ্ট গুণীদের কাছে তাঁর রীতিমত সঙ্গীতশিক্ষার কথাও ধর্তব্য। এমন বিশেষভাবে শিক্ষা লাভ না করলে তিনি ভারতীয় সঙ্গীতের মর্ম গ্রহণ করতে হয়তো পারতেন না। পদ্ধতিগত শিক্ষা তাঁর সঙ্গীতবিষয়ে সব কাজের একটি প্রধান প্রেরণা ছিল, বলা যায়।

শৌরীন্দ্রমোহন একাধিক কলাবতের কাছে ভাল করে সঙ্গীতশিক্ষা করেছিলেন। শুধু কণ্ঠসঙ্গীত নয়, যন্ত্র-সঙ্গীতও। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর কথা আগে বলা হয়েছে। তিনি ছিলেন শৌরীন্দ্রমোহনের প্রথম সঙ্গীতাচার্য।

তাঁর দ্বিতীয় সঙ্গীতগুরু হলেন পণ্ডিত লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্র। তিনি বারাণসীর বীণকার এবং সারদা সহায় ও গোপালপ্রসাদ মিশ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মীপ্রসাদ বীণকার বলে পরিচিত হলেও তাঁদের ঘর ছিল ধ্রুপদী। মিশ্রজীর কাছে ক্ষেত্রমোহনও শিক্ষা পেয়েছিলেন এবং শৌরীন্দ্রমোহন লক্ষ্মীপ্রসাদের কাছে সঙ্গীতবিষয়ে বিশেষ লাভবান হন।

লক্ষ্মীপ্রসাদ ভিন্ন আর একজন বড় ওস্তাদের তালিম পান শৌরীন্দ্রমোহন। তিনি হলেন সুবিখ্যাত সেতারী সাজ্জাদ মহম্মদ। সুরবাহার যন্ত্রের প্রথম

বাদ্যকার গোলাম মহম্মদের পুত্র ও শিষ্য। সাজ্জাদ মহম্মদ শেষ বয়সে অনেকদিন শৌরীন্দ্রমোহনের আশ্রয়ে ছিলেন এবং শৌরীন্দ্রমোহন তাঁর কাছে সেতারের শিক্ষা পান। সমস্ত যন্ত্রের মধ্যে সেতার ছিল শৌরীন্দ্রমোহনের সব চেয়ে প্রিয় বাজনা এবং সেতারে তিনি কৃতবিদ্য হয়েছিলেন।

সেতার-বাদক রূপে তাঁর গুণপনার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আর তা হল কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর ডুয়েট বাজনা।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের একেবারে গোড়ার কথা। জানুয়ারী মাস। তখনকার ইউরোপের বিখ্যাত বেহালাশিল্পী কলকাতায় এসেছেন। তিনি হলেন প্রফেসর এড্‌ওয়ার্ড রেমেনী, জাতিতে হাঙ্গেরিয়ান। বেহালা বাজনায় তাঁর এমন সুনাম যে তিনি King of Violin নামে সুপরিচিত।

তিনি পর্যটনে বেরিয়ে কলকাতায় উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর ভারতীয় সঙ্গীত শোনবার, তার সাক্ষাৎ পরিচয় পাবার বিশেষ ইচ্ছা। তাই শৌরীন্দ্র-মোহনের প্রাসাদে (৬৫, পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীট) তাঁর নিমন্ত্রণ হল।

শৌরীন্দ্রমোহনের নাম প্রফেসর রেমেনী তার আগেই শোনেন। কারণ শৌরীন্দ্রমোহন ইউরোপের অনেক দেশ থেকে সঙ্গীতচর্চার জন্যে সম্মান লাভ করেন, ভারতবর্ষে বাস করেই। যে সময়ের কথা হচ্ছে, তখনই তিনি অনেক বিদেশ থেকে সঙ্গীতজ্ঞের স্বীকৃতি পেয়েছেন। তাঁর আগে কোন ভারতীয় এমন আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন নি সঙ্গীতের জন্যে। শুধু বিদেশে কেন, দেশেও তিনি সঙ্গীতচর্চার জন্যে যত সম্মান পান, তা সে-যুগে দুর্লভ ছিল। তাঁর 'রাজা' উপাধিও (১৮৮০ খ্রীঃ) পেয়েছিলেন সঙ্গীত-গুণের জন্যে, অর্থসম্পদের কারণে নয়।

যা হোক, শৌরীন্দ্রমোহনের আমন্ত্রণ পেয়ে এড্‌ওয়ার্ড রেমেনী পাথুরিয়াঘাটায় এলেন। বিদেশী সঙ্গীতশিল্পীকে শৌরীন্দ্রমোহন অভ্যর্থনা করলেন তাঁর সঙ্গীতসভায়।

তারপর আরম্ভ হল সঙ্গীতের আসর। শৌরীন্দ্রমোহন ও কালীপ্রসন্ন দ্বৈত সেতার বাজালেন।

বাজনা শেষ হতে সাহেব উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। কিন্তু তাই সব নয়। তাঁদের দুজনের সেতার তাঁর কেমন লেগেছিল, সে বিষয়ে তিনি লিখলেন (১৪ই জানুয়ারী, ১৮৮৬) Englishman কাগজে।

সেই লেখা থেকে বোঝা যায় যে, প্রফেসর রেমেনী সঙ্গীতের কত বড় সমঝদার ছিলেন। তাঁর শিল্পী-সত্তা বিজাতীয় আর বিভিন্ন পদ্ধতির দূরত্ব পার

হয়ে ভারতীয় সঙ্গীতের মর্ম কেমন গ্রহণ করেছিল ! কি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গেই তিনি শুনেছিলেন তাঁদের সেতার ডুয়েট। তাঁর লেখাটির এখানে অনুবাদ করে দেওয়া হল :

"আমার সৌভাগ্য যে রাজা শৌরীন্দ্রমোহনের কাছ থেকে ক'দিন আগে সনির্বন্ধ নিমন্ত্রণ পাই। তিনি আমন্ত্রণ জানালেন, তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে সত্যিকার প্রাচীন হিন্দু-সঙ্গীত শোনবার জন্যে। আমার কাছে এটি বড়ই স্বাগত মনে হল। কারণ তার আগে আমি এই সঙ্গীতজ্ঞ রাজার বিষয়ে অনেক কিছু শুনেছিলুম।...রাজার বাড়িতে যাবার পর বাবু কালীপ্রসন্ন ব্যানার্জীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়।...রাজা বাজাতে লাগলেন এক রকমের মিশ্র হিন্দু সেতার। বাবু কালীপ্রসন্ন ব্যানার্জীর হাতে ছিল একটি খাঁটি হিন্দু সেতার। হিন্দু-সঙ্গীত ও বিদ্যার দেবী সরস্বতীর হাতে যেমন দেখা যায়, তাঁর সেতারটিও তেমনি বড় আকারের। আর আমার এও মনে হল যে, এই দুই গুণীর স্বরস্থষ্টির সময় সেই পৌরাণিক দেবী তাঁদের মাথার ওপর তাঁর অভয় পক্ষ বিস্তার করে আছেন। (তাঁদের বাজনা শুনে) আমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে যাই আর অকপটে আমার সেই আনন্দ প্রকাশ করি। এই প্রকৃত সঙ্গীত আমি অটুট মনোযোগ দিয়ে শুনেছিলুম। কোন বিদেশী প্রভাব এই সঙ্গীতকে স্পর্শ করে নি। শুনতে শুনতে তাঁদের সঙ্গীতের সমস্তই আমার কাছে চমৎকার পরিষ্কার হয়ে যায়, আমি বেশ বুঝতে পারি তার মর্ম। যা সব চেয়ে মহান, তা সব চেয়ে সরল—আর্টে একথা বড় সত্য। গ্যেটে ঠিকই বলেছেন।

"বাবু কালীপ্রসন্ন ব্যানার্জী অতি উঁচু দরের গুণীর মতন রাজার সঙ্গে (বাজনায়) সহযোগিতা করলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলুম তিনি তাঁর দ্বৈত বাদনে নানারকম অতি জটিল স্বর উপস্থিত ক্ষেত্রে রচনা করছেন। আর সে-সব কাজ অতি সুন্দর। আমি একেবারে আশ্চর্য হয়ে তাঁদের চমৎকার অনুষ্ঠানের সময় আবিষ্কার করলুম যে, আমাদের ইউরোপীয় সঙ্গীতের মতন হিন্দু-সঙ্গীতও সম্পূর্ণ একই ভিত্তির ওপর গড়ে উঠেছে। ইউরোপীয় সঙ্গীতও অবশ্য এসেছে প্রাচ্য থেকেই।

"উপসংহারে আমি শুধু অকৃত্রিম ধন্যবাদ জানাতে চাই রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও বাবু কালীপ্রসন্ন ব্যানার্জীকে। তাঁরা আমাকে সঙ্গীতের এই রহস্য উন্মোচন করে কি আনন্দই দিয়েছেন! আর আমার ধারণা, ছিদ্রান্বেষী ইউরোপের অনেক সঙ্গীত-পণ্ডিতই এই সঙ্গীত থেকে এমন আনন্দ লাভ করবেন।"

আজ থেকে প্রায় ৮০ বছর আগে ইউরোপের এক সেরা সঙ্গীতশিল্পী এমন কথা বলেছিলেন আমাদের সঙ্গীত আর সঙ্গীতজ্ঞদের সম্বন্ধে!

প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্সের আশ্চর্য অভিজ্ঞতা

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। এই নামটি আমাদের এখনকার সঙ্গীতজগতে প্রায় অপরিচিত। আজকের সঙ্গীতসমাজে কেউ এ নাম উচ্চারণ করে না। কিন্তু আমাদের সঙ্গীতের ইতিহাসে নামটি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবার যোগ্য।

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় যে কত বড় গুণী ছিলেন, তার কিছু নিদর্শন এখানে দেওয়া হবে।

রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রসঙ্গে তাঁর সেতারে ডুয়েট বাজনার কথা বলা হয়েছে। সেতার ও সুরবাহার যন্ত্রে কালীপ্রসন্ন অসামান্য পারদর্শী ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি যে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন তা আগেই বলা হয়েছে। অবশ্য শৌরীন্দ্রমোহনের দরবারে আগত অন্যান্য যন্ত্রী ও গায়কদের কাছেও যে কালীপ্রসন্ন যন্ত্রসঙ্গীত বিষয়ে লাভবান হয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। কারণ, শৌরীন্দ্রমোহনের সঙ্গীতসভায় তিনি ছিলেন রাজার নিত্যকার সঙ্গী। তবে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীই ছিলেন কালীপ্রসন্নের প্রধান সঙ্গীতগুরু।

সেই দ্বৈত সেতারের আসরে এড্ওয়ার্ড রেমেনী কালীপ্রসন্নের বাজনার বিশেষ উচ্ছ্বসিত সুখ্যাতি করেছিলেন। আর বলেছিলেন একটি অপ্রিয় সত্য কথা—'বাবু, আপনার দেশের লোক আপনাকে চেনে না; এই সবচেয়ে বড় দুঃখের কথা।'

অথচ সেযুগে কালীপ্রসন্নের খ্যাতি ভারতের চতুঃসীমা পার হয়ে বহুদূরে আমেরিকা ও ইউরোপে পর্যন্ত পৌঁছেছিল। বলা যায়, একমাত্র শৌরীন্দ্রমোহন ভিন্ন ভারতের অন্য কোন সঙ্গীতগুণী সেকালে এমন আন্তর্জাতিক প্রসিদ্ধি পান নি, কালীপ্রসন্নের মতন।

সঙ্গীত-প্রতিভার জন্যে তিনি (আমেরিকার) ফিলাডেলফিয়া থেকে প্রথম বৈদেশিক সম্মান ও স্বীকৃতি পান। ফিলাডেলফিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে মানপত্র দেন ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। তার পর ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইটালী থেকে ও ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিস থেকে তিনি স্বর্ণপদক ও প্রশংসাপত্র পেয়েছিলেন। উনিশ শতকে শৌরীন্দ্রমোহন ছাড়া ভারতবর্ষের

অন্য কোন সঙ্গীতজ্ঞ বিদেশ থেকে এমন সম্মান লাভ করেন নি।

যেমন বিদেশ থেকে, তেমনি কলকাতায় আগত বিদেশী সঙ্গীতজ্ঞ, বিদেশী শিক্ষাবিদ্, বিদেশী রাজপুরুষ, শাসনকর্তা প্রভৃতির কাছেও কালীপ্রসন্ন বিস্তর সমাদর পান। সে তুলনায় উপযুক্ত সম্মান স্বদেশবাসীরা বোধ হয় তাঁকে দেয় নি। (অবশ্য বেঙ্গল এ্যাকাডেমী অব মিউজিক থেকে ১৮৮৫ খ্রীঃ তাঁকে 'সঙ্গীত উপাধ্যায়' উপাধি ও একটি স্বর্ণকেয়ূর উপহার দেওয়া হয়। কিন্তু তা বিদেশ থেকে সমস্ত সম্মান পাবার পর এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ গুণগ্রাহী শৌরীন্দ্রমোহনের উদ্‌যোগের ফলে।) তাই বোধ হয় অধ্যাপক রেমিনী তাঁর বিষয়ে ওই রকম মন্তব্য করেছিলেন।

ভারতের তিনজন বড়লাট লর্ড লিটন, লর্ড রিপন ও লর্ড নর্থব্রুক, ভারতের শিক্ষা কমিশনের সভাপতি স্যার উইলিয়ম হাণ্টার প্রভৃতি ছিলেন কালীপ্রসন্নের গুণগ্রাহী। লর্ড লিটন ও লর্ড রিপন কয়েকবার তাঁকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যান বেলভেডিয়ার প্রাসাদে, তাঁর বাজনা শোনবার জন্যে। লর্ড রিপন নিজের একটি ছবি তাঁকে স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে উপহার দিয়েছিলেন।

রাণী ভিক্টোরিয়ার পুত্র সপ্তম এডওয়ার্ড কালীপ্রসন্নের কি করে গুণগ্রাহী হন সেকথা খানিক পরে বলা হবে।

সেকালের বিখ্যাত লা মার্টিনীয়ার কলেজের অধ্যক্ষ জে. এ. অলডিস কালীপ্রসন্নের শুধু গুণমুগ্ধই ছিলেন না, তাঁর শিষ্য হয়ে ছ'মাস নিয়মিত তাঁর কাছে সেতার শিখেছিলেন। অলডিস্ সাহেব নিজে সেকথা লিখে গেছেন।

কালীপ্রসন্ন সেতার, সুরবাহার ও ন্যাসতরঙ্গ—এই তিন যন্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তাঁর সেতার বাজনার বিষয়ে 'ভায়োলিনের রাজা' অধ্যাপক রেমিনীর সুখ্যাতি শৌরীন্দ্রমোহনের কথায় আগেই জানানো হয়েছে। নবাব ওয়াজেদ আলী শা'র দরবারে তাঁর সুরবাহার বাজাবার কথা শেষে বলা হবে।

এখানে তাঁর ন্যাসতরঙ্গ বাজনার কথা।

সেই আসরের বর্ণনা করবার আগে ন্যাসতরঙ্গ যন্ত্রটির পরিচয় দেওয়া দরকার। কারণ, কালীপ্রসন্নের নামের মতন ন্যাসতরঙ্গ যন্ত্রও অনেকের কাছে অচেনা। এ যন্ত্রের বাদকও এদেশে দুর্লভ। আগে কালীপ্রসন্ন ভিন্ন দু-একজন মাত্র ন্যাসতরঙ্গ-বাদক ছিলেন। তাঁর পরবর্তী যুগে ছিলেন গোপাল সিংহ রায় ও আফ্‌তাব্-উদ্দিন। এখন ন্যাসতরঙ্গ-বাদকরূপে আর কারও নামই শোনা যায় না। সেকালে শুধু নীলমাধব চক্রবর্তীর ন্যাসতরঙ্গ বাজাবার কথা জানা যায়।

তিনি ছিলেন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গীতসভার একজন সেতার ও সুরবাহার বাদক। ন্যাসতরঙ্গ বাদনে তাঁর কালীপ্রসন্নের তুল্য খ্যাতি অবশ্যই ছিল না। তাঁদের পরবর্তী যুগে, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের এক সভাসদ গোপাল সিংহ রায় এবং বিখ্যাত আফ্‌তাবুদ্দিন খাঁ (আলাউদ্দিনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) ন্যাসতরঙ্গ বাজিয়েছিলেন। তবে এ পর্যন্ত যতদূর জানা যায়, কালীপ্রসন্ন ছিলেন এই যন্ত্রের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী।

ন্যাসতরঙ্গ বাদক এত অল্প হওয়ার কারণ—এ যন্ত্র বাজানো শুধু কঠিন নয়, অতি কষ্টসাধ্য। দুটি বাঁশীর মতন যন্ত্র নিয়ে ন্যাসতরঙ্গ বাজাতে হয়। বাঁশীর মতন দেখতে হলেও, বাঁশীর ছিদ্র এর মধ্যে নেই। যন্ত্র দুটি ধাতুর তৈরী, লম্বায় প্রায় এক ফুট এবং দুটি মুখ ছাড়া আগাগোড়া নিশ্ছিদ্র। দেখতে বাঁশী বা শানাইয়ের মতন হলেও এ যন্ত্র ফুঁ দিয়ে বাজাবার নয়। যন্ত্রের যে মুখটি বেশী সরু সেটি গলার দুপাশে, কণ্ঠতন্ত্রীর ধারে, চেপে রেখে বাদক বাজান। ফুঁ দিয়ে বাঁশী বা শানাইয়ের মতন বাজে না। সেই সরু মুখের নলের মধ্যে একটি ঝিল্লিময় সূক্ষ্ম অংশ থাকে। বাদক তাঁর গলার তন্ত্রীতে শ্বাস-প্রশ্বাসের আশ্চর্য কৌশলে চাপ দেওয়ার ফলে ওই ঝিল্লিময় অংশে বায়ুতরঙ্গ আন্দোলিত হয় ও সুর-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। বাঁশীটির মধ্যেকার ঝিল্লিময় অংশটিই যন্ত্র হিসেবে আসল। কারণ, বাঁশীর মতন স্বরগ্রামের ছিদ্রগুলি না থাকায়, এখানে স্বরপরিবর্তন এই ঝিল্লি-যন্ত্রটির মধ্যেই হয়ে থাকে। অর্থাৎ সুরের যা কিছু কাজ, সবই ওইখানে!

ফুৎকারের কোন প্রয়োজনই এই বাজনায় নেই। বাদক পাইপ দুটিকে গলার দুপাশে রেখে, কণ্ঠের তন্ত্রীতে নিঃশ্বাসের চাপ দেন। তার ফলে পাইপের মধ্যেকার ঝিল্লি দিয়ে সুর-লহরী সৃষ্টি হয়। চাপের তারতম্যের ফলে স্বরপরিবর্তন বা সুরের ওঠানামা হতে থাকে। এই হল, ন্যাসতরঙ্গ-বাদন। কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিতে যেমন দেখা যাচ্ছে, ঠিক তেমনিভাবে ন্যাসতরঙ্গ যন্ত্র বাজানো হয়।

শ্বাস-প্রশ্বাসের অতি কঠিন ও কষ্টকর প্রক্রিয়া ভিন্ন ন্যাসতরঙ্গ বাজান সম্ভব নয়। 'ন্যাস' কথাটির মধ্যেই প্রাণায়ামের সঙ্গে যোগ আছে, বোঝা যায়।

কালীপ্রসন্ন অত্যন্ত আয়াসে ন্যাসতরঙ্গ বাজাতেন। শ্রোতারা শুনে অপূর্ব আনন্দ লাভ করত। কিন্তু তিনি সেই কঠিন প্রাণায়ামের ফলে প্রতিবারই অসুস্থ হয়ে পড়তেন কিছুদিনের জন্যে। এত কষ্টকর বলেই আসরে তিনি সারা জীবনে কুড়ি-বাইশ বারের বেশী এ যন্ত্র বাজান নি। তবুও তিনি ন্যাসতরঙ্গ

বাজাবার জন্যেই দুরারোগ্য শ্বাসরোগে আক্রান্ত হন ও অতি কষ্টভোগের পর তাঁর মৃত্যু ঘটে। সে-সবের বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেবার দরকার নেই।

ন্যাসতরঙ্গ বাদন যে নিছক একটি ভেলকি ছিল, সুরের সূক্ষ্ম কাজ তাতে দেখান যেত না, তা নয়। ন্যাসতরঙ্গের সাঙ্গীতিক মূল্যও যথেষ্ট ছিল, অন্ততঃ কালীপ্রসন্নের ক্ষেত্রে। তাঁর বাজনায় সুরের অসামান্য কারুকর্ম শুনে একটি বিবৃতি প্রচার করেছিলেন অধ্যক্ষ অলডিস, কিন্তু তা বাহুল্য বোধে এখানে উদ্ধৃত করা হল না।

কালীপ্রসন্ন ন্যাসতরঙ্গে তাঁর ইচ্ছা মতন রাগ বাজাতে পারতেন ও সুরের কাজ করতেন। সেজন্যেই তিনি এ যন্ত্রে অদ্বিতীয় ছিলেন।

ন্যাসতরঙ্গে তিনি একদিন National Anthem (জাতীয় সঙ্গীত) বাজিয়েছিলেন, জানা যায়! (বলার বোধ হয় দরকার নেই যে, সে-যুগের বাঙ্গালীর 'জাতীয় সঙ্গীত' ছিল—God save the King Emperor!)

কালীপ্রসন্নের ন্যাসতরঙ্গ বাদনের আর একদিনের কথা যে এখানে বলা হবে, সে এক বিরাট অনুষ্ঠান।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের একেবারে শেষ দিকে (২৮, ডিসেম্বর) সেই আসর বসেছিল।

রাণী ভিক্টোরিয়ার পুত্র প্রিন্স অব ওয়েল্স্ (পরে সপ্তম এডওয়ার্ড) সে বছর ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তাঁর সংবর্ধনার জন্যে রাজধানী কলকাতায় মহা আড়ম্বরে একটি সভা হয় ওই তারিখে পাকপাড়ার সিংহ পরিবারের বিখ্যাত বেলগাছিয়া ভিলায়।

সেদিনের আসরে কালীপ্রসন্ন ন্যাসতরঙ্গ বাজান। সেখানে অন্যান্য অনুষ্ঠানও হয়েছিল। কিন্তু তার প্রধান আকর্ষণ হল তাঁর ন্যাসতরঙ্গ। তাই তার আগের দিন 'দি ইংলিশম্যান' বিশেষ করে তাঁর নামই প্রথমে ঘোষণা করে—'বাবু কালীপ্রসন্ন ব্যানার্জী ন্যাসতরঙ্গ যন্ত্র বাজাবেন। যুবরাজ বাগানে দুঘণ্টা মাত্র থাকবেন। অনুষ্ঠানটি হবে আগাগোড়া প্রাচ্য রীতিতে।'

'ইংলিশম্যান' কাগজে সেদিনকার অন্য কোন শিল্পীর নাম উল্লেখ না করে শুধু কালীপ্রসন্নের কথা যে জানান হয়, তা লক্ষ্য করবার মতন।

বেলগাছিয়া বাগান-বাড়ির এই সংবর্ধনা সভা এক বৃহৎ ব্যাপার। উদ্‌যোক্তাদের মধ্যে আছেন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা দিগম্বর মিত্র প্রভৃতি। আর উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন—জয়পুর, যোধপুর, বিকানীর,

গোয়ালিয়র, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর, বারাণসী, রেওয়া, কাশ্মীর, পাতিয়ালা ইত্যাদি তাবৎ দেশীয় রাজ্যের নৃপতি। আর আসরের প্রথম সারিতে—প্রিন্স অব ওয়েল্‌স, ভাইসরয় লর্ড নর্থব্রুক, লর্ড বিশপ প্রভৃতি।

যথাসময়ে কালীপ্রসন্ন তাঁর ন্যাসতরঙ্গ বাদন আরম্ভ করলেন। গলার দুদিকে 'বাঁশী' দুটিকে চেপে ধরে বাজাতে লাগলেন তিনি।

এ এক অদ্ভুত 'বাঁশী' বাজাবার দৃশ্য। যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে সমস্ত শ্রোতারা এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখতে লাগলেন!

বাদকের মুখ বন্ধ রয়েছে। অথচ অপরূপ সুরে 'বাঁশী' বেজে চলেছে স্বরলহরী তরঙ্গিত করে।

প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্ থেকে আরম্ভ করে অনেকেই প্রথমে ধারণা করতে পারলেন না, সুর উৎসারিত হচ্ছে কি কৌশলে এবং কোথা থেকে!

প্রথমে শ্রোতারা ভাবলেন—আওয়াজ বেরুচ্ছে বাদকের মুখ থেকে। কিংবা হয়তো এটা কোন বাজনাই নয়—আসলে ventriloquism।

কিন্তু চোখের সামনেই দেখা যাচ্ছে—বাদকের মুখ বন্ধ!

কণ্ঠতন্ত্রীতে কি গভীর শ্বাসক্রিয়ার ফলে কালীপ্রসন্ন যে সেই পাইপ থেকে বাঁশীর পরিচ্ছন্ন সুর সৃষ্টি করে আসর ভরিয়ে তুলেছেন—প্রিন্স এবং ভাইসরয় প্রমুখ অনেক শ্রোতা তা ধরতে পারলেন না।

এ এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। এরকম অদ্ভুত বাজনা তাঁরা আগে কখনও শোনেন নি!

সভায় অভূতপূর্ব বিস্ময় ও আনন্দের সঞ্চার হল। শ্রোতারা সকলেই যেন মন্ত্রমুগ্ধ!

প্রিন্স এক অপূর্ব উদ্দীপনা অনুভব করলেন কালীপ্রসন্নের ন্যাসতরঙ্গ শুনে।

বাজনা শেষ হতে, তাঁকে এবং ভাইসরয় নর্থব্রুক্‌কে সেই ধাতুর পাইপ দুটি দেখান হল।

তখন তাঁরা পরীক্ষা করে বুঝতে পারলেন—সেই ঝিল্লির মধ্যে হাওয়ার চাপ পড়ে যা কিছু সুরের কাজ হয়েছে!

সেদিনকার আসরে কালীপ্রসন্নের ন্যাসতরঙ্গের স্মৃতি সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে আঁকা রইল শ্রোতাদের মনের পটে! বিশেষ প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের।

হীরার মালা ও ফুলের মালা

লক্ষ্ণৌর শেষ নবাব ওয়াজিদ্ আলী শাহ্। রাজ্যহারা এবং নির্বাসিত হয়ে তিনি তখন মেটিয়াবুরুজে বাস করছেন। কলকাতার দক্ষিণ উপকণ্ঠে খিদিরপুর, সেখান থেকে আরও দক্ষিণে মেটিয়াবুরুজ।

সেখানে গঙ্গার ধারে অনেকখানি জায়গা জুড়ে নবাবের বসতি আরম্ভ হয়। লক্ষ্ণৌর নবাব হলেন মেটিয়াবুরুজের নবাব। কোথায় প্রায়-স্বাধীন লক্ষ্ণৌ রাজ্যে নবাবী আর কোথায় এই মেটিয়াবুরুজে ব্রিটিশের বৃত্তিজীবী হয়ে নির্বাসন। তবু নবাবী আছে! আসল গেলেও, নকল হলেও।

তাই মেয়াবুরুজেও লক্ষ্ণৌর অনুকরণে গড়ে ওঠে নবাবের কয়েকটা বাড়ি আর বাগিচা। কিন্তু লক্ষ্ণৌর রোশনি এসবে নেই। আর দরবার—সঙ্গীতের দরবার। কিন্তু এখানেও সে জুলুস নেই। তবে ওয়াজিদ্ আলীর নবাবীর যা বাকি আছে তা সবই এই দরবারে।

এমন সঙ্গীতের দরবার তখন হিন্দুস্থানে আর কোথাও নেই। কোন রাজসভায় নয়, অন্য কোন নবাবের দরবারেও নয়। দিল্লীর তো তখন বাদশাও নেই, দরবারও গেছে। বাদশা মহম্মদ শাহের দরবারে যেটুকু চেক্‌নাই ছিল, বাহাদুর শার সঙ্গে তাও শেষ।

নবাব ওয়াজিদ আলীর দরবার তাঁর এক স্মরণীয় কীর্তি। এই দরবারের জন্যেই তখন মেটিয়াবুরুজের নাম হিন্দুস্থানের সব ওস্তাদদের মুখে মুখে ফেরে। এখানকার দরবারের কথা জানে না সঙ্গীত-জগতে এমন কে আছে? একসঙ্গে এক জায়গায় এত কলাবত আর তখন কোথায়? এত গাওয়াইয়া, সাজিন্দে, বাঈজী, নর্তক ও নর্তকীর দল, তবলিয়া আর শানাইওয়ালা।

নবাবের দরবারে প্রায় দেড়শ জন গাইয়ে-বাজিয়ে। তা ছাড়া, বাঈজী আর নাটক করবার জন্যে মেয়ে-পুরুষ মিলিয়ে আরও প্রায় দু'শ জন। এঁরা সকলেই বাঁধা বেতনে নিযুক্ত। বছরে বারো লাখ টাকা পেনশনের জন্যে তাই নবাবের দরবার টিঁকে আছে। এই টাকায় মাঝে মাঝে টানাটানি পড়ে, সব দিক্ বজায় রাখা কষ্টকর হয় নবাবের পক্ষে। বছরে বারো লাখ টাকায় তাঁর বিরাট্ হারেম ও নিজের অন্য সব খরচ চালিয়ে ওই দরবারকে বাঁচিয়ে রাখা কঠিন হত—যদি না উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করতেন হীরে-জহরৎ সোনা-দানার বহুমূল্য সঞ্চয়।

নবাবের মেটিয়াবুরুজের দরবার বসে গঙ্গার ধারে একটি দোতলা বাড়িতে। শোনা যায়, এই সঙ্গীতের দরবার নবাবের জীবিতকালে কোনদিন কোনক্ষণ স্বর-শূন্য হত না। সঙ্গীতৈকপ্রাণ নবাব এমন বন্দোবস্ত করেছিলেন যে দিবারাত্র গান বা বাজনা চলতে থাকবে এই সঙ্গীতের দরবারে। নবাব সেখানে উপস্থিত হন বা না হন, চব্বিশ ঘণ্টাই স্বর উপস্থিত থাকবে। কণ্ঠে কিংবা কোন যন্ত্রে সঙ্গীত চলবে অবিরাম। প্রহরে প্রহরে বাজবে শানাই। অন্য কোন যন্ত্রী যখন থাকবে না, গায়ক যখন উপস্থিত হবে না, তখন শানাই বাজবে। বাদকদের মধ্যে তাই নবাব শানাইওয়ালা রেখেছেন সবচেয়ে বেশী। মেটিয়াবুরুজ দরবারে তাই চল্লিশজন শানাইওয়ালা মোতায়েন।

ওয়াজিদ আলীর দরবারকে সেজন্যে সঙ্গীতের দরবার না বললেই ভুল হয়। অন্য কোন দরবারের সঙ্গেই তার তুলনা চলে না। এই দরবারে বসে নবাব শুধু নিজের নিযুক্ত কলাবতদের সঙ্গীত উপভোগ করতেন, তা নয়। কলকাতায় আগত অন্য গুণীদেরও সেখানে আমন্ত্রণ করে আনতেন। কখনও ফরমায়েশ করে শুনতেন নিজের প্রিয় কোন রাগ। শৌখীন কলাকুশলীদেরও সসম্মানে সেখানে নিমন্ত্রণ করতেন।

বাংলার অনেক গুণীও মেটিয়াবুরুজ দরবারে গান-বাজনা করেছেন।

এখন কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। তিনি নবাবের দরবারে একদিন নিমন্ত্রিত হয়ে আসেন বাজাবার জন্যে।

এবারে কিন্তু ন্যাসতরঙ্গ নয়। সুরবাহার।

কালীপ্রসন্নবাবু সেতার ও ন্যাসতরঙ্গের মতন সুরবাহারেও বড় গুণী। দরবারে তাঁকে ন্যাসতরঙ্গের বদলে সুরবাহার বাজাতে নবাব অনুরোধ করেন কি না জানা যায় নি। অনুরোধ করতেও পারেন। কারণ, সেতার সুরবাহার নবাবের প্রিয় বাজনা। তিনি নিজেও ছিলেন সেতারী।

ছেলেবেলা থেকে নবাবের সেতার বড় ভাল লাগে। সেতার বাজানো তাঁর তখন থেকেই আরম্ভ। তারপর বিখ্যাত ওস্তাদ কুতুবউদ্দৌলা খাঁর কাছে সেতারে দস্তুরমতন তালিম নেন। কুতুব এত বড় সেতার-বাজিয়ে ছিলেন যে, তাঁর নামই হয়ে যায় 'সেতার-বাজ' কুতুবউদ্দৌলা। কুতুবের ওস্তাদ ছিলেন বিখ্যাত ওমরাহ খাঁ, যাঁর পৌত্র হলেন বীণ্‌কার উজীর খাঁ (রামপুর)। ওমরাহের আর এক সাগীরদ্‌ হলেন গোলাম মহম্মদ, যিনি সুরবাহার যন্ত্র প্রথম বাজান।

সেতার সুরবাহারের কদর বুঝতেন নবাব ওয়াজিদ আলী। তাই তিনি কালীপ্রসন্নকে সুরবাহার বাজাতে অনুরোধ করতেও পারেন।

যাই হোক্‌, সেদিন মেটিয়াবুরুজের গঙ্গার ধারে সেই দরবারে কালীপ্রসন্ন এলেন, সুরবাহার বাজাতে।

সাজান আসর বসেছে। নবাবের দরবারী গায়ক-বাদকরা অনেকেই উপস্থিত। সামনে আছেন নবাব।

কালীপ্রসন্ন সুরবাহারে আলাপচারী আরম্ভ করলেন।

নিপুণ চিত্রকর যেমন তুলি দিয়ে রঙে-রেখায় সাদা পটের ওপর রূপময় ছবি ফুটিয়ে তোলে, তেমনি করে কালীপ্রসন্ন রাগরূপ রচনা করতে লাগলেন সুরবাহারে। তারে তারে ঝঙ্কার দিয়ে, আঙ্গুলের মায়া পরশে তিনি সুরের ইন্দ্রলোক সৃজন করলেন।

ধীর মন্থর গতিতে রাগের প্রথম পদক্ষেপ ঘটালেন তিনি। অদৃশ্য লোক থেকে তারের মৃদু ঝঙ্কারে সুরকে তিনি আসরে আহ্বান করে নিয়ে এলেন! অলক্ষ্য চরণে তার প্রথম আবির্ভাব। ক্রমে বাদকের সুদক্ষ আঙ্গুলের ছোঁয়ায় তার রূপ-মাধুরী ভাস্বর হয়ে উঠল। মীড়, গমক, আশ, মূর্ছনার বিচিত্র অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে রাগ মূর্তি ধারণ করলে শ্রোতাদের মনের পটে।

কালীপ্রসন্নের সুরবাহার সুমিষ্ট সুরে যেন কথা বলতে লাগল।

নবাব তন্ময় হয়ে শুনছেন। সময় কোথা দিয়ে চলে যাচ্ছে, কারও খেয়াল নেই। সুরবাহারের সুরের যাদুতে সমস্ত আসর তখন আচ্ছন্ন।

নবাবের বুঝতে বাকি নেই, কত বড় গুণীর আগমন আজ দরবারে ঘটেছে। এমন সুরের কাজ তিনিও কম দেখেছেন। একাগ্র চিত্তে তিনি শুনতে লাগলেন এই বাঙ্গালী গুণীর সুরবাহারে সুরবিহার।

তারপর এক সময়ে কালীপ্রসন্ন তাঁর বাজনা থামালেন।

কতক্ষণ বাজিয়েছিলেন তিনি? দেখা গেল, নবাবের ভোজনের সময় উত্তীর্ণ হয়ে আরও দু ঘণ্টা পার হয়ে গেছে! কেউ তাঁকে ডাকতে সাহস করে নি—এমন নিবিষ্ট হয়ে বাজনা শুনেছেন তিনি! তাঁর নিজেরও একেবারে খেয়াল নেই।

এখন বাজনা থামতে নবাব বার বার কালীপ্রসন্নকে সাবাস দিলেন। আর আপনার কণ্ঠ থেকে সুগন্ধি পুষ্পমালা নিয়ে পরিয়ে দিলেন সেই মহান্‌ সুরশিল্পীর গলায়।

তার পর অশ্রুভরা আবেগের সঙ্গে বললেন—যে আনন্দ, যে তৃপ্তি আজ আপনার বাজনা শুনে আমি পেয়েছি, তার উপযুক্ত সম্মান দেখাতে আমি অক্ষম। কারণ আমি স্বাধীন নই। তা না হলে, ফুলের মালার বদলে আজ

হীরের মালা দিয়ে আমি গুণীর মান রক্ষা করতেম।

তার উত্তরে কালীপ্রসন্ন কি বলেছিলেন, তা জানা যায় নি। কিন্তু নবাবের এই অন্তরের উচ্ছ্বাস সেদিন হয়তো ওই ফুলের মালাকেই হীরের মালার মর্যাদা দিয়েছিল।

বিদ্যা আদায়

কবি শ্রীমধুসূদন তাঁর সঙ্গে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের পরিচয় করিয়ে দিলেন এই বলে—ইনি আমাদের লাইনের লোক।

মাইকেল তখন বিলাত-প্রত্যাগত ব্যারিস্টার, আইন-ব্যবসায় আরম্ভ করেছেন। দীনবন্ধু তাই নব-পরিচিতের সম্পর্কে মাইকেলকে জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কি **Lawyer**?

মধুসূদন বললেন, না হে, না। ইনি নাট্যশাস্ত্রবিদ্। আমাদেরই লাইন তো!

'ইনি' এবং 'নাট্যশাস্ত্রবিদ্' বলে তিনি যাঁর পরিচয় করালেন দীনবন্ধুর সঙ্গে, তিনি কিন্তু কোন নাট্য-প্রবীণ ব্যক্তি নন। এমন গুণীর মর্যাদা যাঁকে মাইকেল দিলেন, তিনি বয়সে অতি তরুণ এবং মাত্র একটি ভূমিকা অভিনয় করে কুশলী, শৌখীন অভিনেতা রূপে পরিচিত হয়েছেন। নাম—কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্তীকালের সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য। কিন্তু তখন তাঁর খ্যাতির কারণ—মাইকেল মধুসূদনের প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা'র 'নায়িকা'র ভূমিকায় অভিনয়।

সুকান্ত, সুকণ্ঠ, প্রতিভা-দীপ্ত কৃষ্ণধন। পাদ-প্রদীপের সামনে প্রথম শর্মিষ্ঠা-রূপে দর্শকবৃন্দকে চমৎকৃত করেছিলেন। আর সে দর্শকদের মধ্যে ছিলেন কারা? ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মাইকেল মধুসূদন, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, গৌরদাস বসাক, প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি তৎকালীন কলকাতার মান্যগণ্য শিক্ষিত ও অভিজাত ব্যক্তিবর্গ। আর সে অভিনয় হয়েছিল কোথায়? সেকালের শ্রেষ্ঠ শৌখীন রঙ্গমঞ্চ বেলগাছিয়া থিয়েটারে। অভিনয়ে, গীতবাদ্যে, দৃশ্যপটে, সাজ-সজ্জায়, প্রয়োগ-নৈপুণ্যে যা বাংলার মঞ্চশিল্পে যুগান্তর এনেছিল। যার অধিকাংশ অভিনেতা ছিলেন ইংরেজী-শিক্ষিত এবং যাঁদের মধ্যমণি ছিলেন প্রতিভাধর কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। তা ছাড়া, আধুনিক ভারতের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আরও কত দিকে এই থিয়েটার স্মরণীয় অবদান রেখে যায়। এখানেই প্রথম ভারতীয় ঐকতান গঠন করে

শুনিয়েছিলেন আচার্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী। সেই বাদকদের জন্যে এখানে প্রথম স্বরলিপিও রচনা করেছিলেন তিনি। (যা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল দশ বছর পরে, ১৮৬৮ খ্রীঃ 'ঐকতানিক স্বরলিপি' নামে)। এই থিয়েটারই নাট্যকার করেছিল কবি শ্রীমধুসূদনকে। এখানকার প্রথম নাটক (১৮৫৮ খ্রীঃ) 'রত্নাবলী'র তিনি ইংরেজী অনুবাদ করে দেন থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের অনুরোধে, উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজকর্মচারীদের অভিনয় অনুসরণ করবার সুবিধার জন্যে। এই নাটকের অনুবাদ-কর্মের ফলেই মাইকেলের নাটক রচনার ভাব ও ইচ্ছা মনে জাগে। তার পর রচনা করেন এখানে অভিনয়ের জন্যেই 'শর্মিষ্ঠা' নাটক (১৮৫৯ খ্রীঃ)।

সেই 'শর্মিষ্ঠা'-র নাম-ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়। হিন্দু কলেজের মেধাবী ছাত্র, ১৩।১৪ বছর বয়সী, সুকুমার-কান্তি, সুললিত কণ্ঠের অধিকারী। অভিনয় তাঁর কেমন হল সেকথা স্বয়ং নাট্যকার তাঁর সুহৃদ রাজনারায়ণ বসুকে চিঠি লিখে জানালেন—**When Sharmistha was acted at Belgatchia the impression it created was simply indescribable. Even the least romantic spectator was charmed by the character Sharmistha and shed tears with her. As for my own feelings, they were "things to dream of, not to tell"···**

অথচ সেই কিশোর কৃষ্ণধনের প্রথম অভিনয়। তার আগে কোন থিয়েটারের সঙ্গে তাঁর কোন সংস্রব ছিল না। দেশে থিয়েটারই বা তখন ক'টি! কৃষ্ণধনের থিয়েটারের শখের কথা তার আগেও কখনও জানা যায় নি। ঘটনাচক্রে তিনি হয়ে ওঠেন এই নাটকের অভিনেতা।

শখ ছিল তাঁর কুস্তি লড়বার। তাঁর হোগলকুড়িয়ার (উত্তর কলকাতার ভীম ঘোষ লেন) বাড়ির কাছে তখন মসজিদবাড়ি স্ট্রীটের বিখ্যাত গুহ পরিবারের কুস্তির আখড়া। গুহ বংশের শৌখীন পালোয়ান অম্বিকাচরণ (অম্বুবাবু) সেই আখড়ার পত্তন করেছিলেন তার কয়েক বছর আগে। সেখানে নিয়মিত কুস্তি লড়তে গিয়ে কৃষ্ণধনের সঙ্গে গুহ পরিবারের তারাচরণবাবুর পরিচয় ঘটে। তারাচরণ গুহ যেমন কুস্তিগীর, তেমনি ছিলেন সঙ্গীতপ্রেমী, অভিনয়-কুশলী এবং মজলিসী ব্যক্তি। ওই বেলগাছিয়া থিয়েটারের তিনিও একজন অভিনেতা এবং প্রতাপচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের বন্ধু। তিনি কুস্তির আখড়ায় বেলগাছিয়া থিয়েটারের মহলা, অভিনয়, যন্ত্রসঙ্গীত এই সব বিষয়ের নানা গল্প বলতেন কৃষ্ণধনের কাছে। তাঁর মুখে সে-সব কথা শুনতে শুনতে

সেখানকার থিয়েটার দেখবার কৃষ্ণধনের প্রবল ইচ্ছা জাগে।

কিন্তু বেলগাছিয়া থিয়েটারের প্রবেশপত্র পাওয়া অতি কঠিন। বিশেষ খ্যাতিমান্ কিংবা অভিজাত ব্যক্তি ভিন্ন কারুর পক্ষে সে থিয়েটারে প্রবেশ করা সম্ভব হত না। তাই দর্শকরূপে সেখানে উপস্থিত হতে অনেকবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন কৃষ্ণধন। কারণ তিনি ছিলেন দরিদ্রের সন্তান।

শেষ পর্যন্ত তিনি স্থির করেন, সেখানকার নাট্য দলে যোগ দেবেন, তা হলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। কিন্তু সে সংকল্প কাজে পরিণত করাও প্রায় অসম্ভব। তবে তিনি হাল ছাড়লেন না এবং তারাচরণ বাবুর মধ্যস্থতায় তাঁর চেষ্টাও বন্ধ রইল না।

কিছুদিন পরে একটি সুযোগ এল। তখন দ্বিতীয় নাটক শর্মিষ্ঠা মঞ্চস্থ করবার ব্যবস্থা হচ্ছে বেলগাছিয়া থিয়েটারে। নাটকের নাম-ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্যে একজন অল্পবয়সী অভিনেতার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। (বলা বাহুল্য, তখনকার সমস্ত শৌখীন রঙ্গালয়েই স্ত্রীভূমিকা অভিনয় করতেন অভিনেতারা। পেশাদার অভিনেত্রীরা প্রথম স্ত্রীভূমিকায় অবতীর্ণ হন বেঙ্গল থিয়েটারে, মাইকেল মধুসূদনেরই পরামর্শে—সে থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী ছিলেন শরৎচন্দ্র ঘোষ, ধনকুবের রামদুলাল সরকারের দৌহিত্র)।

এবার কৃষ্ণধন বেলগাছিয়া থিয়েটারে প্রবেশ করতে সক্ষম হলেন নিজের প্রতিভায়, অভিনেতারূপে।

কিন্তু এহ বাহ্য। তাঁর অভিনেতার জীবন বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের অকালমৃত্যুতে (১৮৬১ খ্রীঃ) বেলগাছিয়া থিয়েটারেরও আয়ু ফুরিয়ে যায়। তার ক'বছর পরে কৃষ্ণধন আর একবার পাদ-প্রদীপের সামনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়ির থিয়েটারে। তখন তাঁর বয়স ১৯।২০ বছর। সেই শেষ অভিনয়। কারণ তাঁর প্রকৃত পরিচয় হল তাঁর সঙ্গীত-জীবন, যার সূত্রপাতও হয়েছিল ওই বেলগাছিয়া থিয়েটারে। ওখানেই তিনি ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর সঙ্গে পরিচিত হন ও তাঁর কাছে প্রথম সঙ্গীত-শিক্ষা আরম্ভ করেন। গোস্বামী মহাশয়ের শিক্ষা কয়েক বছর পাবার পর তিনি অন্যান্য কলাবতের কাছেও শিখিয়েছিলেন—যেমন পাথুরিয়াঘাটার ধ্রুপদী-বীণ্‌কার হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোয়ালিয়রের সেতারী আহম্মদ খাঁ প্রভৃতি। কণ্ঠসঙ্গীতের সঙ্গে সেতার, পিয়ানো ইত্যাদি যন্ত্রসঙ্গীতেরও তিনি চর্চা করেছিলেন। পিয়ানো শিক্ষা করেন জনৈক ইউরোপীয় শিক্ষকের কাছে। ইউরোপীয় সঙ্গীততত্ত্বে তাঁর অভিজ্ঞতার পরিচয় তাঁর নানা গ্রন্থাবলী এবং

রেখামাত্রার স্বরলিপি রচনায় বিধৃত আছে। তা ছাড়া, তাঁর সুনাম ছিল ভাল পিয়ানো-বাদক বলে।

ক্ষুরধার-বুদ্ধি কৃষ্ণধন তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন সঙ্গীতক্ষেত্রে। মাত্র ২১ বছর বয়সে নিজের লেখা স্বরলিপির বই 'বঙ্গৈকতান' (১৮৬৭ খ্রীঃ) প্রকাশ করেন। শুধু বাংলায় নয়, ভারতবর্ষের মধ্যে এইটিই প্রথম প্রকাশিত স্বরলিপি পুস্তক। (ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ১৮৫৮ খ্রীঃ বেলগাছিয়া থিয়েটারে ঐকতান বাদনের বাদকদের জন্যে যে-সব স্বরলিপি রচনা করেছিলেন, তা তখন পুস্তকাকারে প্রকাশ হয় নি, হয়েছিল কৃষ্ণধনের 'বঙ্গৈকতান' প্রকাশের এক বছর পরে)।

শুধু প্রথম স্বরলিপি পুস্তক নয়, ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে কৃষ্ণধন-রচিত এই স্বরলিপির পদ্ধতিও অভিনব। ইউরোপীয় সঙ্গীতের রেখামাত্রার স্বরলিপি প্রণালী কৃষ্ণধন ভারতীয় সঙ্গীতে প্রথম প্রয়োগ করেছিলেন। রাগসঙ্গীতে প্রথম **harmony** রচনার কৃতিত্বও তাঁর।

কৃষ্ণধনের রেখামাত্রার স্বরলিপি প্রচলনের চেষ্টা এদেশে সফল হয় নি। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী যে অক্ষরমাত্রার স্বরলিপি প্রবর্তন করেন এবং শৌরীন্দ্র-মোহন ঠাকুর যার ব্যাপক প্রচার করেন সেই লিপি চলিত হয়। কিন্তু কৃষ্ণধনের পক্ষে তাতে অগৌরবের কথা কিছু নেই। তাঁর নতুন প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় তাঁর সঙ্গীত-প্রতিভা, তাঁর স্বাধীন সঙ্গীত-চিন্তা।

দারিদ্র্য এবং বিরুদ্ধ পরিবেশের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করে কৃষ্ণধনকে সঙ্গীত-শিক্ষায় অগ্রসর হতে হয়েছিল। প্রতিভাধর তিনি, সেই অবস্থার মধ্যে প্রবেশিকা পরীক্ষায় স্কলারশিপ লাভ করে কলেজের শিক্ষা পান ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। তার পর সেকালের বাঙ্গালীর সেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পরম আকাঙ্ক্ষিত পদ সঙ্গীতচর্চায় আত্মনিয়োগ করবার জন্যে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করেন—তাঁর সে-সব বিস্তৃত জীবনকথা এখানে বলবার অবকাশ নেই। সঙ্গীততত্ত্ব বিষয়ে রচিত তাঁর বহুমূল্য গ্রন্থ 'গীতসূত্রসার'-এর নাম উল্লেখ করে তাঁর প্রথম জীবনের কথায় ফিরে আসা যাক। কারণ আলোচ্য ঘটনাটি তাঁর সঙ্গীতশিক্ষার প্রথম যুগের কথা।

সঙ্গীতশিক্ষার প্রথম থেকেই কৃষ্ণধনের শিক্ষা করবার অদম্য আগ্রহ দেখা যায়। যেমন তাঁর অধ্যবসায়, তেমনি অপরিসীম গ্রহণ করবার ক্ষমতা। তীক্ষ্ণবুদ্ধি কৃষ্ণধন সহজাত সঙ্গীত-প্রতিভায় অতি ত্বরিত শিক্ষণীয় বিষয় আয়ত্ত করে নিতেন। নচেৎ সঙ্গীতশিক্ষা একেবারেই সম্ভব হত না তাঁর পক্ষে। কারণ

গুরুর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রাণ-ঢালা শিক্ষা তিনি পান নি। তাঁর প্রথম সঙ্গীতগুরু ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর সঙ্গে পরে স্বরলিপি-প্রণালী ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কৃষ্ণ-ধনের যে গুরুতর মতবিরোধ ও মনান্তর ঘটেছিল, হয়তো তার সূত্রপাত হয় তার অনেক পূর্বে, তাঁর কাছে সঙ্গীত-শিক্ষার সময় থেকেই। যে কোন কারণেই হোক, কৃষ্ণধন গুরুর তেমন প্রিয়পাত্র ছিলেন না। গোস্বামী মহাশয়ের অতি প্রিয় শিষ্য ছিলেন শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। শৌরীন্দ্রমোহনের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্বের সঙ্গে কুরুকুলের অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের অর্জুনের প্রতি মনোভাবের হয়তো উপমা দেওয়া যায়। সে যা হোক, শৌরীন্দ্রমোহনকে ক্ষেত্রমোহন নিজের অর্জিত বিদ্যা অকাতরে দান করতেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে শৌরীন্দ্রমোহনের তুল্য আর কেউ না হতে পারেন, এ ইচ্ছাও সম্ভবত ছিল গোস্বামী মহাশয়ের মনে।

সে জন্যে গুরু হয়তো কৃষ্ণধনকে শৌরীন্দ্রমোহনের সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে প্রথম জনের ওপর ঈষৎ বিরূপতার ভাব পোষণ করতেন। তার ওপর, কৃষ্ণধনের শিখে নেবার, মনে রাখবার ও আত্মসাৎ করবার অসাধারণ ক্ষমতাও লক্ষ্য করে-ছিলেন তিনি। অন্য কেউ শিক্ষা করবার সময়, কিংবা কেউ গাইবার বা বাজাবার সময় কৃষ্ণধন তা মনের পটে মুদ্রিত করে নিতেন। তাই কোন কোন সময় ক্ষেত্রমোহন এড়াবার চেষ্টা করতেন তাঁকে। বিশেষ শৌরীন্দ্রমোহনকে শিক্ষা দেবার সময়ে। কৃষ্ণধন যেন সর্বদা বিদ্যা আদায় করে নিতে না পারেন!

সেই সময়কার একদিনের ঘটনা। যখন শৌরীন্দ্রমোহন ও কৃষ্ণধন দুজনেই উদীয়মান সঙ্গীতপ্রতিভা এবং তাঁদের যুগপৎ গুরুরূপে বিরাজমান ক্ষেত্রমোহন।

স্থান—৬৫, পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীট। শৌরীন্দ্রমোহনের পৈতৃক প্রাসাদ, সঙ্গীত-চর্চার এক স্মরণীয় পীঠস্থান। সেখানকার সঙ্গীতসভায় সমগ্র ভারতবর্ষের কত শ্রেষ্ঠ কলাবত তাঁদের গুণপনা দেখিয়ে ধন্য করে গেছেন। ভারতবর্ষের প্রথম সর্বভারতীয় সঙ্গীত-সম্মেলনও হয় সেই ঐতিহাসিক ভবনে। শৌরীন্দ্রমোহনের সমগ্র সঙ্গীতজীবনের সাক্ষী এবং ভারতীয় সঙ্গীতের পুনরুদ্ধারে তাঁর চিরস্মরণীয় অবদানের সমস্ত কার্যাবলীর ঘটনাস্থল। সঙ্গীত-সরস্বতীর যে তীর্থস্থান এখন বণিকের তুলাদণ্ড মস্তকে ধারণ করে কুশ্রী পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে—তার তখন সৌন্দর্যময় ও সমৃদ্ধ যুগ।

সেখানকার সদর মহলের দোতলার একটি কক্ষ। বাইরের কোন ওস্তাদের সে-সময় সেখানে আসর বসে নি। নিরিবিলি বিকালবেলা সঙ্গীতচর্চা করছিলেন শৌরীন্দ্রমোহন এবং গোস্বামী মহাশয়। প্রিয় শিষ্যকে তখন তিনি মূল্যবান কিছু শেখাচ্ছিলেন।

এমন সময় সেখানে হঠাৎ উপস্থিত হলেন কৃষ্ণধন। গুরুভাই শৌরীন্দ্রমোহনের কাছে এমন তিনি মাঝে মাঝে আসতেন, সঙ্গীতের আলাপ-আলোচনা কিংবা চর্চা করে যেতেন। কিন্তু তাঁর উপস্থিতিতে শৌরীন্দ্রমোহনকে শেখাতেন না ক্ষেত্রমোহন। কৃষ্ণধনও জেনেশুনে সে-সব সময় আসতেন না।

সেদিনও তিনি গুরুর শিক্ষাদানের কথা না জেনে উপস্থিত হয়ে পড়েন সেখানে। অবাঞ্ছিত অতিথি!

তাঁকে দেখবামাত্র ক্ষেত্রমোহন শৌরীন্দ্রমোহনকে বলে উঠলেন, সব বন্ধ কর। এখনই সব আদায় করে নেবে!

গোস্বামী মহাশয় কথাটি যেভাবেই বলুন, কৃষ্ণধনের সঙ্গীত-বিদ্যা অর্জনের শক্তির এমন প্রশংসা আর কি হতে পারে?

এক দিনের, না এক মাসের, না এক বছরের ভৈরবী ?

এই প্রশ্নটি করেছিলেন মহম্মদ খাঁ। গত শতকের বিখ্যাত সেতার-সুরবাহার গুণী মহম্মদ খাঁ। লক্ষ্ণৌ-এর গোলাম মহম্মদের ঘরের কৃতী শিষ্য তিনি, বাংলাদেশে অনেক বছর বাস করে এখানকার সঙ্গীতসমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। তাঁর নাম রাখবার মতন শিষ্যও ছিলেন বাঙ্গালী এবং তাঁর মৃত্যুও হয় এখানে, বিশ শতকের গোড়ার দিকে।

যে ঘরের তালিম মহম্মদ খাঁ পেয়েছিলেন, ভারতবর্ষে সেতার-সুরবাহারের সেটি এক বড় ঘরানা ছিল। বহু শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত এই সঙ্গীত-পরিবার লক্ষ্ণৌ অঞ্চলে প্রথম গঠিত হলেও শেষে বিস্তার লাভ করে বেশি বাংলাদেশে। পশ্চিমে তার একটি ধারা অবশ্য থেকে যায়। কিন্তু বাংলায় একাধিক ধারা বিস্তৃত হয় বিচিত্রভাবে এবং মহম্মদ খাঁর পরের কয়েক পর্যায় ধরে তার অস্তিত্ব থাকে বিভিন্ন বাঙ্গালী গুণীর সাধনায়। এমন কি আজও বাংলা দেশে তার কোন কোন ধারা লুপ্ত হয় নি।

এই সঙ্গীত পরিবারের (ভাষান্তরে ঘরানার) নানা সূত্র ধরে প্রথম প্রতিষ্ঠার যুগ অনুসন্ধান করতে গেলে উপস্থিত হতে হয় সওয়া শ' বছর আগে লক্ষ্ণৌ নগরে। পরিবারটির আদিতে তখন মহাগুণী বীণ্‌কার ওমরাও খাঁকে সেখানে দেখা যায়। সে হল লক্ষ্ণৌর শেষ নবাব ওয়াজিদ আলী শা'র পিতা আমজাদ্ আলী শা'র আমল। ওমরাও খাঁ ছিলেন আমজাদ আলী শা'র

দরবারের সম্মানিত বীণ্‌কার।

ওমরাও খাঁ তানসেনের কন্যা-বংশের বীণ্‌কারদের মধ্যে একজন প্রখ্যাত পুরুষ। তিনি সেই বংশীয় ছোট নৌবাৎ খাঁর পুত্র এবং স্বনামখ্যাত নির্মল শা'র ভ্রাতুষ্পত্র ও জামাতা। নির্মল শা'র পুত্র না থাকায় তাঁর সমগ্র সঙ্গীত-সম্পদ্‌ ভ্রাতুষ্পুত্র-জামাতা ওমরাও খাঁ লাভ করেছিলেন। ওমরাও খাঁর দুই সুযোগ্য পুত্র আমীর খাঁ (বাহাদুর সেনের সহযোগে রামপুর ঘরানার প্রতিষ্ঠাতা) ও রহিম খাঁও ছিলেন কৃতী বীণ্‌কার। পিতার কাছেই তাঁরা বীণার শিক্ষা পেয়েছিলেন।

ওমরাও খাঁ কিন্তু সুরবাহার-সেতারে তালিম দেন অন্য দুই শিষ্যকে। ওমরাও খাঁর এই সুরবাহার-সেতার শিক্ষাদান থেকেই আমাদের আলোচ্য পরিবারটির উৎপত্তি। সুরবাহার যন্ত্রে তাঁর প্রধান শিষ্য ছিলেন গোলাম মহম্মদ। সুরবাহারের অস্তিত্ব নাকি তার আগে ছিল না। সেতার-যন্ত্রের এই বৃহত্তর সংস্করণ তৈরি হয় ওমরাও খাঁর নির্দেশে, গোলাম মহম্মদের জন্যে। এই বৃহৎ আকারের সেতারের নামকরণ করা হয় সুরবাহার। এটি গৎ বাজাবার যন্ত্র নয়, শুধু আলাপচারির উপযুক্ত এবং ওমরাও খাঁ গোলাম মহম্মদকে সুরবাহারে আলাপ-পদ্ধতি শিক্ষা দেন।

গোলাম মহম্মদের আরও কথা জানাবার আগে ওমরাও খাঁর আর এক শিষ্যের কথা উল্লেখ করবার আছে। তাঁর নাম কুতুব-উদ্দৌলা। তানসেনের পুত্রবংশীয় গুণী প্যার খাঁ (ছজ্জু খাঁর পুত্র এবং জাফর খাঁর দ্বিতীয় ভ্রাতা) ছিলেন কুতুব্‌উদ্দৌলার প্রধান ওস্তাদ। কিন্তু ওমরাও খাঁর শিক্ষাও কুতুব্‌ পেয়েছিলেন। তিনি অতি গুণী সেতারীরূপে সুপরিচিত হন এবং ওয়াজিদ আলী শা লক্ষ্ণৌতে নবাব থাকবার সময় তাঁর দরবারে নিযুক্ত থাকেন। নবাব ওয়াজিদ আলী তাঁর কাছে প্রথম জীবনে সেতার শিক্ষাও করেছিলেন এবং একজন সভাসদ্‌রূপে সম্মানিত করেন তাঁর এই সেতারের ওস্তাদকে। নবাব মেটিয়াবুরুজে নির্বাসিত জীবনযাপন করবার সময়ে কুতুব্‌উদ্দৌলার নাম আর বিশেষ পাওয়া যায় না। তিনি সম্ভবত পশ্চিমাঞ্চলেই থেকে যান, কলকাতায় আসেন নি।

তিনি যেমন সেতারে, ওমরাও খাঁর অন্য শিষ্য গোলাম মহম্মদ তেমনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন সুরবাহারে কুশলী কলাকাররূপে। গোলাম মহম্মদকে ওমরাও খাঁ তালিম দেবার সময় যে সুরবাহার যন্ত্রের উৎপত্তি, পরে গোলাম মহম্মদের সুর-সাধনার ফলে তার প্রচলন হয়। তিনি সেতারও বিশেষ ভাল বাজাতেন (সে তালিমও তাঁর ওস্তাদ ওমরাও খাঁর কাছে পাওয়া), বীণা-

বাদনেও নিপুণ ছিলেন, কিন্তু সুরবাহারী বলেই তাঁর নাম ছিল সবচেয়ে বেশি।

লক্ষ্ণৌতে তিনি অনেক সময় বাস করলেও তাঁর বাড়ি ছিল বান্দায়। একনিষ্ঠ সঙ্গীত-চর্চার আগ্রহ আর গুরুকে একান্ত শ্রদ্ধা-ভক্তির জন্যে ওমরাও খাঁর তিনি বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়েছিলেন। শোনা যায়, গোলাম মহম্মদের নাম আসলে গোলাম ছিল না, ওই শব্দটি তিনি নামের সঙ্গে যোগ করে নেন ওস্তাদের কাছে নিজেকে 'দাস' বলে নিবেদিত করবার জন্যে। তিনি ওস্তাদ ওমরাও খাঁর 'গোলাম' বলে নিজেকে পরিচিত করতেন গুরুর কাছে—তাই গোলাম মহম্মদ নাম নেন।

তাঁদের সমসাময়িক একজন উর্দু লেখকের (লক্ষ্ণৌর হকিম মহম্মদ করম ইমাম—'মাদনুল মুসিকী' গ্রন্থপ্রণেতা) মতে, গোলাম মহম্মদ তাঁর বাজনায় যে ধরনের 'ঠোক' ব্যবহার করেন তা তিনি (করম ইমাম) এক ওমরাও খাঁ ছাড়া আর কারুর বাজনায় শোনেন নি। ১৮৫৭-এর কিছু আগে গোলাম মহম্মদের মৃত্যু হয় বলরামপুরে।

তিনি কোনদিন বাংলাদেশে আসেন নি। কিন্তু তাঁর পুত্র ও শিষ্যধারার একাধিক ব্যক্তি বহু বছর বাংলায় বাস করেছিলেন এবং তাঁদের নিয়েই এই অধ্যায়। এই রকমের কয়েকটি শাখা-প্রশাখায় ওমরাও খাঁ তথা গোলাম মহম্মদের সঙ্গীতধারা বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করে।

গোলাম মহম্মদের সঙ্গীত-সম্পদের শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁর পুত্র—স্বনামধন্য সাজ্জাদ মহম্মদ। তিনি ছাড়া তাঁর পিতার (গোলাম মহম্মদের) আরও কয়েকজন শিষ্য ছিলেন—নবী বক্স, মহম্মদ খাঁর পিতা প্রভৃতি। মহম্মদ খাঁর পিতা (নাম জানা যায় নি) গোলাম মহম্মদের খিদ্‌মদ্‌গার থেকে পরে তাঁর শিষ্য হয়েছিলেন। তিনি সাজ্জাদ মহম্মদের প্রায় সমবয়সী। তাঁর পুত্র মহম্মদ খাঁ গোলাম মহম্মদের কাছে নাড়া বাঁধেন এবং কিছু তালিমও পেয়েছিলেন। কিন্তু সাজ্জাদ মহম্মদের কাছেই বেশির ভাগ তালিম লাভ করেন, বিশেষ সাজ্জাদ মহম্মদের শেষ বয়সে।

প্রথমে সাজ্জাদ মহম্মদের মাধ্যমে এই ধারা বাংলাদেশে এসে পৌছয়। তিনি পরিণত বয়সে বাংলায় বসবাস আরম্ভ করেন এবং শেষ ক'বছরের সঙ্গীত-জীবন অতিবাহিত করবার পর তাঁর মৃত্যুও হয় এখানে। বাংলার অন্য কয়েকটি সঙ্গীতাসরে তিনি মাঝে মাঝে যোগ দিলেও, একাদিক্রমে বহুদিন এবং জীবনের শেষ ক'বছর তিনি রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গীত দরবারে নিযুক্ত ছিলেন। শেষ জীবনে একমাত্র পুত্রের মৃত্যুশোকে অন্ধ হয়ে যান সাজ্জাদ মহম্মদ। তারও

আগে থেকে এবং মৃত্যু পর্যন্ত মহম্মদ খাঁ তাঁর সঙ্গে থাকেন, সেবাযত্ন করেন, তালিম নেন।

তা ছাড়া, বাংলাদেশে আরও একাধিক শিষ্য হয়েছিলেন সাজ্জাদ মহম্মদের। শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রধানত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর ও পরে কিছুকাল বীণ্‌কার লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্রের শিষ্য হলেও সাজ্জাদ মহম্মদের কাছে সেতার শিক্ষা করেছিলেন। সাজ্জাদ মহম্মদ তাঁর আশ্রয়েই বাস করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বৃত্তি ভোগ করেন।

সাজ্জাদ মহম্মদের আর একজন বাঙ্গালী শিষ্যের নাম করা উচিত। তিনি সে-যুগের বাংলার এক বিচিত্র সঙ্গীত-প্রতিভা—বামাচরণ ভট্টাচার্য। বিচিত্রতর তাঁর শিক্ষার প্রসঙ্গ। তিনি ধনীর সন্তান ছিলেন না, কিন্তু সেকালের ভারতবর্ষের এমন ক'জন শ্রেষ্ঠ কলাবতের কাছে সঙ্গীত-শিক্ষার সুযোগ করে নেন, যাঁদের সামনে সাধারণ ঘরের কোন শিক্ষার্থীর উপস্থিত হওয়াই ছিল অসম্ভব ব্যাপার। যেমন, তানসেনের পুত্র-বংশীয় মহাগুণী বাসৎ খাঁ, যিনি ছিলেন বড়কু মিয়াঁ ও মহম্মদ আলী খাঁর পিতা এবং জাফর খাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। প্রথম জীবনে বাসৎ খাঁ লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চলের দরবারে অবস্থান করবার পর নবাব ওয়াজিদ আলী শা'র মেটিয়াবুরুজ দরবারে সসম্মানে অধিষ্ঠিত থাকেন। নবাবের মৃত্যুর পরে ছিলেন রানাঘাটের বিখ্যাত ধনী-পরিবার পালচৌধুরীদের সঙ্গীত-সভায়। তারপর টিকারির মহারাজার সম্মানিত অতিথিরূপে গয়ায় শেষ-জীবন অতিবাহিত করেন। সঙ্গীত-জগতের এমন একজন নায়কের কাছেও শিক্ষা করেছিলেন বামাচরণ, যা অন্য কোন বাঙ্গালীর পক্ষে সম্ভব হয় নি। সাজ্জাদ মহম্মদের তালিমও পেয়েছিলেন তিনি এবং মহম্মদ খাঁরও। তা ছাড়াও আরও কয়েকজন গুণীর কাছে অল্প-বিস্তর শিখেছিলেন বামাচরণ, সকলের নাম করা বাহুল্য। তাঁর এই দুর্লভ সৌভাগ্যের কারণ, বাংলার কয়েকটি সঙ্গীতপ্রেমী ধনী পরিবারের সহযোগিতা। রানাঘাটের পালচৌধুরী, গোবরডাঙ্গার মুখোপাধ্যায়, মুক্তাগাছার আচার্য চৌধুরী প্রভৃতি জমিদার-ভবনের সঙ্গীত-সভায় তাঁর অবারিত গতিবিধি ছিল পরিবারের কর্তাদের অকুণ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতায়। তাঁদের অনুমোদনে বামাচরণ কয়েকজন শ্রেষ্ঠ গুণীর কাছে শিক্ষার দুর্লভ সুযোগ পান ও নিজের প্রতিভায় তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন। 'ধনবানে কেনে বই জ্ঞানবানে পড়ে'; কিংবা ধনবানে আনে গুণী 'সুরবানে' শেখে। সে যা হোক, বামাচরণ এই ভাবে যে অমূল্য সঙ্গীত-বিদ্যা আহরণ ও ধারণ করেন, তার ফলে বাংলাদেশে রাগ-সঙ্গীতের চর্চার কিছু পরিমাণে শ্রীবৃদ্ধি

ঘটে। বাসৎ খাঁ, সাজ্জাদ মহম্মদ প্রভৃতির সঙ্গীতধারা, আংশিক ভাবে হলেও, বামাচরণের পুত্র পৌত্রাদি (জিতেন্দ্রনাথ ও লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য) এবং তাঁদের শিষ্যবৃন্দের মধ্যে দিয়ে বাংলার সঙ্গীতের আসরে সঞ্জীবিত থাকে।

সাজ্জাদ মহম্মদের সেতার-সুরবাহার বাজনার জন্যে আর একজন এখানে দস্তুরমত উপকৃত হয়েছিলেন। তিনি বাঙ্গালী না হলেও বাংলাদেশে জীবনের প্রায় অর্ধাংশ অতিবাহিত করেন এবং তাঁর পুত্র প্রায় আজীবন বাংলা নিবাসী। তিনি হলেন সেতারী এনায়েৎ খাঁর পিতা ইম্‌দাদ খাঁ। সাজ্জাদ মহম্মদ পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর-বাড়িতে থাকবার সময় ইম্‌দাদ খাঁ তাঁর কাছে যে যন্ত্রসঙ্গীত বিষয়ে ঋণী হয়েছিলেন, সে-প্রসঙ্গ ইম্‌দাদ খাঁর একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে উল্লেখ করা হবে।

এমনি ভাবে ওমরাও খাঁ, গোলাম মহম্মদ, সাজ্জাদ মহম্মদ, মহম্মদ খাঁর ক্রম-পর্যায়ে গঠিত সঙ্গীত-পরিবারের ধারা আংশিক ভাবে কয়েকটি শাখা-প্রশাখায় বাংলাদেশে বিস্তৃত হয়। সাজ্জাদ মহম্মদের পরে এই সম্পদের প্রধান ধারক-বাহক মহম্মদ খাঁর সূত্রে এই ধারা আর এক দফায় বিস্তার লাভ করে বাংলায়। কারণ মহম্মদ খাঁও তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল এদেশে বাস করেন, বাংলার বহু সঙ্গীতাসরে যোগ দেন, নানা সঙ্গীত-সভায় যুক্ত থাকেন এবং কয়েকজন বাঙ্গালী শিক্ষার্থী তাঁর তালিম পান।

সাজ্জাদ মহম্মদের তুল্য অত বড় কলাবত না হলেও মহম্মদ খাঁ সেতার-সুরবাহার বাদকরূপে বিশেষ কম ছিলেন না। সাজ্জাদ মহম্মদের মৃত্যুর কিছু পরে তিনি নিযুক্ত হন গোবরডাঙ্গার মুখোপাধ্যায় পরিবারের সঙ্গীতসভায়। মহম্মদ খাঁর কাছে বামাচরণ ভট্টাচার্যের কিছু শিক্ষার কথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু খাঁ সাহেবের তালিম যিনি সবচেয়ে বেশিদিন এবং একান্তভাবে পেয়েছিলেন, একনিষ্ঠভাবে তাঁরই ধারায় স্বর-সাধনা করেছিলেন, যাঁকে মহম্মদ খাঁর উত্তরাধিকারী বলা যায়, তিনি হলেন গোবরডাঙ্গার জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। মনুবাবু নামে সঙ্গীত-সমাজে সুপরিচিত এই শৌখীন সঙ্গীতজ্ঞ যেমন ঐকান্তিক সাধনায় সঙ্গীতশিক্ষা করেন, তেমনি বাংলার এক শ্রেষ্ঠ গুণীরূপে পরিগণিত হন। সুরবাহার-শিল্পী জ্ঞানদাপ্রসন্নের আর এক শখ ও সাধন ছিল, শিকার। নিপুণ শিকারী হিসেবেও তাঁর খুব নামডাক ছিল। শিকারের তীব্র নেশাও কিন্তু তাঁর সঙ্গীত-চর্চার আকর্ষণ কিছুমাত্র শিথিল করতে পারে নি। শিকার-যাত্রার সঙ্গেও তাঁর সঙ্গে যেতেন ওস্তাদ মহম্মদ খাঁ, অন্যান্য গায়ক-বাদকেরা এবং সঙ্গীতামোদী সুহৃদবর্গ। সঙ্গীতের নানা সরঞ্জাম ওস্তাদের সঙ্গে

তাঁবুতে রেখে তিনি শিকারে যেতেন। রাত্রে তাঁবুতে ফিরে এসে চলত গান-বাজনা। শিকার ও সঙ্গীতে তাঁর অন্তরঙ্গ সহযাত্রী ছিলেন মুক্তাগাছার জগৎ-কিশোর আচার্য চৌধুরী এবং রানাঘাটের পালচৌধুরী, নলডাঙ্গার রায় প্রভৃতি জমিদার পরিবারের বন্ধুরা। রানাঘাটের বিখ্যাত টপ্পাগায়ক নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, সেতার-সুরবাহার বাদক বামাচরণ ভট্টাচার্য প্রভৃতিও এই সব শিকার-শিবিরের সঙ্গীতাসরে যোগ দিতেন। জ্ঞানদাপ্রসন্নের সুহৃদ জমিদারবর্গের অনেকের বাড়ির আসর সেতার-সুরবাহার বাজিয়ে মাত করেছেন মহম্মদ খাঁ। কিন্তু জ্ঞানদাপ্রসন্ন ভিন্ন আর কেউ মহম্মদ খাঁর সঙ্গীত-বিদ্যা অনেকাংশে আয়ত্ত করতে পারেন নি।

মহম্মদ খাঁর আর একজন শিষ্য ছিলেন উমেশচন্দ্র চক্রবর্তী। তিনি বিক্রমপুরের বীজগাঁয়ের জমিদার এবং সঙ্গীত-শাস্ত্রবিদ্ ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর মাতুল। যে শিরোনামা দিয়ে এই অধ্যায়ের আরম্ভ, সেই কথাটি উমেশচন্দ্র চক্রবর্তীকে মহম্মদ খাঁ বলেছিলেন।—এখন সেই প্রসঙ্গ।

মহম্মদ খাঁ তখন উত্তর কলকাতার জ্ঞানদাপ্রসন্নের 'গোবরডাঙ্গা হাউস্'-এ (মাণিকতলার মোড়ের কাছে, বিবেকানন্দ রোডে। সে ভবন এখন হস্তান্তরিত) থাকেন। উমেশচন্দ্র বিক্রমপুর থেকে মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতেন এবং অন্যান্য কাজের মধ্যে মহম্মদ খাঁর কাছে কিছু কিছু সেতারে তালিম নিতেন। সেবারেও উমেশচন্দ্র এসে দেখা করেছেন মহম্মদ খাঁর সঙ্গে, গোবরডাঙ্গা হাউসের বৈঠকখানায়। সেখানে মনুবাবু ও আরও কয়েকজন ছিলেন মহম্মদ খাঁর কাছে, সঙ্গীত-চর্চা হচ্ছিল। উমেশচন্দ্রও এসেছেন খাঁ সাহেবের কাছে নতুন কিছু শিখতে।

মহম্মদ খাঁ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ কি দেব ?'

অর্থাৎ কোন্ রাগ তিনি শিখতে চান খাঁ সাহেবের কাছে।

উমেশচন্দ্র বললেন, 'ভৈরবী।'

শুনে, মহম্মদ খাঁ একটু চুপ করে থেকে রহস্যভরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি রকম ভৈরবী শেখবার ইচ্ছে ? একদিনের ভৈরবী, না এক মাসের ভৈরবী, না এক বছরের ভৈরবী ?'

ভারতীয় রাগ-বিদ্যার যেমন গভীরতা, তেমনি ব্যাপকতাও। যেমন অসংখ্য রাগ, তেমনি বৈচিত্র্যময় তাদের রূপায়ণের পদ্ধতি। অতল ভাবগাঢ়তা ভারতীয় সঙ্গীতে। এক-একটি রাগ তাই বিপুল বিস্তৃতিতে প্রস্ফুটিত ও বিকশিত হতে পারে। তার আবেদন, তার আকর্ষণী শক্তি যথার্থ শিল্পীর হাতে কখনও

নিঃশেষ কিংবা পুরনো হয় না। নব নব সুর-দিগন্তের উন্মেষে তার রূপ কখনও ক্লান্তিকর লাগে না। কমল মুকুলের দল উন্মোচনের মতন তা চিরনতুন। কারণ তা কখনও বৈচিত্র্যহীন পুনরাবৃত্তি মাত্র নয়, নতুন নতুন সৃজনের পথ তার মধ্যে উন্মুক্ত থাকে। নচেৎ এতকাল ধরে এত সুরসাধক তাঁদের প্রতিভা প্রকাশ করতে পারতেন না ভারতীয় সঙ্গীতে। এক-একজন সঙ্গীতসেবক কয়েকটি মাত্র রাগ নিয়ে আজীবন সাধনায় নিমগ্ন থাকতে অপারগ হতেন। আর রাগমালা তাদের প্রাণোচ্ছল সজীবতা হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে যেত বহুকাল আগেই। কিন্তু তা হয় নি। হবেও না কোন দিন, যদি সাধক-শিল্পীর অনটন না ঘটে।

মহম্মদ খাঁ-ও একজন সাধক শিল্পী ছিলেন। তাই রাগের গভীরতার মর্মজ্ঞও। এক ভৈরবী নিয়ে একজন শিক্ষার্থী এক বছর চর্চা করতে পারে এবং এমন পদ্ধতি প্রদর্শন করতেও তিনি সক্ষম। আবার সে ভৈরবীকে সংক্ষিপ্ত করে চপলমতি শিক্ষার্থীর একদিনের শিক্ষার উপযোগী করে দেওয়াও সম্ভব।

মহম্মদ খাঁ রাগবিস্তারের এই রহস্যের প্রতি ইঙ্গিত করেই প্রশ্ন করেছিলেন।

উমেশচন্দ্র তার তাৎপর্য বুঝে সবিনয়ে জানিয়েছিলেন, 'আমি অ্যামেচার লোক। মাসখানেক পরে পরে কলকাতায় আসি। একমাসে শিখতে পারি এমন ভৈরবীই দেবেন।'

গান শুনতে ট্রেন বন্ধ

গায়ক অঘোরনাথ চক্রবর্তীর পরিচয় আর নতুন করে দেবার দরকার নেই। গোপালচন্দ্র চক্রবর্তীর সেই গানের আসরে তাঁর কথা জানান হয়েছে—কার কার কাছে তিনি গান শিখেছিলেন, তাঁর গলা কেমন তৈরী ছিল, কণ্ঠমাধুর্যের জন্যে তিনি আসর কিরকম মাত করতেন, ইত্যাদি।

এখানে তাঁর একদিনের গানের কথা বলা হচ্ছে। এটি কিন্তু কোন আসরের গল্প নয়।

অঘোরবাবু তখন সঙ্গীতের আসরে খুব বিখ্যাত হলেও, এদিনের গান কোন আসরে হয় নি। গানের এমন পরিবেশের কথাও বড় একটা শোনা যায় না। কারণ, এবারের ঘটনাস্থল হল—মফস্বলের একটি ছোট রেল স্টেশন। চব্বিশ পরগণার সোনারপুর নামক স্টেশন।

সোনারপুরের পাশে রাজপুর গ্রামে অঘোরবাবুর জন্মস্থান ও বাড়ি। আর তখন তিনি সেখানেই বাস করতেন। কম বয়স থেকেই তাঁকে যাতায়াত করতে হত কলকাতায় কাজের জন্যে। চাল কেনা-বেচায় মধ্যস্থতা করতেন। বেলেঘাটায় নন্দীদের গোলায় সে-সময় প্রায় প্রতিদিন তাঁকে আসতে হত।

সোনারপুর অঞ্চলের ওপর দিয়ে রেল লাইন পাতা হয়ে তখন নিয়মিত ট্রেন চলাচল আরম্ভ হয়ে গেছে। অঘোরবাবু সেই লাইনের ডেলি প্যাসেঞ্জার। প্রতিদিন সকালের প্রথম ট্রেনে চলে আসতেন বেলেঘাটায়। তারপর সমস্ত দিন কলকাতায় থেকে রাত্রের গাড়িতে দেশে ফিরতেন। জীবিকার সঙ্গে কলকাতার সঙ্গীতজগতের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতেন তিনি।

এমনি একদিনের কথা। সকালবেলা গ্রাম থেকে এসে স্টেশনে উপস্থিত হয়েছেন, কলকাতায় আসবার জন্যে।

ট্রেন আসতে তখন একটু দেরি আছে। অঘোরবাবু স্টেশনের একটি বেঞ্চে বসেছেন। সঙ্গের সঙ্গী ছোট হুঁকোটিতে এক ছিলিম তামাক সেজে খাওয়াও সাঙ্গ হল। মনটি বেশ প্রফুল্ল।

সকালের স্নিগ্ধ হাওয়া ঝিরঝির করে বয়ে চলেছে। পরিচ্ছন্ন নীল আকাশের নীচে মনোরম সবুজ প্রান্তর। পরিবেশটি শিল্পীর পক্ষে মনোহারী।

অঘোরবাবুর খুশী মেজাজে গুন্ গুন্ করে ভৈরবী সুরের সাড়া জাগল।

সেই শান্ত সকালে একা বসে তিনি প্রাণের আরামে তাঁর একটি ভৈরবীর প্রিয় বাংলা গান ধরলেন। কাউকে শোনাবার জন্যে নয়, নিজের ভাবে বিভোর হয়ে তিনি গাইতে লাগলেন—

বিফল জীবন, বিফল জনম, জীবনের জীবনে না হেরে…

সেই নির্জন স্টেশনের একটি বেঞ্চে বসে আপন মনে অঘোরবাবু দরাজ গলায় গাইছেন—

সুখে ডালে বসে ডাকিছ পাখী রে,
ডাকিছ কি সেই পরম পিতারে…

এমন সময় ট্রেন সশব্দে স্টেশনে এসে দাঁড়াল। অঘোরবাবুর কানে সে সংবাদ কিন্তু পৌঁছল না। তখন তন্ময় হয়ে গেয়ে চলেছেন—

কি বলে ডাকিছ, বলে দে আমারে, ডেকে যদি দেখা পাই রে…

একে অঘোরবাবুর লালিত্যময় কণ্ঠ, তার ওপর মনের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে গাওয়া গান তখন সোনারপুর স্টেশনে সুরের মধুর আবহ সৃষ্টি করেছে।

সদ্য-থামা ট্রেনের যাত্রীদের কানে সেই সুর পৌঁছুতেই তারা প্রথমে কামরার

জানলায় মুখ বাড়িয়ে শুনতে লাগল। কিন্তু সেখান থেকে শুনে যেন পুরো তৃপ্তি না পেয়ে তারা প্ল্যাটফর্মে গায়কের কাছে এসে দাঁড়াল। কিংবা গানের সুর যেন তাদের আকর্ষণ করে নিয়ে এল তার উৎসের পাশে। শুধু যাত্রীরা নয়। ক্রমে গার্ড থেকে আরম্ভ করে ড্রাইভার পর্যন্ত এগিয়ে এসে উপভোগ করতে লাগল সেই গানের মাধুর্য।

প্ল্যাটফর্মে এত লোকজন এসে পড়ার জন্যেই বোধ হয় গায়কের চমক ভাঙল। তিনি ট্রেন এসেছে দেখে গান বন্ধ করলেন গাড়িতে ওঠবার জন্যে।

কিন্তু তিনি বুঝতে পারেন নি যে, এর মধ্যে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মটি মুগ্ধ শ্রোতার ভিড়ে সঙ্গীতের আসরে পরিণত হয়েছে।

তাই তিনি গান থামাতেই অনুরাগী শ্রোতারা বলে উঠল, গান বন্ধ করবেন না। আমরা সবাই শুনছি। আর একটু হোক।

বিস্মিত অঘোরবাবু বললেন, কিন্তু ট্রেন যে লেট্ হয়ে যাবে।

সবাই কলরব করে উঠল, হোক গে লেট্। আমরা সব একদিন লেট্ করেই যাব, তাতে আর হয়েছে কি? এমন গান তো আর অন্যদিন শুনতে পাব না।

গার্ড, ড্রাইভার সকলেরই মনের সেই ইচ্ছে, আর একটু শুনতে হবে। গান যেন বন্ধ না হয়। কিন্তু কাজের দায়িত্বের জন্যে হয়তো কিছু দ্বিধা ভাব ছিল।

তাই স্টেশন মাস্টার, যিনি নিজেও এতক্ষণ মুগ্ধ শ্রোতারূপে দাঁড়িয়ে ছিলেন, এগিয়ে এসে বরাভয় দিলেন—সে-সব আমি ঠিক করে নেব। তার জন্যে কাউকে কিছু ভাবতে হবে না। এখন অঘোরবাবুর গান চলুক। গান চলুক।

অগত্যা অঘোরবাবু গানখানি সম্পূর্ণ গাইলেন—

গুঞ্জরি ভ্রমর করি গুন্ গুন্, গাইছ কি সেই গুণাকর গুণ;
শিখাও আমারে, আমি যে নির্গুণ, কি গুণে ভুলালে তাঁরে।
কেন ফুল কুল হাসিছ সকলে, পেয়েছ কি সেই পরম দয়ালে;
পায়ে ধরি, বল কেমনে পাইলে, প্রাণারাম প্রাণেশ্বরে।
সুনীল গগন নীল আবরণে, আবরি রেখেছ বুঝি প্রাণধনে;
খোল আবরণ, বারেক নয়নে হেরে প্রাণ জুড়াই রে।
বিশাল সুমেরু ওহে বিন্ধ্যাচল, গ্রীবা উচ্চ করি, কি হেরিছ বল;
করেছ কি হেরি জনম সফল, বিশ্বম্ভর বিশ্বেশ্বরে॥

গান শেষ হবার পর ট্রেন ছাড়ল সাত-আট মিনিট লেট্ করে। গাড়ি চলতে আরম্ভ হল, আর অঘোরবাবুর সঙ্গে সুরও যেন স্টেশন থেকে যাত্রা করলে।...

এই "বিফল জীবন বিফল জনম" গানখানির সঙ্গে অঘোরবাবুর আর এক দিনের আসরের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। সেটিও উল্লেখ করবার মতন।

না, রেকর্ড করার কথা নয়। যদিও এই গান রেকর্ড হয়েছিল তাঁর আরও তিনটি গানের সঙ্গে, একটি বিশেষ অবস্থায়। তাঁর এই চারখানি গানের রেকর্ড গ্রামোফোন কোম্পানীতে হয় নি, কারণ তিনি রেকর্ডে কণ্ঠদান করতে সম্মত ছিলেন না। তাই তাঁর গান রেকর্ড হয়েছিল মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়িতে এবং একরকম বিনা প্রস্তুতিতে তিনি গান চারখানি সেখানে গেয়েছিলেন। কোন যন্ত্রের সঙ্গত তাঁর গানের সঙ্গে ছিল না আর সেই রেকর্ড দুটিতে মুদ্রিত আছে—In the household of Maharaja J. M. Tagore. "বিফল জীবন" গানটি ভৈরবীতে তাঁর Gramophone Concert Record স্বরূপে আছে "আনন্দবন গিরিজা"র অন্য দিকে (G. C. 2—12912)।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা কর্তব্য যে, তাঁর এই গান চারখানি (অন্য দুটি হল —"নজরা দিলবাহার", শ্রীজানের কাছে পাওয়া টপ্পা ও "গোবিন্দ মুখারবিন্দ") যথোচিত ভাবে এবং বিনা যন্ত্রে ও সঙ্গতে, শুধু গলায় গাওয়া। অনুকূল পরিবেশে গৃহীত না হওয়ায় এই রেকর্ড দুটি থেকে অঘোরবাবুর গানের বিচার করতে গেলে, ঠিক ন্যায় কাজ হবে না।

সেকথা যাক। "বিফল জীবন বিফল জনম" গানখানি তিনি বড় ভাল গাইতেন। তাঁর এই প্রিয় গানের রচয়িতা ছিলেন বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়, যিনি ব্রহ্মসঙ্গীতরূপে এটি রচনা করেন। অঘোরবাবু গানটিকে টপ্পা অঙ্গে গঠন করে আসরে গাইবার উপযোগী করে নিয়েছিলেন, মনে হয়। কারণ এই গান তিনি রীতিমত ওস্তাদদের আসরে পরিবেশন করেন, এমন অন্তত একটি ঘটনার কথা জানা যায়।

সেদিনের সেই আসর বসেছিল কাশীতে। কাশীর সঙ্গে অঘোরবাবুর সম্পর্ক অনেক দিনের। জীবনের শেষ দশ বছরের মধ্যে অনেকটা সময় তাঁর কাশীতে কাটে। তাঁর মৃত্যুও হয় কাশীতে।

কাশীবাস করবার সময়েই তিনি পরবর্তী কালের গুণী ধ্রুপদী গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গীত শিক্ষা দেন। অঘোরবাবুর আর এক শিষ্য অমরনাথ ভট্টাচার্যও মাঝে মাঝে কাশীতে গেলে তাঁর কাছে শিক্ষা লাভ করতেন। অমরবাবু অবশ্য প্রথম জীবনে কলকাতায় অঘোরবাবুর শিক্ষা পেয়েছিলেন। অঘোরবাবুর কৃতী শিষ্য (শিবপুরের) নিকুঞ্জবিহারী দত্ত নিজের বাড়িতে গুরুর শিক্ষা পান। পুলিনবিহারী মিত্র প্রভৃতি অঘোরবাবুর অন্যান্য শিষ্যেরাও

শিখেছিলেন কলকাতাতেই। ধরতে গেলে, গোপালবাবু ছাড়া তাঁর আর কোন শিষ্যই কাশীতে অঘোরবাবুকে পান নি। কারণ গোপালবাবু ছিলেন কাশীর সন্তান। প্রথম জীবনে তিনি কলকাতায় একবার এসে অঘোরবাবুর কাছে শিক্ষার জন্যে আবেদন করেছিলেন। তখন অঘোরবাবু রাজী হন নি। বলেছিলেন, যদি কখনও কাশীবাস করতে যাই, তখন এসো, শেখাব।

পরিণত বয়সে যখন তিনি কাশীতে বাস আরম্ভ করেন, তখন গোপালবাবু এসেছিলেন শিক্ষার্থী হয়ে এবং অঘোরবাবুও কথা রেখেছিলেন।...

"বিফল জীবন বিফল জনম" গানটি অঘোরবাবু কাশীর সে আসরে যখন গেয়েছিলেন, তাও তাঁর জীবনের শেষ দিকের কথা। কারণ সে আসরে, পরের যুগের ধ্রুপদ-গুণী ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (মহীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের শিষ্য) উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি গোপালবাবুর চেয়ে ৭।৮ বছরের ছোট।

এই আসরটি বিশ শতকের প্রথম ৫।৭ বছরের কোন সময়ে হয়েছিল মনে হয়।

অঘোরবাবু তখন বছরের বেশীর ভাগ সময় কাশীতেই থাকতেন।

এমন সময় একটি আসর বসে সেখানে। এবং অঘোরবাবু নিমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত হন।

অন্য যাঁরা সেখানে গান-বাজনা করতে এসেছিলেন, তাঁদের নাম জানা যায় নি। কিন্তু তাঁরা যে সবাই পশ্চিমা বা হিন্দুস্থানী ছিলেন, অর্থাৎ অঘোরবাবু ভিন্ন বাঙ্গালী কেউ ছিলেন না, তা জানা গেছে। ভূতনাথবাবু সেই আসরে উপস্থিত ছিলেন শ্রোতা হয়ে, গায়করূপে নয়।

গান আরম্ভ হতে তখনও কিছু দেরি আছে। আসরে বসে গল্প-সল্প করছেন গাইয়ে-বাজিয়ের দল। সবাই তো পশ্চিমের লোক। নিজেদের মধ্যে গল্প করতে করতে তাঁরা বাঙ্গালীদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ আরম্ভ করে দিয়েছেন। কেউ বলছেন, বাঙ্গালীদের শরীরে কি তাকৎ আছে যে, ওরা গান গাইবে?

কেউ বলছেন, বাংলা মুলুকে কি এমন ঘি-দুধ খায় যে আমাদের মতন দাপটের সঙ্গে গাইতে পারবে!

কেউ বলছেন—আরে, চিংড়ি মাছ খেয়ে আবার গান গাইবে কি?

তাঁদের ধারণা—কালোয়াতি গান গাইতে গেলে পশ্চিমের পালোয়ান হওয়া চাই। এ গান গাওয়া বাঙ্গালীর কর্ম নয়।

পশ্চিমের অনেক সঙ্গীতজ্ঞেরই এই রকম ধারণা ছিল এবং এখনও একেবারে নেই বলা যায় না। তার কারণ শুধু এই নয় যে, বাঙ্গালীদের তাঁরা হিন্দুস্থানীদের মতন যথেষ্ট পরিমাণে যণ্ডা মনে করেন না (সত্যিই পশ্চিমের অনেকের ধারণা

—মল্লবীর না হলে সঙ্গীতজ্ঞ হওয়া সম্ভব নয়)। সেই সঙ্গে অনেক পশ্চিমাদের এই এক অহমিকা আছে যে, বাঙ্গালীরা কখনও রাগসঙ্গীতে হিন্দুস্থানীদের মতন পারদর্শী হতে পারে না। এই সঙ্গীতে পশ্চিমাদেরই একচেটিয়া অধিকার। বাঙ্গালীদের নিজস্ব সঙ্গীত এটা নয়—তাদের নিজেদের গান-বাজনা হল অতি হাল্‌কা জিনিস। রাগ-সঙ্গীতের তুল্য ভার বা ধার কিছুই তার নেই। বাংলা-দেশের গান মানেই এইসব লোকের কাছে, অতি হাল্‌কা গান, থিয়েটারের গান ইত্যাদি বোঝায়।

সেই আসরেও বাঙ্গালীদের চিংড়ি-খেকো ইত্যাদি বলে এইরকম মনোভাবই প্রকাশ করা হচ্ছিল।

সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে সেখানে একা অঘোরবাবু চুপ করে বসে তাদের কথাবার্তার ধরন-ধারণ দেখছিলেন। কোন প্রতিবাদ করেন নি। মনে মনে বোধ হয় তিনি সংকল্প করছিলেন যে, মুখে তর্ক না করে কাজে দেখিয়ে দেব। বাঙ্গালী কিরকম গাইতে পারে, তা গান গেয়েই দেখিয়ে দিতে হবে।

যথাসময়ে গান আরম্ভ হল। প্রথমে হিন্দুস্থানী গায়ক দু'একজন গাইলেন। তার পর এল অঘোরবাবুর পালা। তিনি সকলকে অবাক্ করে দিয়ে ধরলেন—"বিফল জীবন বিফল জনম জীবনের জীবনে না হেরে…।"

এই ধরনের আসরে তিনি বাংলা গান বড় একটা গাইতেন না। গাইতেন হিন্দী ধ্রুপদ, ধ্রুপদাঙ্গ বা টপ্পা অঙ্গের ভজন, কিংবা টপ্পা। এখানে বাঙ্গালীদের নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ হতে শুনে তিনি পুরোপুরি বাংলা গানই ধরলেন, হিন্দুস্থানী শ্রোতাদের বাংলা ভাষার মর্ম গ্রহণ করতে অসুবিধা হবে জেনেও।

যেন সমস্ত বাঙ্গালীদের মুখপাত্র হয়ে তিনি গানখানি আরম্ভ করলেন। অতি যত্নের সঙ্গে, দরদ দিয়ে, নিজের সব শক্তি প্রয়োগ করে লালিত্যময় টপ্পার দানায় ভরিয়ে গাইতে লাগলেন তিনি। বাংলা গান ধরবার বোধ হয় এই উদ্দেশ্য ছিল: তোমরা শোন বাঙ্গালী গাইতে পারে কি না। তোমরা আরও শোন—বাংলা ভাষায় কেমন টপ্পা হতে পারে।

গায়ক হিসাবে অঘোরবাবুর যেসব গুণের কথা শোনা যায়, সেদিনকার গানে তার অনেকখানি ফুটে উঠল।

গান যখন তিনি শেষ করলেন, তখন স্পষ্টই বোঝা গেল, আসর মাত হয়েছে। হিন্দুস্থানী শ্রোতাদের একবাক্যে স্বীকার করতে হল—গান ভাল হয়েছে। সত্যিই বড় ভাল হয়েছে। যদিও ভাষা বোঝা যায় নি, অর্থ বোঝা যায় নি—কিন্তু সুরের কাজ চমৎকার, গাইবার রীতি অতি উঁচু দরের।

সেদিনের একজন শ্রোতা, সুকণ্ঠ ধ্রুপদী ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরে এই আসরের গল্পটি বলতেন।

খাম্বাজ থেকে ভৈরবী

বিগত-যুগের ওস্তাদরা, অর্থাৎ সঙ্গীত-ব্যবসায়ীরা, এই বিদ্যা দান করতে অনেক সময় কাতর হতেন। যক্ষের ধনের মতন তাঁরা সঙ্গোপনে রাখতেন তাঁদের সঙ্গীত-সম্পদ্। সাধারণ্যে সে বিদ্যা প্রচার করা অবশ্য সেকালের সামাজিক পরিবেশে প্রায় অসম্ভব ছিল। কিন্তু বাইরে থেকে কেউ তাঁদের কাছে শিষ্য হয়েও তা সচরাচর লাভ করতে পারত না।

কারণ নিজের বংশের অতিরিক্ত কোন শিক্ষার্থীকে তাঁরা দান করতে ইচ্ছুক ছিলেন না তাঁদের ঘরানা সম্পদ্। জমিদার, রাজা-মহারাজা বা নবাব-বাদশার দরবারে তাঁরা নিযুক্ত থাকতেন। সেখান থেকেই হত জীবিকার সংস্থান। সেজন্যে অর্থের প্রয়োজনে ছাত্রদের শিক্ষা দিতে তাঁদের হত না। যে আশ্রয়ে থাকতেন, সাংসারিক অভাব মিটে যেত সেখান থেকেই। সুতরাং সঙ্গীত-শিক্ষা দিতেন নিজের পুত্রকে, কিংবা খুব বেশি তো—জামাতাকে, যদি অবশ্য তাদের গ্রহণ করবার শক্তি থাকে।

এ কথাও অবশ্য সাধারণভাবে ওস্তাদশ্রেণীর সম্বন্ধে স্বীকার করতে হবে যে, অর্থের চেয়ে তাঁরা মূল্যবান মনে করতেন সঙ্গীত-বিদ্যাকে। নচেৎ অর্থের বিনিময়ে এ বিদ্যার বেসাতি তাঁরা করতেন। একালের অনেক ওস্তাদদের মতন এমন অর্থলোলুপ ছিলেন না তাঁরা। বিদ্যা দান করতে তাঁদের কার্পণ্য দেখা যেত বটে, কিন্তু অর্থকে পরমার্থ জ্ঞান করবার এমন সর্বাত্মক দৃষ্টান্ত হয়তো ছিল না। দোষে-গুণে সেটা ছিল মধ্যযুগের অবশেষ। তার স্বতন্ত্র ধারা। ধ্যান-ধারণা তখনকার অনেকখানিই ছিল অন্যরকম।

সে যা হোক্, ঘরানা বিদ্যা সেকালের পেশাদার কলাবতেরা অন্যত্র যেতে দিতেন না। বংশের অতিরিক্ত কোন শিষ্যকে মন খুলে বা অকাতরে শিক্ষা দিয়েছেন কদাচিৎ। এই নীতির ব্যতিক্রম বা অঘটন ঘটেছে ওস্তাদ অবিবাহিত বা অপুত্রক বা অস্বাভাবিক উদারচেতা হলে। নিঃসন্তান হলেও তাঁরা বাইরেকার শিক্ষার্থীদের ঘরানা সম্পদ্ ঢেলে দিতেন না, দিতেন আত্মীয়দের। নিয়মের ব্যতিক্রম ছিলেন মুষ্টিমেয় কয়েকজন।

সে যুগের পেশাদার সঙ্গীতজ্ঞদের (প্রায়শঃই তাঁরা অবাঙ্গালী) মনের কথা ছিল—পুত্র বা জামাতাকে ভিন্ন এ বিদ্যা আর কাউকে দেওয়া চলে না।

সঙ্গীতচর্চা যত আধুনিক বা গণতান্ত্রিক কালের দিকে এগিয়ে এসেছে, ততই পরিবর্তিত হয়েছে এই মনোভাব। কারণ, সেকালের মনোভাবের বাস্তব ভিত্তি টলে গেছে। পূর্বযুগের বনিয়াদী পৃষ্ঠপোষক জীবনের রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নেবার ফলে আগেকার ধ্যান-ধারণা বদলেছে—অবস্থা-গতিকে, কালের যাত্রায়। দীর্ঘকালের সঞ্চিত প্রায়-গুপ্ত বিদ্যা এখন ওস্তাদদেরই বাস্তব প্রয়োজনে সাধারণের দরবারে ব্যক্ত করতে হচ্ছে।

তবে সেকালের ওস্তাদদের স্বপক্ষে আর একটি কথাও বলা যায়। সঙ্গীত-বিদ্যার প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাপূর্ণ নিষ্ঠাও অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষাদানে কার্পণ্যের জন্যে দায়ী ছিল। অব্যবসায়ীর অর্থাৎ অনধিকারীর হাতে যেন সঙ্গীতের মান নমিত না হয়, মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না হয়, এই ভয়েও কোন কোন ওস্তাদ যত্র-তত্র শিক্ষা দিতেন না। অপাত্রে বিদ্যা ন্যস্ত হলে তার যথাযোগ্য চর্চা ও সমাদর না হতে পারে, এই আশঙ্কা তাঁদের রীতিমত ছিল। সঙ্গীত-সাধনায় তাঁরা এখনকার অনেকের তুলনায় অতিশয় serious ছিলেন, একথা অস্বীকার করা যায় না। অর্থের লালসায় বিদ্যাকে হাটে হাটে ফেরি করবার কথা তাঁদের কল্পনায়ও স্থান পেত না। তাকে লালন করে সঞ্জীবিত করতেন পরম নিষ্ঠায়। সঙ্গীতের যে ধারা তাঁরা যোগ্য উত্তরাধিকারীর সাধন-লব্ধ করে রেখে যেতে পারতেন, তা-ই রক্ষিত হত। যাঁরা তা না পারতেন, তাঁদের দেহপটের সঙ্গে লুপ্ত হয়ে যেত অমূল্য সেই সঙ্গীত-সম্পদও। এমন অনেক কলাবতের দৃষ্টান্ত আছে। তাঁদের মধ্যে একজনের কথা এখানে বলা হবে।

এই ওস্তাদের নাম আসঘর আলী খাঁ। একটি মহাকৃতী সঙ্গীত পরিবারের অন্যতম গুণী। এখনকার কালের বিখ্যাত সরোদী হাফিজ আলী খাঁ'র জ্যেষ্ঠতাত ছিলেন হোসেন খাঁ, গোলাম মহম্মদের সাগীরদ্। হোসেন খাঁ-র দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুরাদ আলী এবং নান্নে খাঁও (হাফিজ আলীর পিতা) গুণী ছিলেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠ হোসেন নাকি ছিলেন তিন ভ্রাতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আবার উক্ত হোসেন খাঁ-র একমাত্র পুত্র আসঘর আলী সমগ্র পরিবারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণী ছিলেন বলে কথিত আছে।

আসঘর আলী তালিম পেয়েছিলেন রহিম খাঁ বীণ্‌কারের (রামপুর ঘরানার অন্যতম প্রবর্তক আমীর খাঁ'র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) কাছে। আসঘর আলী বাজাতেন সরোদ, বীণা এবং সুরচয়ন নামে একটি যন্ত্র। শেষেরটিকে

তিনি ঘরানা-যন্ত্র বলতেন। এটি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় যন্ত্র ছিল, সুরবীণ্ নামেও কখনও কখনও অভিহিত করতেন এটিকে। প্রধানত আলাপচারীর এই যন্ত্রটি তিনি সরোদের চেয়ে বেশি বাজাতেন। তাঁর সুরবীণ্ বা সুরচয়ন যন্ত্রটি ছিল সেতার ও সরোদের সমন্বয়ে গঠিত। সেতারের দণ্ড এবং সরোদের তব্‌লি, তবে তা কাঠের—চর্ম কিংবা তম্বুরার নয়। দণ্ডের ওপর সেতারের মতন সচল ঠাটের পর্দা, কিন্তু মুগায় বা তাঁতে বাঁধা নয়, সুরবাহারের মতন পেতলের ওপর পর্দার সারি বসানো। সরোদের মতন কোলে রেখেও এ যন্ত্র বাজানো যেত। তবে বুকে ঠেকিয়ে অনেকটা বীণার ধরনে রেখে বাজাতেন আসঘর আলী। বুকে রেখে বাজিয়ে বাজিয়ে বুকে তাঁর চাপরাশের আকারে কড়া পড়ে যায়। সেতারের মেজ্‌রাব্ বা সরোদের জবা দুইয়ের যে-কোনটি দিয়ে বাজানো যেত সুরচয়ন।

উত্তরজীবনে আসঘর আলী ছিলেন দ্বারবঙ্গ মহারাজের দরবারে নিযুক্ত বাদক। এই দরবারেই তাঁর সঙ্গীত জীবনের অধিকাংশ অতিবাহিত হয়। মহারাজা লক্ষ্মীশ্বর সিংহের আমলেই তিনি বেশিদিন সেখানে ছিলেন, তারপর শেষ ক' বছর মহারাজা রামেশ্বর সিংহের দরবারে। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে আসঘর আলীর দ্বারবঙ্গেই মৃত্যু হয় এবং এই কাহিনী তারও কয়েক বছর আগেকার কথা।

দ্বারবঙ্গের নতুন বাজার অঞ্চলে রাজার যে বৃহৎ 'ব্যারাক' বাড়িটিতে তাঁর নানা শ্রেণীর কর্মচারীদের বাস ছিল, তারই একদিকে ছিল ওস্তাদজীর বাসা। সেখানে তিনি তাঁর একমাত্র কন্যা এবং জামাতাকে নিয়ে বহুদিন থাকেন। জামাতার নাম আবদুল আজিজ, তিনি সরোদ-বাদক। শ্বশুর-জামাতার যুক্ত প্রসঙ্গ আরম্ভ করবার আগে আসঘর আলীর সঙ্গীত-জীবনের আরও কিছু পরিচয় দেওয়া দরকার।

আসঘর আলী একজন সাধক স্বভাবের সুরশিল্পী ছিলেন। কিন্তু বড়ই অদ্ভুত-প্রকৃতির সঙ্গীতসাধক। রাজদরবারে বাজাবার জন্যে যখন উপস্থিত হতেন, সে সময় ছাড়া বাইরে আর কোথাও তাঁকে বিশেষ দেখা যেত না। মহারাজা তাঁকে বাজনা শোনাবার জন্যে তলব করতেন সাধারণতঃ বিকালে। কখনও কখনও সন্ধ্যায়। আর ওস্তাদজীর নিজের বাজাবার বা সাধনার সময় ছিল গভীর রাত্রে, ব্যারাকবাড়ী আর সমগ্র দ্বারবঙ্গ শহর যখন ঘুমে অচেতন হয়ে থাকত।

রাত ন'টা সাড়ে ন'টার সময় রাত্রের খাওয়া শেষ করবার কিছুক্ষণ পরে

তিনি যন্ত্র নিয়ে বসতেন। ঘরের দরজা বন্ধ। চারদিক ক্রমে নীরব, নিস্তব্ধ হয়ে আসত। তখন তাঁর হাতে ধীরে ধীরে মুখর হয়ে উঠত সুরযন্ত্র। তিনি দরবার, সংসার, বিশ্বজগৎ ভুলে গিয়ে বাজনায় তন্ময় হয়ে যেতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যেত রাগের ধ্যানে, সুরের আবাহনে। এ সঙ্গীত-সৃষ্টি কাউকে শোনাবার জন্যে নয়, নিজের অন্তরের তাগিদেই এর জন্ম। বলতে গেলে, তাঁর অন্তরাত্মাই এর শ্রোতা। আর যদি সুরের কোন দেবতা থাকেন, তা হলে তিনি। তিনি এই স্তবকে স্তবকে সুরের অঞ্জলি গ্রহণ করেন। যে গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে একাদিক্রমে প্রায় সারা রাত শিল্পী বাজিয়ে চলেন, নিজে পরম পরিতৃপ্তি লাভ না করলে তা সম্ভব নয়।

সেই ত্রিযামা রাত্রিই ছিল তাঁর সঙ্গীতসাধনার প্রকৃষ্ট সময়। দিনের কোন সময়ে আর তাঁকে যন্ত্র নিয়ে বসতে বড় একটা দেখা যেত না। আর তাঁর প্রতিভা বেশি স্ফূর্তিলাভ করত রাগালাপে। আলাপচারিতেই তিনি সঙ্গীত-জগতের শ্রুতি-স্মৃতিতে অমর হয়ে আছেন।

ওই যে রাত তিনটে সাড়ে-তিনটে পর্যন্ত বাজাতেন, তারপর থেকে সকালবেলায় অনেকটা সময় নিদ্রা যেতেন। দরবারে যাওয়া ছাড়া দিনের অন্য সময়ে সাধারণতঃ বাড়ির বার হতেন না। দুপুরে বা দিনের অন্য সময়ে হয়তো বিশ্রাম করতেন, কিংবা অন্য কিছু, তা জানা যায় না। আর লোকের সঙ্গে মেলামেশা তিনি এত কম করতেন যে, রীতিমত অসামাজিক মানুষ বলা যেত তাঁকে।

অতি মিষ্টি হাতের বাজনা এবং সেই সঙ্গে রাগবিদ্যায় অসাধারণ অধিকার —এই জন্যে আসঘর আলীর নাম।

তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পরে এস্রাজী শীতল মুখোপাধ্যায় একবার দ্বারবঙ্গে উপস্থিত হলে সেখানকার দরবারী খেয়াল-গায়ক আজিজ বক্স তাঁকে বলেছিলেন, আর দুমাস আগে এলে আপনি আসঘর আলীর বাজনা শুনতে পেতেন। তাঁর সরোদে বাঁশী বাজত।

সরোদ 'আঘাত' করে বাজাবার যন্ত্র, কিন্তু মীড়ের কাজ ইত্যাদিতে এমন সুরেলা বাজাতেন যে বাঁশীর মতন আওয়াজ শোনাত—এত সুমিষ্ট হাত ছিল আসঘর আলীর। আজিজ বক্সের উক্ত মন্তব্য থেকে একথাই বোঝা যায়।

যেমন গুণী শিল্পী ছিলেন আসঘর, তেমনি বিপুল ছিল তাঁর রাগবিদ্যার সঞ্চয়। কিন্তু তাঁর সেই সম্পদ কোন্ উত্তরসাধককে তিনি দান করে গিয়েছিলেন? বলতে গেলে কাউকেই না।

তাঁর জ্ঞাতিভ্রাতা হাফিজ আলীর তরুণ বয়সে আসঘরের মৃত্যু হয়েছিল। হাফিজ আলী তার আগে আসঘরের তালিম পেয়েছিলেন অল্পকালের জন্যে। সে শিক্ষা তাঁর সম্পূর্ণ হতে পারে নি এবং সেই তালিমে হাফিজ আলীর সঙ্গীত-জীবন এমন গঠিত হয় নি যে, বলা যেতে পারে আসঘরের তিনি উত্তরাধিকারী। হাফিজ আলী পরে আলাপচারিতে রীতিমত তালিম পেয়েছিলেন রামপুর ঘরানার উজীর খাঁর কাছে এবং গৎ তোড়া ইত্যাদি শিখেছিলেন পিতা নামে খাঁর অধীনে। তাই উত্তরজীবনে হাফিজ আলীর 'বাজ'-এ আসঘরের বাজনার ছায়া পাওয়া যেত না। কখনও কখনও হাফিজ আলী ঘরোয়াভাবে বাজিয়ে দেখাতেন, আসঘরের তালিমী আলাপচারির কি রীতি ছিল। কিন্তু প্রকাশ্য আসরের বাজনায় হাফিজ আলী সে পদ্ধতিতে বাজান নি।

আসঘরের একজন 'শিষ্যে'র অপূর্ব সঙ্গীত 'শিক্ষা'র কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। তাঁর নাম জ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন আসলে চিত্রশিল্পী এবং মূর্তিচিত্র রচনায় নিপুণ। অনেক অনুরোধ-উপরোধেও তাঁর দ্বারবঙ্গে বাসের সময় ওস্তাদজী তাঁকে শেখাতে সম্মত হন নি। কিন্তু নাছোড়বন্দ শিক্ষার্থীকে শেষ পর্যন্ত অনুগ্রহ করে এই অনুমতি দিয়েছিলেন যে, তাঁর বাজনা ছাত্র কখনও কখনও শুনতে পাবেন এবং সে সময় স্বরলিপি করতে পারবেন। এই প্রস্তাব অবশ্য জ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ই করেছিলেন, কারণ তাঁর এই নৈপুণ্য ছিল যে, গান বা বাজনার সময়ে তা শুনে সঙ্গে সঙ্গে স্বরলিপি করে নিতে পারতেন।

অবশ্য এই প্রক্রিয়ায় রাগ-সঙ্গীত কেউ পূর্ণভাবে শিখতে পারে না এবং উক্ত জ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ও তা জানতেন। তবু তিনি এই উপায় স্থির করেছিলেন উপায়ান্তর না দেখে। ভেবেছিলেন, একটা কাঠামো কোনক্রমে তো পাওয়া যাবে। তারপর ওস্তাদজীকে শুনিয়ে তার ভুলভ্রান্তি সংশোধন করে নিলে হয়তো কিছু লাভ হবে। এই ভাবে স্বরলিপি করে পরে নিজে তা যন্ত্রে বাজিয়ে ওস্তাদকে শুনিয়ে তাঁর নির্দেশ চাইতেন তিনি। কিন্তু এটুকু শিক্ষাদান করতেও কিভাবে আসঘর গররাজি ছিলেন তা জ্যোতির্ময়বাবুর এই বিবৃতি থেকে বোঝা যায়—'আমি স্বরলিপি থেকে তুলে যখন যন্ত্রে বাজাতুম, ওস্তাদজী গুম্ হয়ে বসে শুনতেন। যখন ঠিক ঠিক বাজিয়ে যেতুম, তিনি কোন মন্তব্য বা প্রশংসা কিছুই করতেন না। কোন কথাই বলতেন না তখন। কিন্তু যখনই বাজনায় কোন ভুল হত, তখনই এমন ভাবে সাবাস দিতেন কিংবা তারিফ করতেন যেন আমি সঠিক এবং খুব ভাল বাজিয়েছি।'

অর্থাৎ, সোজা কথায়, 'ছাত্র'কে বিপথগামী করতে চাইতেন।

এমন কি, পুত্রহীন আসঘর আলী নিজের একমাত্র জামাতাকেও তালিম দিতে অসম্মত ছিলেন, জামাতা বাদক হওয়া সত্ত্বেও। না-শেখাবার একটি যুক্তি জানাতেন—ও এসব জিনিস ঠিক মতন হাতে তুলতে পারবে না। স্বর সব নষ্ট করে দেবে।

এ কথায় হয়তো কিছু সত্য থাকতে পারে। তিনি যে উচ্চমানের সঙ্গীত-সাধনা করতেন, স্বরের যে অতি সূক্ষ্ম কারুকর্ম তাঁর হাতে ফুটত, জামাতা হয়তো তা যথারীতি ধারণ করতে পারবেন না—এই ধারণা হয়তো একেবারে মিথ্যা নয়। কিংবা একটা অজুহাতও হতে পারে, জোর করে কিছু বলা যায় না।

জামাতা আবদুল আজিজ কিন্তু শ্বশুরের সঙ্গীত-কৃতিতে, তাঁর বাদন পদ্ধতিতে মুগ্ধ ছিলেন এবং সেই রীতি অনুসরণ করে বাজাবার আগ্রহ কিছুতেই তিনি দমন করতে পারেন নি। অথচ সাক্ষাৎ ভাবে তাঁর কাছে শিক্ষা করা সম্ভব নয়। কারণ, তিনি বহু অনুনয়-বিনয়েও শিক্ষা না দিতে অটল। এমন কি পাছে শুনে সঞ্চয় করে নেন, সেজন্যে দিনের কোন সময়ে তাঁর সামনে কখনও বাজাতেন না এবং গভীর রাত্রে চর্চা করতেন দরজা বন্ধ রেখে। তাঁর বাজনার সময়ে একমাত্র তাঁর কন্যার সে ঘরে প্রবেশাধিকার ছিল।

শেষ পর্যন্ত অন্য উপায় না দেখে আবদুল আজিজ এক অভিনব পন্থায় শ্বশুরের সঙ্গীত-সম্পদ্ আহরণ করবার চেষ্টা করলেন। আসঘর আলী যখন বাজাতেন, তাঁর কন্যা নিবিষ্টচিত্তে তা শুনে যতদূর সাধ্য মনে রাখতেন এবং পরে পিতার অনুপস্থিতিতে তা স্বামীর কাছে কণ্ঠে প্রদর্শন করতেন, অর্থাৎ গান গেয়ে সেই সব স্বর শোনাতেন। তখন তা যন্ত্রে তুলে নিতেন তাঁর স্বামী। এমনিভাবে যতদূর সম্ভব শ্বশুরের বিদ্যা আয়ত্ত করতেন আবদুল আজিজ। আসঘর আলী অনেকদিন কন্যা-জামাতার এই বিচিত্র সঙ্গীত-শিক্ষা পদ্ধতির সন্ধান পান নি। কন্যার এই ধরনের নৈপুণ্যের বিষয়ে আগে কখনও সন্দেহ জাগে নি তাঁর।

কিন্তু এই গুপ্ত উপায় একদিন ব্যক্ত হয়ে পড়ল। কন্যা-জামাতার এই অপূর্ব সঙ্গীত-চর্চার এক অসতর্ক অবস্থায় আসঘর আলী সন্ধান পেলেন ব্যাপারটির। কন্যার ওপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং ভবিষ্যতে যেন চৌর্যবৃত্তি আর কখনও না ঘটে সে বিষয়ে কঠিন ভাবে নিষেধ করে দিলেন। তারপর থেকে কন্যার সামনেও আর বাজাতেন না কোনদিন।

এই প্রায়-অবিশ্বাস্য বৃত্তান্ত আবদুল আজিজ স্বয়ং জানিয়েছিলেন বিখ্যাত

চিত্রশিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন-কে, যাঁর প্রথম জীবন অতিবাহিত হয় দ্বারবঙ্গে। উত্তরকালে যতীন্দ্রকুমার কলকাতায় বসবাস করেন এবং একজন খ্যাতনামা চিত্রশিল্পীরূপে সুপরিচিত হন। রস-সাহিত্যস্রষ্টা রাজশেখর বসুর (পরশুরাম) গড্ডলিকা, কজ্জলী, হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি সাহিত্য-কীর্তির সার্থক চিত্রকররূপেই প্রধানতঃ যতীন্দ্রকুমারের খ্যাতি। রাজশেখরের পিতার মতন যতীন্দ্রকুমারের পিতাও দ্বারবঙ্গ রাজ্যে কর্মসূত্রে বাস করায় তাঁরা প্রথম জীবনে সেখানে বাস করেছিলেন এবং কিশোর বয়স থেকেই তাঁদের পরস্পরের আলাপ পরিচয়।

দ্বারবঙ্গরাজের নতুন বাজারে যে বৃহৎ বাড়ির একাংশে ওস্তাদ আসঘর আলী স-কন্যা জামাতা থাকতেন, তারই অন্য একদিকে যতীন্দ্রকুমারও তখন ছিলেন। সেজন্যে আসঘর আলী এবং তাঁর জামাতাকে ঘনিষ্ঠভাবে তাঁর জানবার সুযোগ ঘটে। ওস্তাদজীর সঙ্গে তাঁর বিশেষ আলাপ-পরিচয়ের আর একটি কারণ—যতীন্দ্রকুমারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন এলোপ্যাথিক চিকিৎসক এবং আসঘর আলী তাঁকে মাঝে মাঝেই কান পরীক্ষা করাতেন। কান নীরোগ রাখার দিকে ওস্তাদজীর অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। সেই সুবাদে যতীন্দ্রকুমার তাঁর বাজনা শোনার সুযোগ পেয়েছেন অনেকবার, যা বাইরের কোন লোকের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল, বলা যায়।

এই লেখার শিরোনামাটি যে ঘটনার ইঙ্গিত দেয়, তার বিবরণ দিয়েছিলেন শিল্পী যতীন্দ্রকুমার। এবার সেই বৃত্তান্ত সেন মহাশয়ের জবানীতেই এখানে বিবৃত করা হল :

সে এখন থেকে প্রায় ৬০ বছর আগেকার কথা। আমার বয়স তখন বোধ হয় ২০।২১ বছর হবে। সে সময় আমি কলকাতায় বাস আরম্ভ করেছি বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে দ্বারভাঙ্গায় যাই। সেখানে গেলে খাঁ সাহেবের বাজনা এক-একদিন তাঁর ঘরে গিয়ে শুনি। তাঁর তখন বয়স বোধ হয় ৬৫।৬৬-র কম হবে না।

আমার তাঁকে খুব কাছে থেকে দেখবার সুযোগ হয়েছিল, একই বাড়ির দুদিকে থাকবার জন্যে শুধু নয়, আমার দাদাকে (ডাক্তার সুশীল সেন) তিনি প্রায়ই কান দেখাতে আসতেন। না হলে তাঁর দেখা পাওয়া শক্ত ছিল। প্রায় সারা রাত তিনি তাঁর ঘরে আপন মনে বাজাতেন, সেখানে কোন শ্রোতা তাঁর থাকত না। আমি তাঁর ঘরে বাজনা শুনেছি অন্য সময়ে। সারাদিনের মধ্যে প্রায় তিনি বাড়ি থেকে বেরুতেন না, দরবারে যাওয়া ছাড়া। বাড়ির মধ্যেই বেশীর ভাগ সময় থাকতেন।

একদিন সকালবেলা বেড়াতে বেড়াতে তাঁর ঘরের সামনে এসে পড়েছি। দেখি, খাঁ সাহেব বাইরে বেরিয়েছেন। ফিরে এসে দাদাকে বললুম, 'খাঁ সাহেবকে তাঁর ঘর থেকে বেরুতে দেখলুম।' দাদা শুনে বললেন, 'তা হলে বোধ হয় কান দেখাতে আসবেন আজ।' আমি তখন আবার আসঘরের কাছে গিয়ে বললুম, 'ওস্তাদজী, একটু বাজনা শোনাতে হবে।' বলে তিনি কিছু বলবার আগেই, তাঁর সুরচয়ন যন্ত্রটি তাঁর ঘর থেকে নিয়ে এলুম।

আমার সঙ্গে তখন যোগ দিয়েছিলেন সামনের বাড়ির উকিল জ্ঞানবাবু, তিনিও ছিলেন আমার মতন খাঁ সাহেবের বাজনার ভক্ত। আমরা দুজনে খাঁ সাহেব এবং তাঁর যন্ত্রকে সঙ্গে নিয়ে দাদার কাছে এলুম।

ওস্তাদজী তখন দাদাকে বললেন, 'দেখুন তো, আপনার ভাই আমার যন্ত্র নিয়ে চলে এসেছে। বলছে, বাজনা শোনাতে হবে।' দাদা হাসতে হাসতে বললেন, 'তা বেশ তো, শুনিয়ে দিন না বাজনা।' বলে, ওস্তাদজীর কান পরীক্ষা করতে চাইলেন এবং তিনিও কান দেখালেন যথারীতি। তারপর আমাদের অনুরোধে আমাদের ঘরে বসে সুরচয়ন হাতে তুলে নিলেন।

ঘরের মধ্যে শ্রোতা শুধু আমরা তিনজন। তিনি সুর বেঁধে নিয়ে বাজাতে আরম্ভ করলেন—খাম্বাজ। সে মিষ্টি হাতের বাজনার কথা আমি আর কি বলব। তিনি তন্ময় হয়ে বাজাচ্ছেন, আমরাও একমনে শুনছি। খানিকক্ষণ খাম্বাজের আলাপ করে ওস্তাদজী গৎ ধরলেন, যদিও সঙ্গত করবার কেউ ছিল না সেখানে, আর সঙ্গত হয়ও নি। তিনি আপন মনে খাম্বাজের একটি গৎ বাজাতে লাগলেন। যন্ত্রের পর্দায় পর্দায় তাঁর দক্ষ অঙ্গুলি চালনা দেখছি আর শুনছি কি আশ্চর্য সুরের কাজ ফুটে উঠছে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে তাঁর হাতে খাম্বাজ শুনলুম। তার পর হঠাৎ তিনি যন্ত্রের কান (ক'টা তা লক্ষ্য করি নি) মুচড়ে দিলেন বাঁ-হাতে। ডান-হাত আগের মতই চলছিল। কিন্তু কান মোচড়াবার সঙ্গে সঙ্গে খাম্বাজ বন্ধ হয়ে গিয়ে হঠাৎ শোনা গেল ভৈরবী। ভৈরবীতে কখন তিনি আলাপ আরম্ভ করে দিলেন, প্রথমটা ধরতেই পারি নি। প্রায় চোখের পলকের মধ্যেই রাগ বদল হয়ে গিয়েছিল। খাম্বাজের বদলে ভৈরবী বাজতে লাগল।

ব্যাপারটা বেশ আশ্চর্যের। কারণ খাম্বাজ শেষ করে তিনি যন্ত্রের কোন পর্দা সরালেন না। রে কিংবা ধা পর্দা সরিয়ে কোমল করলেন না, দেখলুম। খাম্বাজ বাজাবার সময় ঠাট যেমন ছিল, এখনও তেমনি রইল। অথচ খাম্বাজ থেকে হল ভৈরবী। কান মুচড়ে চট্‌ করে সুর পাল্‌টে দেবার ফলেই ভৈরবী

বাজানো সম্ভব হয়েছিল। না হলে আর কি করে হবে, বুঝতে পারি না। Scale change-এর মতন কিছু একটা ব্যাপার খুব কায়দা করে তাড়াতাড়ি করে নিয়েছিলেন।

ব্যাপারটা জানবার জন্যে বড় কৌতূহল হল। কিন্তু বাজনা চলবার সময়ে তো আর জিজ্ঞেস করতে পারি না। আর সে কি চমৎকার ভৈরবীই বাজাতে লাগলেন। সেই সুরের মধ্যে বাধা দিয়ে কোন কথাই বলা চলে না। আমরা ভৈরবী শুনলুম বেশ খানিকক্ষণ ধরে।

তার পর ভৈরবী শেষ করে তিনি আর কিছু বাজালেন না। বেলা তখন অনেকখানি গড়িয়ে গেছে। বাজনা থামিয়ে তিনি যখন যন্ত্রটি বুক থেকে নামিয়ে রাখলেন, আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'ওস্তাদজী, পর্দা সরালেন না, অথচ কি করে খাম্বাজ থেকে ভৈরবী হল?'

খাঁ সাহেব কিন্তু ব্যাখ্যা করে দিলেন না। কাঁধ-ঝাঁকুনি দিয়ে শুধু সংক্ষেপে বললেন, 'হো গিয়া।'

কালে খাঁ বনাম ইম্‌দাদ খাঁ

হেদুয়া পুকুরের উত্তরে, বীডন স্ট্রীটের ওপর সেই বাড়িটি আজও দাঁড়িয়ে আছে। যেন অতীত ঐশ্বর্যের নীরব সাক্ষী।

অট্টালিকাটি যে একদা সমৃদ্ধ ছিল, তার দিকে দৃষ্টিপাত করলেই সেকথা বোঝা যায়। সেই সমৃদ্ধি নিছক আর্থিক হলে, উল্লেখ করবার প্রয়োজন হত না। সঙ্গীতচর্চার জন্যেই এই গৃহের কথার এখানে অবতারণা।

এখানে এত ভারত-বিখ্যাত গুণীর সমাগম ঘটেছে, এমন উচ্চাঙ্গের আসর বসেছে, এত স্বনামধন্য কলাবত অবস্থান করেছেন যে, এই ভবনকে সঙ্গীত-জগতের এক তীর্থক্ষেত্র বলা যায়। বিশ শতকের প্রথম পাদেও সঙ্গীতচর্চার আদর্শ আবহ এখানে বিদ্যমান ছিল। বাড়িতে তখন তারাপ্রসাদ ঘোষের আমল।

তারাপ্রসাদ শুধু সঙ্গীতপ্রেমী ছিলেন না। তাঁর তুল্য সঙ্গীতজ্ঞদের পৃষ্ঠপোষক আর সঙ্গীতসেবক অল্পই ছিলেন কলকাতায়। পশ্চিম থেকে যত বড় বড় ওস্তাদ শহরে এসেছেন, কিংবা এখানকার যাঁরা খ্যাতিমান হয়েছেন, তাঁদের প্রায় সকলেরই গান-বাজনার আসর ঘোষ মশায় বসিয়েছেন এই বাড়িতে।

গুণী কলাবতেরা বাড়ির আসরে সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন, তা-ই সব নয়। তারাপ্রসাদ অনেক বড় বড় গুণীদের এখানে আশ্রয় দিয়েছেন, ফলে পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গীতবিদ্যা বাংলাদেশে বিস্তারলাভের কিছু কিছু সুযোগ পেয়েছে। এখানকার সঙ্গীতচর্চাকে প্রকারান্তরে সাহায্য করেছে। কালে খাঁর তুল্য খেয়ালগায়ক, ইম্‌দাদ খাঁর মতন সেতার-সুরবাহারবাদক, দৌলৎ খাঁর মতন ধ্রুপদী প্রভৃতি এই বাড়িতে অবস্থান করে গেছেন তারাপ্রসাদের আমলে। কেউ কয়েক মাস, কেউ বছর খানেক, কেউ বছরের পর বছর।

এসব হল পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেকার কথা। তারও আগে, তখন থেকে আরও পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে গেলে এ বাড়ির আরও একটা গৌরবের যুগ পাওয়া যায়। বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক কর্মচাঞ্চল্যের একটি পর্ব। সে হল উনিশ শতকের প্রায় মাঝামাঝি সময়। তখন এখানকার ঘোষ-পরিবারের বিখ্যাত পুরুষ ছিলেন কাশীপ্রসাদ ঘোষ, তারাপ্রসাদের পিতামহ। কাশীপ্রসাদের জন্ম খিদিরপুর হলেও, কর্মক্ষেত্র আর বাসস্থান ছিল এই বীডন স্ট্রীটের ভবন।

উনিশ শতকের প্রসিদ্ধ ইংরেজী পত্রিকা Hindu Intelligencer-এর সম্পাদক কাশীপ্রসাদ ঘোষ। অনেক গুণের আধার কাশীপ্রসাদ তখনকার শিক্ষিত সমাজে একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। Hindu Intelligencer সম্পাদনে কৃতিত্বের পরিচয় তো তিনি দেনই। তা ছাড়া ইংরেজী রচনার জন্যেও তাঁর সুনাম ছিল। "সঙ্গীত-তরঙ্গ"-প্রণেতা রাধামোহন সেনের রচনা অনেক ভাল গান ইংরেজীতে অনুবাদ করে প্রচার করেন তিনি। কাশীপ্রসাদ সঙ্গীতজ্ঞ এবং নিজেও একজন উৎকৃষ্ট গান-রচয়িতা ছিলেন। শুদ্ধ সুরে এবং টপ্পা অঙ্গে রচিত তাঁর বাংলা গানের জনপ্রিয়তা ছিল সেকালে এবং তাঁর মৃত্যুর পরেও। নিধুবাবুর জীবিত কালেই তাঁর প্রথম জীবন কাটে। সেজন্যে নিধুবাবুর যুগপ্রভাব অনিবার্যভাবে তাঁর রচনায় পড়েছিল। কিন্তু তা হলেও কাশীপ্রসাদের গানের আদর ছিল। ৩০০-র বেশি গান তিনি রচনা করেন। এবং তাঁর মৃত্যুর প্রায় বিশ বছর পরে প্রকাশিত কয়েকটি সঙ্গীত-সংকলন গ্রন্থে তাঁর গান স্থান পায়। যথা, "সঙ্গীতসার-সংগ্রহ" দ্বিতীয় পর্বে ৪টি, "বাঙ্গালীর গান" পুস্তকে ২৫টি, ইত্যাদি। এ থেকেও বোঝা যায়, কাশীপ্রসাদ গান-রচয়িতারূপে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন।

কাশীপ্রসাদের কথা সবিস্তারে বলবার দরকার নেই। তাঁর সঙ্গীতজীবনের কথা বিশেষ জানাও যায় না। তিনি অতি রূপবান পুরুষ ছিলেন—প্রতিকৃতিতে যার চিহ্ন আজও আছে—এ কথাটি উল্লেখ করে তাঁর প্রসঙ্গ শেষ করা হল

তাঁর পৌত্র তারাপ্রসাদ এবং সে আমলের সঙ্গীতচর্চার কথাই আসলে আমাদের আলোচনার বিষয়।

উত্তরাধিকারসূত্রে তারাপ্রসাদ সঙ্গীতপ্রীতি পেয়েছিলেন। তাঁর বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত হয় সঙ্গীতের পীঠস্থান বারাণসীতে। সেখানে অতি অল্প বয়স থেকেই গুণীদের সঙ্গে তাঁর সংস্রব ঘটে। আর সেই কিশোর বয়স থেকে তাঁর সঙ্গীতশিক্ষার সূত্রপাত কাশীতে। ধ্রুপদ দিয়েই তাঁর সঙ্গীতের পাঠ আরম্ভ হয়। তবে ওস্তাদ হবার জন্যে রীতিমত কঠিন সাধনা করে তিনি সঙ্গীতচর্চায় অগ্রসর হন নি। নচেৎ সিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ বলে দেশে সুপরিচিত হতে পারতেন, সারা জীবন এমন গুণী সংসর্গ তিনি করেছিলেন। আর করেছিলেন সেই কৈশোর থেকে।

শখ করে শিখতেন যতখানি ভাল লাগে। শুনতে ভালবাসতেন তার চেয়ে অনেক বেশি। আর সঙ্গীতপ্রেমে গুণীসঙ্গও করতেন কম নয়।

ছেলেবেলায় তারাপ্রসাদ কাশীতে থাকতেন দিদিমার কাছে। সেখানেই তাঁর সঙ্গীতচর্চা ও সঙ্গীতজীবনের আরম্ভ। ধ্রুপদাচার্য রামদাস গোস্বামীকে প্রথম গুরুরূপে পেলেন। গোস্বামী মশায় বাঙ্গালী এবং শ্রীরামপুরের বিখ্যাত গোস্বামী-পরিবারের সন্তান। জীবনের শেষ প্রায় ২০ বছর কাশীবাস করেছিলেন এবং সেখানেই তাঁর জীবনাবসান হয়। রামদাস গোস্বামী ছিলেন সেকালের একজন শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদ-গায়ক। প্রসিদ্ধ ধ্রুপদী রসুল বক্‌স্ (অঘোর চক্রবর্তীর ওস্তাদ আলী বক্‌সের ভ্রাতা)-এর কাছে দীর্ঘকাল ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে ধ্রুপদ শিক্ষা করেছিলেন রামদাস। এবং তিনিই ছিলেন রসুল বক্‌সের শ্রেষ্ঠ শিষ্য। রসুল বক্‌সের ঘরানা ধ্রুপদের এমন সঞ্চয় রামদাস ভিন্ন আর কারও ছিল না। গোস্বামী মশায়েরও কয়েকজন শিষ্য হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন—কাশীর হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। রামদাস গোস্বামীর সঙ্গীতসম্পদ যোগ্য উত্তরাধিকারী হয়ে হরিনারায়ণই লাভ করেছিলেন। তার পরিচয় পাওয়া যায় হরিনারায়ণের "সঙ্গীত গুরুপ্রসাদ," "ধ্রুপদ-সঙ্গীত স্বরলিপি" গ্রন্থমালায়। তারাপ্রসাদ ঘোষ তাঁর কৈশোরে সেই হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের গুরুভাই ছিলেন। দুজনেই কাশীতে তখন রামদাস গোস্বামীর শিষ্য।

হরিনারায়ণ একাদিক্রমে দশ বছর ধ্রুপদ শিক্ষা করলেন রামদাসের কাছে। কিন্তু তারাপ্রসাদ কিছুদিন পরে আর এক গুণীর সঙ্গ লাভ করলেন। তাও কাশীতে। তারাপ্রসাদের এই দ্বিতীয় সঙ্গীতাচার্য হলেন আলী মহম্মদ খাঁ। তিনি তানসেনের পুত্র-বংশীয় বিখ্যাত গুণী বাসৎ খাঁর পুত্র এবং রবাবী মহম্মদ

আলী খাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। আলী মহম্মদ সঙ্গীতজগতে বড়্‌কু মিয়াঁ নামে সুপরিচিত ছিলেন। রবাবী ও সুরশৃঙ্গারবাদক বড়্‌কু মিয়াঁ তাঁর কালে সমগ্র হিন্দুস্থানের এক শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ বলে সুপ্রসিদ্ধ হন। নেপাল রাজদরবারে ও কাশী নরেশের সঙ্গীতসভায় তিনি সসম্মানে যুক্ত ছিলেন জীবনের অধিকাংশ সময়। অপুত্রক বড়্‌কু মিয়াঁর শিষ্য-গৌরবও কম ছিল না। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর বাদক বলে খ্যাতিমান হন। যেমন জলন্ধরের সৈয়দ মীর। তিনি বড়্‌কু মিয়াঁর কাছে সুরশৃঙ্গারে আলাপ-পদ্ধতি ও ঘরানা ধ্রুপদ পেয়েছিলেন। বিখ্যাত খেয়াল-গায়ক রামসেবক মিশ্র (পশুপতি ও শিবসেবকের পিতা) সেতার শিক্ষা করেন বড়্‌কু মিয়াঁর কাছে। নান্নে খাঁ বীণ্‌কার ও সেতারী প্যারে নবাব খাঁও তাঁর (বড়্‌কু মিয়াঁর) শিষ্য ছিলেন। কাশীর বিখ্যাত বীণাবাদক মিঠাইলাল সাদিক আলী খাঁর শিষ্য হলেও বড়্‌কু মিয়াঁর কাছে অনেকদিন শিক্ষা পান। কাশীর সুরশৃঙ্গার-বাদক পান্নালালও বড়্‌কু মিয়াঁর শিষ্যদের মধ্যে গণ্য।

তারাপ্রসাদ বড়্‌কু মিয়াঁর কাছে যন্ত্রালাপ ও ধ্রুপদ গান শিক্ষার সুযোগ পান, মিয়াঁ সাহেবের শেষ জীবনে কাশীবাসের সময়। তখন তারাপ্রসাদ প্রায় প্রতিদিন বড়্‌কু মিয়াঁর বাজনা শোনবার সৌভাগ্য লাভ করতেন। খুব সম্ভব তারাপ্রসাদই তাঁর একমাত্র বাঙ্গালী শিষ্য। ওস্তাদজীর অন্য কোন বাঙ্গালী শিষ্যের কথা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না।

বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মশায় (তাঁর "হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান" পুস্তকে) লিখেছেন যে, "রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর বড়্‌কু মিয়াঁর অতি প্রিয় শিষ্য ছিলেন। ঠাকুর মহোদয়ও গুরুর ন্যায় বড়্‌কু মিয়াঁকে অতীব শ্রদ্ধা করতেন। কাশীধামে ও কলিকাতায় রাজা বাহাদুর দীর্ঘকাল বড়্‌কু মিয়াঁর নিকট সঙ্গীতবিদ্যা ও যন্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করে যথার্থভাবে আয়ত্ত করেছিলেন।"

বড়্‌কু মিয়াঁর কাছে রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের এই সঙ্গীতশিক্ষার কথা সঠিক নয়। শৌরীন্দ্রমোহন এবং বড়্‌কু মিয়াঁর মধ্যে কোনদিন সাক্ষাৎ ঘটেছিল কি না সন্দেহ। রায়চৌধুরী মহাশয় এ বিষয়ে ভুল সংবাদ পেয়েছেন। কারণ শৌরীন্দ্রমোহন কোনদিন কাশীতে যান নি। বড়্‌কু মিয়াঁও কখনও কলকাতায় আসেন নি। শৌরীন্দ্রমোহনের সঙ্গীতগুরু ছিলেন ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্র এবং সাজ্জাদ মহম্মদ, সেকথা তাঁর প্রসঙ্গে যথাস্থানে বলা হয়েছে। বড়্‌কু মিয়াঁর কাছে শৌরীন্দ্রমোহনের শিক্ষার কথা অন্য কোন সূত্রেও জানা যায় না। বিষয়টির গুরুত্ব আছে, তাই উল্লেখ করা রইল।

তারাপ্রসাদ কাশীতে রামদাস গোস্বামী ও আলী মহম্মদ খাঁ ভিন্ন অন্য অনেক ওস্তাদের গান-বাজনার সঙ্গেও পরিচিত হয়েছিলেন। কারণ তখন বহু গুণীর সমাগম ও অবস্থান ছিল কাশীতে। তবে গোস্বামী মশায় ও বড়্‌কু মিয়াঁ ভিন্ন আর কারও সঙ্গ তারাপ্রসাদ শিষ্যরূপে করেন নি। এবং তাঁদের দুজনের, বিশেষ বড়্‌কু মিয়াঁর সঙ্গীত অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে শোনবার সুযোগ তাঁর হয়।

তার পর কাশীর পালা শেষ করে এক সময়ে কলকাতায় এলেন তারাপ্রসাদ। বীডন স্ট্রীটের এই বাড়িতে বাস করতে লাগলেন। এখানে এসে প্রথম যৌবন থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত কয়েকজন মহাগুণীর তিনি সঙ্গ করলেন কখনও শিষ্যরূপে, কখনও পৃষ্ঠপোষকরূপে। তাঁদের মধ্যে প্রথম জীবনে পেলেন স্বনামধন্য উজীর খাঁকে। তানসেনের কন্যাবংশে আধুনিক কালের সঙ্গীতরত্ন উজীর খাঁ।

উজীর খাঁকে অবলম্বন করে তানসেন বংশের সঙ্গীত ধারার ত্রিবেণীসঙ্গম এ যুগে ঘটেছিল। কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের বিভিন্ন ধারার সম্পদ তিনি লাভ করেন উত্তরাধিকারসূত্রে। একদিকে তিনি সদারঙ্গ-বংশে বীণ্‌কার ওমরাও খাঁর পৌত্র ও আমীর খাঁর পুত্র। আবার তাঁর মাতার বংশসূত্রে তিনি তানসেনের পুত্র-বংশের দৌহিত্র। উজীর খাঁর জননী ছিলেন (জাফর খাঁর পুত্র) কাজাম্‌ আলী খাঁর কন্যা এবং রবাব-সিদ্ধ কাসিম্‌ আলী খাঁর ভগিনী। এই দুই সূত্রে উজীর খাঁ তানসেনের পুত্র ও কন্যাবংশের কণ্ঠে ও যন্ত্রে বহু ঘরানা বিদ্যা অর্জন করেন। সুরশৃঙ্গার, রবাব ও বীণ, আলাপ ও গীতাঙ্গ, ধ্রুপদ ও হোরি ধামার ইত্যাদিতে ঘরানা তালিম পান তিনি। পিতা আমীর খাঁ আর কাকা রহিম খাঁর কাছে বীণা ও কণ্ঠসঙ্গীত, মাতামহের ভাই নিসার আলী খাঁ ও তাঁর জ্ঞাতি-ভাই বাহাদুর সেনের কাছে রবাব সুরশৃঙ্গার শিক্ষা করেন উজীর খাঁ। বাল্যকাল থেকে এই সব শিক্ষালাভ আরম্ভ করে তিনি সাধনায় অগ্রসর হতে থাকেন ব্রতের নিষ্ঠায়। তার ফলে তিনি সেনী-সঙ্গীতের অমন বিরাট আধার হয়েছিলেন। সমগ্র হিন্দুস্থানে তিনি মহাগুণী বলে বন্দিত।

রামপুরে তাঁর জন্ম। প্রথম জীবনও সেখানে কাটে। তাঁর প্রথম সঙ্গীত-শিক্ষাও সেখানে রামপুর ঘরানার দুই প্রবর্তক আমীর খাঁ ও বাহাদুর সেনের কাছে। তাঁদের মৃত্যুর পর প্রথম যৌবনে তিনি বারাণসীতে নিশার আলী খাঁর তালিম পান। তার পর পরিণত প্রতিভা নিয়ে আসেন কলকাতায়। এখানে ক'বছর থাকবার পর রামপুর নবাব একরকম জোর করেই উজীর খাঁকে রামপুরে

নিয়ে যান এবং সেখানেই তাঁর জীবনের অবশিষ্ট কাল সসম্মানে ও সগৌরবে অতিবাহিত হয়।

তিনি কলকাতায় অবস্থানের সময় কয়েকজন বাঙ্গালী তাঁর কাছে শিক্ষার দুর্লভ সুযোগ পান। তাঁরা হলেন—ভবানীপুরের প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সুরশৃঙ্গার-বাদক), পঞ্চেৎগড়ের যাদবেন্দ্রনন্দন মহাপাত্র (সুরবাহার-বাদক), সিমলার অমৃতলাল দত্ত (হাবু দত্ত নামে সুপরিচিত, স্বামী বিবেকানন্দের জ্ঞাতি-ভাই এবং ক্লারিওনেট ও এস্রাজ-বাদক) প্রভৃতি। তারাপ্রসাদ ঘোষও সে সময় উজীর খাঁর শিষ্য-স্থানীয় হয়ে তাঁর সঙ্গ লাভ করতেন। আলাউদ্দিন খাঁ তখনও কলকাতায় আসেন নি শিক্ষার্থী হয়ে। উজীর খাঁর তালিম তিনি পরে পেয়েছিলেন, রামপুরে। হাবু দত্ত পরেও রামপুরে খাঁ সাহেবের তালিম নিতে গিয়েছিলেন, এ কথা হাবু দত্তের এক শিষ্যের মুখে শোনা যায়।

তারাপ্রসাদ উজীর খাঁর উক্ত শিষ্যদের মতন নিয়মিত সঙ্গীত সাধনা করেন নি। তিনি খাঁ সাহেবের তৈরি শিষ্য ছিলেন না। তবে তাঁর সঙ্গীতের ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করেন শিষ্যতুল্য হয়ে। খাঁ সাহেব কলকাতায় থাকবার সময় তারাপ্রসাদ তাঁর সঙ্গীত শোনবার খুবই সুযোগ পেতেন।

উজীর খাঁ কলকাতা থেকে চলে যাবার পর তারাপ্রসাদ আর বড় একটা কোন ওস্তাদের শিষ্যরূপে সঙ্গ করতেন না। সঙ্গীতপ্রেম তাঁর কিন্তু কখনও কমে নি। বরং উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। ওস্তাদ-সংসর্গও ভালভাবেই হতে থাকে তাঁর। বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত-সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষা তাঁর আরও চরিতার্থ হয়। সঙ্গীত-সাধনার পথে না গিয়ে সঙ্গীতের সেবা আরম্ভ করেন অন্যভাবে। সঙ্গীতশিক্ষার্থী থেকে ক্রমে সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক হন। সঙ্গীতজ্ঞদের পৃষ্ঠপোষক বললেই সঠিক হয়। প্রচুর অর্থব্যয়ে গুণীদের এই বাড়িতে আসর বসান, আশ্রয় দেন। এইভাবে তাঁর সঙ্গীতের সেবা চলে। বাড়িতে সঙ্গীতের সদাব্রত।

অনেক জলসা এখানে তখন হয়ে গেছে। অনেক বড় বড় গাইয়ে-বাজিয়ে এ বাড়ির আসর মাৎ করেছেন। মুজ্‌রো পেয়ে উপকৃত হয়েছেন। তাঁদের সঙ্গীতে তৃপ্তি পেয়েছেন শ্রোতারা। যে ওস্তাদদের তারাপ্রসাদ বাড়িতে আশ্রয় দিতেন, তাঁরাও যেমন লাভবান হতেন, তেমনি আবার হতেন বাংলার শিক্ষার্থীরা। দৌলৎ খাঁর মতন ধ্রুপদ-গুণী এক সময়ে তারাপ্রসাদের আশ্রয় পেয়ে বাংলাদেশে বাস করেছিলেন। তার ফলে দৌলৎ খাঁর কাছে যাঁরা সঙ্গীত-বিষয়ে লাভবান হন, তাঁদের মধ্যে একজন হলেন অঘোরনাথ চক্রবর্তী। অঘোরবাবুর প্রধান ওস্তাদ অবশ্য আলী বক্স।

ইমদাদ্‌ খাঁকে তারাপ্রসাদ সপরিবারে এই বীডন স্ট্রীটের বাড়িতে প্রায় দশ বছর রেখেছিলেন। ইমদাদ্‌ তাঁর সঙ্গীত সাধনার জন্যে এই বাড়ির কাছে, তারাপ্রসাদের কাছে সবিশেষ ঋণী। তাঁর কৃতী পুত্র এনায়েৎ খাঁর সঙ্গীতশিক্ষার পর্ব অনেকাংশে এখানেই উদ্‌যাপিত হয়। আধুনিক কালের বাংলাদেশে সেতার বাদ্যের প্রচলনে এনায়েৎ খাঁর অবদান বিশেষ স্মরণীয়। তারাপ্রসাদের ইমদাদ্‌ খাঁকে সপরিবারে পৃষ্ঠপোষকতা তার কিছু পরিমাণও সহায়তা করেছিল।

বড়ে গোলাম আলীর প্রথম ওস্তাদ ও পিতৃব্য কালে খাঁ তারাপ্রসাদের আশ্রয়ে এক বছরেরও বেশি বাস করেছিলেন। আরও বহুদিন হয়তো তিনি থাকতেন, কিন্তু একটি দিনের ঘটনায় তিনি চলে যান এখান থেকে। সেই ঘটনাটিই এ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু এবং তা যথাসময়ে বলা হবে।

এই সব স্বনামধন্য ওস্তাদ এবং আরও অনেক গুণীকে নিয়ে তারাপ্রসাদের বাড়ির আসর প্রায় নিয়মিত সুর-মুখরিত থাকত। সে আমলে বাড়ির আসরও তৈরি হত বিচিত্র উপায়ে। আসর সাজানর কথায় সে বাড়ির সদর মহলের বর্ণনা একটু করবার আছে। বাড়ির ফটক দুটির পরে একটু খোলা জমি। তার পর মূল বাড়ি। বাড়ির সদর দিয়ে প্রবেশ করলে দুপাশে বেশ চওড়া উঁচু চাতাল, দালানের মতন পূব-পশ্চিমে বিস্তৃত। সেই দুই চাতালকে দুদিকে ভাগ করে মাঝখান দিয়ে পথ চলে গেছে, সদর থেকে অন্দরের দিকে। জলসার সময়ে, মাঝের এই নীচু পথটির ওপর, কাঠের মজবুত মঞ্চ তৈরি করে দেওয়া হত, দুদিকের উঁচু চাতালের সমতল করে। তার পর সমস্ত স্থানটি জুড়ে, কাঠের প্ল্যাটফর্ম ও দুদিকের চাতাল নিয়ে, সতরঞ্চ চাদর ইত্যাদি বিছান হত। এমনিভাবে গড়ে উঠত এখানকার সঙ্গীতের আসর। জমকালো আর সুপরিসর।

এ আসরে ইমদাদ্‌ খাঁর বাজনা হয়েছে সবচেয়ে বেশি। কারণ তিনি সবচেয়ে দীর্ঘকাল এই বাড়িতে বাস করেছিলেন।

দক্ষিণমুখী বাড়ির সামনেকার দুই প্রান্তে, পূব ও পশ্চিমে, যে দুটি মাঝারি আকারের ঘর দেখা যায়—সেখানেই এই দুই সঙ্গীত-সাধকের (কালে খাঁ ও ইমদাদ্‌ খাঁ) অধিষ্ঠান ছিল। পশ্চিম দিকের ঘরটিতে থাকতেন কালে খাঁ। আর পূবদিকে ইমদাদ্‌ খাঁ। সদর দেউড়ি দিয়ে বাড়িতে ঢুকতে বাঁ-দিকের শেষে কালে খাঁর ঘর। ডানদিকের প্রান্তে ইম্‌দাদের আস্তানা। বাড়ির সদর মহলের দুটি প্রান্ত। সদর দিয়ে এসে, বাঁ-দিকের ক'ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে সেই চাতাল পার হয়ে কালে খাঁর ঘরে পৌঁছতে হয়। আর ডানদিকের ধাপ ক'টি উঠে ইমদাদ্‌ খাঁর ঘরে যেতে হয় চাতালের শেষে।

কালে খাঁর ঘরে যাবার ওই একটি পথ। কিন্তু ইমদাদ্ খাঁর ওই ঘরটিতে যাবার অন্য রাস্তাও আছে। তিনি বাইরের ঘরখানির সঙ্গে অন্য ঘরও পান। কারণ তাঁর বাস সপরিবারে। তবে পুব-প্রান্তের ওই ঘরেই তিনি রেওয়াজ করতেন।

আর কালে খাঁ একা। সঠিক জানা যায় না, তিনি অকৃতদার কিংবা বিপত্নীক। খুব সম্ভব, প্রথমটি। তাই তারাপ্রসাদ তাঁর থাকবার জন্যে ওই পশ্চিম-প্রান্তের ঘরটির ব্যবস্থা করেন। আর ইমদাদের জন্যে পুবদিকের অংশ, তার সামনেকার ঘরটি তাঁর রেওয়াজের। সে ঘরে যেতে হলে, বাড়ির সদর দিয়ে না গেলেও চলে। সেখানে যাতায়াতের অন্য পথও আছে। বিশেষ, কালে খাঁর ঘরের কাছে কখনই যেতে হয় না ইমদাদ্‌কে।

কিন্তু কালে খাঁর বেলা তা নয়। বাড়ির পুব দিকের ফটকের সামনেই, বাড়ির দক্ষিণ-পুব কোণে ইম্‌দাদের রেওয়াজের ঘর। সেই ফটক দিয়ে বাড়িতে যেতে গেলে ইম্‌দাদের ঘর পার হয়ে যেতে হয়। তার পর সদর দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলে, ডান-দিকের অদূরে ইম্‌দাদের ঘর। বাঁ-দিকে ক'ধাপ উঠে কালে খাঁ নিজের ঘরের দিকে, বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের ঘরে চলে যেতে পারেন। কিন্তু সেদিকে ইম্‌দাদকে কখনও যেতে হয় না। কালে খাঁর ঘর থাকে ইম্‌দাদের নাগালের একরকম বাইরে।

বাড়ির ভৌগোলিক বৃত্তান্ত সবিস্তারে দেবার কারণ আছে। তাই এত কথা বলা হল। পরে এই বিবরণ প্রয়োজনে আসবে।

ওস্তাদ কালে খাঁ ও ইম্‌দাদ খাঁ এ অধ্যায়ের দুই নায়ক। তাঁদের সেই নাটকীয় ঘটনাটি বর্ণনা করবার আগে, দুজনের কিছু পরিচয় দেওয়া দরকার। শুধু ভূমিকা হিসেবে নয়, জানবার জন্যেও।

কালে খাঁর জীবন-কথা কিন্তু সবিশেষ জানা যায় না। তিনি যেমন খেয়ালী প্রকৃতির ছিলেন, তাঁর জীবনও তেমনি রহস্যে আচ্ছন্ন। সে রহস্য-জাল ছিন্ন করে তাঁর পূর্ব বৃত্তান্ত অতি সামান্যই পাওয়া গেছে। মাত্র এই ক'টি তথ্য জানা যায় তাঁর বিষয়ে। তিনি ছিলেন পাঞ্জাবের বাসিন্দা। তাঁদের পরিবার পুরুষানুক্রমে সঙ্গীত-ব্যবসায়ী। তাঁর সঙ্গীতশিক্ষাও হয় আপন বংশে। তাঁর 'ঘরকা তালিম'। তা হল বিখ্যাত আলিয়াফত্তুর ঘরানা। কালে খাঁর নিজের সন্তান বলতে কেউ নেই। সম্ভবতঃ তিনি অবিবাহিত ছিলেন। তবে দেশে থাকতে তিনি তালিম দেন তাঁর প্রতিভাবান ভ্রাতুষ্পুত্রকে, যিনি আজ বড়ে গোলাম আলী খাঁ নামে সঙ্গীতজগতে সগৌরবে বর্তমান। তবে শোনা যায়,

গোলাম আলী কালে খাঁর রীতি-পদ্ধতি ও চালে গান করেন না। কালে খাঁর কাছে যেমন তালিম তিনি পেয়েছিলেন, তার থেকে স্বতন্ত্র ও স্বকীয়ভাবে তিনি সাধারণতঃ আসরে গেয়ে থাকেন। কালে খাঁর চাল তাঁর দেহপটের সঙ্গেই চিরকালের জন্যে লুপ্ত হয়ে গেছে। তাঁর গানের কোন রেকর্ড না হওয়ায় তার সামান্য চিহ্নও আর নেই। অথচ রেকর্ডের যুগ বেশ কিছুদিন আরম্ভ হবার পরেও তিনি তাঁর পূর্ণ সঙ্গীত-প্রতিভা ও কণ্ঠসম্পদ্ নিয়ে বর্তমান ছিলেন। কলকাতাতেও তিনি বাস করেছিলেন কয়েক বছর এবং সে সময়ে গ্রামোফোন কোম্পানী ব্যবসায়ের দিক্ থেকে সুপ্রতিষ্ঠিত। কালে খাঁর সমসাময়িক অনেক গায়ক-গায়িকার—বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী গানের রেকর্ড এই কলকাতাতেই হয়েছিল। কিন্তু কালে খাঁর গান রেকর্ড করবার কথা কেউ চিন্তা করে নি। আর শিল্পী স্বয়ং ছিলেন অতিশয় অন্যমনস্ক ও খামখেয়ালী প্রকৃতির। তাঁর নিজের দিক থেকে এ বিষয়ে কোনপ্রকার উদ্‌যোগ বা তৎপরতা ছিল না। তাই ভাবীকাল এই সঙ্গীত সম্পদের উপভোগ থেকে চিরকালের জন্যে বঞ্চিত হয়ে রইল।

কালে খাঁ সে-যুগের সঙ্গীত-সমাজে প্রখ্যাত ছিলেন খেয়াল গানের গুণী বলে, যদিও সঙ্গীত বিষয়ে তাঁর অন্য কৃতিত্বও ছিল। সে কথা পরে আসবে।

খেয়াল-গায়করূপে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী তখন বেশি ছিলেন না। তাঁর গান খুব সুদূর অতীতের ব্যাপার নয়, সঙ্গীত-সমাজের শ্রুতিস্মৃতিতে এখনও তার রেশ একেবারে বিলীন হয়ে যায় নি। বছর পঞ্চাশেক আগে তিনি কলকাতায় বাস করে গেছেন। তাঁর গান ভালভাবে শুনেছেন, এমন ব্যক্তির এখনও অভাব হয় নি।

কালে খাঁ কত বড় সঙ্গীত-শিল্পী ছিলেন, কি অপরূপ পদ্ধতিতে তিনি গাইতেন, তার অতি মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন, শ্রদ্ধেয় অমিয়নাথ সান্যাল। সঙ্গীত-প্রবীণ সান্যাল মশায় সঙ্গীত-বিষয়ে যেমন তত্ত্বজ্ঞ, তেমনি রসজ্ঞ। লেখনীও তাঁর উপযুক্ত শক্তিধর। নাটোর মহারাজার ভবানীপুর ভবনে কালে খাঁর গান শুনে তিনি যে আনন্দরসে আপ্লুত হয়েছেন, তার স্বাদও অনেকাংশে তাঁর পাঠকদের দিতে পেরেছেন। খেয়াল-গায়ক কালে খাঁর কিছু পরিচয় লাভের জন্যে সান্যাল মশায়ের বিবৃতির অংশ থেকে এখানে উদ্ধৃত করা হল :

"আসরকে নতি জানিয়ে খাঁ সাহেব কণ্ঠের সুর ছাড়লেন তম্বুরা কোলে নিয়ে।

কোনও তোম্ তায় নোম্ বোল্ ব্যবহার না করে, মাত্র স্বরবর্ণ উচ্চারণ করে খাঁ সাহেব সুরের নক্‌শা ফুটিয়ে তুললেন এক নিঃশ্বাসে।

খাঁ সাহেব গান আরম্ভ করলেন "দুখকে পাত সব ঝর্ গয়ে" দিয়ে আরম্ভ একটি পদ; পরে বিশ্বনাথজীর মুখে শুনেছিলাম রাগের নাম "কৌশিকী কানাড়া"। উদার ও অসাধারণ এক রকমের আবেদনের মাহাত্ম্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মুদারার মধ্যম-স্বর।

অল্পক্ষণ পরে খাঁ সাহেব হাতের তম্বুরাটি পাশে নগেন্দ্রবাবুকে দিলেন এবং ডান হাঁটু উঁচু করে কায়দা করে বসলেন; তাঁর ডান হাত চলে গিয়েছে ডান কানের কাছে, বাঁ হাতটি রেখেছেন বাঁ হাঁটুর উপর। মৌজুদ্দিনও এরকম আসনে বসে গান করেন, মনে পড়ে গেল।

এতক্ষণে যেন আবেগ-সঞ্চয়ের কারণেই তাঁর কণ্ঠস্বর উজ্জ্বলে মধুরে অপূর্ব হয়ে উঠেছে; চিকণ সুমার্জিত সেই কণ্ঠধ্বনির ঝলকে ঝলকে আভাস দেয় মীড়-মূর্ছনা দিয়ে তৈরি অলঙ্কারগুলি। গায়কীর শৃঙ্গারসজ্জায় সার্থক হয়েছে রাগের আবাহন। তখনও কানে "দুখকে পাত সব" শব্দগুলি ধরতে পারছি। প্রতি আবর্তে নূতন তানের উপসংহার হয়ে যেন নূতন সাজে ফিরে ফিরে আসে ঐ শব্দগুলি।

খাঁ সাহেবের কণ্ঠস্বরের বৈশিষ্ট্য অনুভব করলাম, যখন তিনি ছোট ছোট পাল্লার "হরকত" (অর্থাৎ প্রত্যেক নূতন বিস্তারের মুখে মূর্ছনার মোলায়েম আল্পনা) দিয়ে বিস্তারের বিচিত্র তরণীগুলি ভাসিয়ে দিচ্ছিলেন সুরের তরঙ্গে। তখনকার তখন সেই কণ্ঠের তুলনা পাই নি। পরে, ইন্দোর-নিবাসী বীণ্‌কার মজিদ খাঁ সাহেবের হাতে বীণার হর্‌কতগুলি শুনে মনে পড়ে গেল খাঁ সাহেবের কণ্ঠের স্নিগ্ধ গম্ভীর লীলায়িত চরিত্র, যার মধ্যে রুক্ষতার লেশমাত্র ছিল না। কত রকমের গতিবেগ দিয়ে কত রকমের অজস্র তান হতে থাকে, অথচ কণ্ঠের সেই কোমলতার বিচ্যুতি ঘটে নি। আমার কানে সুরের স্নেহলেপনই অনুভব করেছি, স্বর দিয়ে শ্রবণের বেধ বা আঘাত ঘটেছে বলে মনে পড়ে না। জরবদার (অর্থাৎ Staccato Style-এর) বোল্ বা তানের ছুঁই-ফোঁড় লক্ষণ সহজেই কানে ধরা পড়ে; সুরগুলি যেন তাদের বিশিষ্ট পরিচ্ছিন্ন আবির্ভাব স্পষ্ট আঘাত দিয়ে জানিয়ে দেয়। খাঁ সাহেবের কণ্ঠের চরিত্র ও কারুকার্য এরকম জরবদার তানকে যেন উপেক্ষা করেছে বলে মনে হল; এমন কি, চৌতুনি তানের মধ্যেও জবরদার লক্ষণ ছিল না।

মজিদ খাঁ সাহেবের বীণায় গমক-যোড় শুনে মনে পড়ে গিয়েছিল কালে খাঁ সাহেবের কণ্ঠের মোলায়েম গমকের কাজগুলি। তম্বুরার গুঞ্জনের সহযোগে কণ্ঠের সেই আন্দোলনগুলি বীণাযন্ত্রে গমকেরই অনুরূপ ছিল নিশ্চয়; তা না হলে

মজিদ খাঁ সাহেবের হাতে গমক শুনে কালে খাঁ সাহেবের কণ্ঠের গমক মনে পড়ত না। কালে খাঁ সাহেবের গান শোনার আগে ইম্‌দাদ খাঁ সাহেবের সেতার সুরবাহারে গমক শুনেছি ; পরে আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের কেরামতউল্লা খাঁ সাহেব ও ফিদা হুসেন খাঁ সাহেবের হাতে সরোদের গমকও শুনেছি। কিন্তু এসব ব্যাপার কালে খাঁ সাহেবের কণ্ঠের চরিত্রকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে নি। এই হল আসল কথা।

কালে খাঁ সাহেবের কণ্ঠ ছিল সারেঙ্গীর মত, তারা সপ্তকের সুরে কোন কৃত্রিম তীক্ষ্ণতা দেখা দেয় নি।

গান শেষ হলে অল্পক্ষণ বিশ্রাম নিলেন খাঁ সাহেব।

তম্বুরার সুরে কোনও পরিবর্তন না করে, কোনও উপক্রমণিকা না করে খাঁ সাহেব দ্বিতীয় গান আরম্ভ করলেন "যোবন আয়ে" ইত্যাদি একটি পদ।

একটি ছোট্ট দোহারা গিট্‌কিরির চমক আর একটি হাল্‌কা মোলায়েম ফান্দা রচনা করেই খাঁ সাহেব যেন তল্‌বারের চোট্‌ দিলেন সমের ওপর নিষাদ সুরে। "আয়ে" শব্দের "আ"-এর ওপরই ছিল সমের সন্ধান। তীব্র নিষাদের অমৃতমুখ একটি বাণ দিয়ে যেন গানের মর্মভেদ হল, আর পরম সুস্বাদু এক শ্রবণামৃতই যেন অনুস্যূত হয়ে চলল গানের প্রতি অঙ্গে, ছন্দ আর মাত্রার গ্রন্থিতে। নিষাদের সেই বেদনামধুর স্বরূপটি তৎক্ষণাৎ মিলিয়ে গেল যেন. ধৈবতের মূর্ছনার মধ্যে, কিন্তু তার শিহরণ উছলে পড়ে দেখা দেয় যেন পঞ্চমের স্পর্শে ; যেন আত্মসমর্পণের ক্রমিক লীলাপর্যায় দেখা দিয়ে যায় সুরের পথে শ্রুতিদের সঙ্গে সঙ্গে। প্রতিটি সুর আসে আপন অভিমানের স্পর্ধায় আপন আবেগ সঞ্চয় করে। পরমুহূর্তেই যেন বিমোহ আর বিস্ময়ের মধ্যে ঘটে আত্মবিস্মরণের চমৎকারী।

মাত্র ঐ পাঁচটি অক্ষরকে ধরে খাঁ সাহেব রাগের বাঢ়ত্‌ (ক্রমশঃ অগ্রগামী সুরের ভাঁজ দিয়ে একরকম রাগ-বিস্তার) রচনা করে চলেছেন একটির পর একটি। প্রতিবারেই ফিরে আসে "যোবন আয়ে"-র ক্পবন্ধনী নূতন তানের বেগ সংগ্রহ করে, সুর-কল্লোলের উদ্দাম তরঙ্গ-সম্ভার বহন করে। এ কি যৌবন-সমুদ্রের নিত্য-নব পরিচয় ?

ঐ গানের "যোবন আয়ে"ই হয়ত রাগানুভূতির একটি সন্ধিক্ষণ ; নিষাদ আর ধৈবতের ব্যঞ্জনাই হয়ত সেই সন্ধিক্ষণে নূপুরধ্বনির মত চমৎকৃতি আস্বাদন করিয়েছে। অবশ্য কালে খাঁ সাহেবের প্রতিভা ও-রকমের উন্মেষণা আর সাক্ষাৎকারের চরম সৌন্দর্য আস্বাদ করিয়ে দিয়েছিল।

ঢিমা একতালার ছন্দোবন্ধনে খাঁ সাহেব রচনা করে চলেছেন গিটকারির কুসুমগুচ্ছ; বাণী ও সুরকে ছন্দের বাঁধনে জড়িয়ে অলঙ্কৃত করেন বোল তানের বিভূতি দিয়ে। রাগের শরধি থেকে বাছাই-করা সুরের বাণ তুলে নেন খাঁ সাহেব; কথার ডালি থেকে চয়ন করেন ব্যঞ্জনের শ্লিষ্ট ধ্বনিগুলি; মাত্রা-ছন্দের সন্ধিক্ষণে কথার কুসুমামৃতে ডুবিয়ে-তোলা সুরের বাণগুলি খাঁ সাহেবের কণ্ঠচ্যুত হয়ে ছেয়ে ফেলে আমাদের শ্রবণের আকাশ।

ঢিমা খেয়ালের মন্থর গতিভঙ্গির অন্তরালে এতখানি চপলতা গোপন থাকতে পারে, গিটকারি ও বোলতানের ছন্দ সজ্জায় গানের রূপ এমন মহিমায় মূর্ত হয়ে উঠতে পারে, এ কথা স্বপ্নেও ভাবি নি।……খেয়াল গানের এই স্বচ্ছন্দ স্বতন্ত্ররূপের চরম পরিচয় সর্বপ্রথম ঘটেছে কালে খাঁ সাহেবের মুখে বিলম্‌পদ আস্থায়ী শুনে।

বিচিত্র ছন্দের বোল-তান শুনে আমরা উত্তেজিত হয়ে উঠেছি; ছন্দ বা মাত্রায় আমাদের দেহ দুলে ওঠে, খাঁ সাহেবের পাগড়িও থেকে থেকে দুলে উঠছে; তাঁর বাঁ-হাতখানি উর্ধ্বে উঠে যায় তানের আগে, আর বোলতানের চক্রের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে নেমে আসে। সময়ে সময়ে আবেগের চরমে সেই হাতখানি বেগে নেমে এসে বাঁ-হাঁটুর ওপর ধাক্কা দিয়ে থেমে যায়; কখনও বা আসরের জাজিমের উপর একটা চাপড় দিয়ে উঠে যায়।

ক্রমে দেখা দেয় চৌদুনি তানের বিদ্যুৎ-বলয়; রাগের উপযুক্ত অলঙ্কারই এরা। কয়েকটি কথার ইঙ্গিতে ঝলকে ঝলকে সুরগুলি আরোহ-অবরোহের অলাতচক্র সৃষ্টি করতে করতে মিলিয়ে যায় "যোবন আয়ে"র মধ্যে; আখেরী তান এরা। অনুভবে বোধ হল, সুরের প্রদীপের শেষ আরতি দিয়ে গানের পূজা সমাপন করেন খাঁ সাহেব। গান সমাপ্ত হল। গানের সমগ্র মহিমার একটা রেশ যেন বিদায় নিতে চায় না আমাদের হৃদয় থেকে তখনও।

খাঁ সাহেব তম্বুরার সুর অদল-বদল করে নিয়েছেন, খরজের তার খরজে আর পঞ্চমের তার মধ্যমে। আসর গম্‌গম্‌ করতে থাকে যুগল তম্বুরার সুর—মধ্যমের মধুর সংবাদে। বিশ্বনাথজী বললেন, "আমাদের খাঁ সাহেব তো মালকৌশে সিদ্ধ!" সত্য সত্যই খাঁ সাহেব আরম্ভ করলেন মালকৌশ রাগের একটি পদ "পগ্‌লাগন দে", মধ্য লয়ের তেতালায় আর বিনা উপক্রমণিকায়। জীবনে এই গানটি প্রথম শুনলাম। পরেও শুনেছি কয়েকবার, কিন্তু প্রথম পরিচয়টি যেন শেষ পরিচয় হয়ে আছে, এ পর্যন্ত সময়ে।

আরম্ভেই মুদারার মধ্যমস্বরে দুই গমকের মাণিকজোড়। পরেই একটি স্মৃত,

যেন সুরশৃঙ্গারের ধ্বনির মত চিকণ উজ্জ্বল রেখা নীচে নেমে এসে উদারার কোমল নিষাদের চারিদিকে কুণ্ডলী পাকিয়ে নিষাদকে কয়েদ করেই নিয়ে চলে যায় কোমল ধৈবতের অপ্রমেয় সীমান্তে। এর পরেই বাণী ও সুর একসঙ্গে সপ্রতিভ সঞ্চারে ফিরে এসে দাঁড়ায় ষড়্‌জে; সমের মন্দিরে রাগবিগ্রহের অধিষ্ঠান হয়ে যায়। ঐ জোড়-গমক আর সুতে সুচারু চরণক্ষেপ আর প্রকাশ-ভঙ্গিমা তো ভুলতে পারি নি। কালে খাঁ সাহেবের কণ্ঠের সুত-গমকের লহরী উছ্‌লে পড়ে স্মৃতির মধ্যে; "পগ্‌লাগন দে" দিয়ে আরম্ভ করে দিয়ে মুহরাটি কায়েম হতে না হতেই একটি সপাট তান হয়ে গেল তড়িৎ গতিতে। এর পরে গানের পূর্ণ স্থায়ী পদটি দেখা দিল যেন ঝড়ের আগে কাক-চিলের মত; হঠাৎ এমনভাবে সুরের ঝড় উঠল যে, অন্য কথাগুলি তাদের রূপ বজায় রেখে পরিচয়ই দিতে পারল না। খাঁ সাহেবের হৃদয়ে সুর আর ছন্দের একটা অভিনব উত্তেজনা এসেছে, বুঝলাম তাঁর চোখ-মুখের উদগ্র উল্লসিত ভাব দেখে, তাঁর কণ্ঠধ্বনির আকুল আবেদন অনুভব করে। গানের আরম্ভেই ধ্বনি আর ছন্দের এই আশা-প্রত্যাশাগুলি যেন তালগোল পাকিয়ে যায়। খাঁ সাহেব, তাদের পিষে বেঁটে রগড়ে সুর আর ছন্দের নূতন সাজে সাজিয়ে রচনা করতে থাকেন রূপগুলি; আর বিদায় করে দেন মুহূর্তের মধ্যে। আমাদের মনপ্রাণ ভরে গেল সুর ও ছন্দের মধুর উতরোলে।

আরম্ভ হল মোটা মোটা সুরের দানা দিয়ে হর্‌কতের পর হর্‌কত; তার মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে দেখা দেয় গমক-লাগান সুরের ফিরৎ আর ফিকরবন্দী চক্রগুলি; সুরের দলেরা হুড়মুড় করে ঘুরে বেড়ায় মুহরার এপাশে-ওপাশে।...সুরের অবিরল ধারা আমাদের শ্রবণকে প্লাবিত করে রাখে, শ্রাবণের বর্ষণের মত।

...সেই বিহ্বল অবস্থায় খাঁ সাহেবের দিকে চাইলাম। অদ্ভুত একরকম আবেদনের আগুন খেলছে তাঁর দৃষ্টিতে, তাঁর চোখ দুটি জ্বল্ জ্বল্ করে উঠছে, আর সেই মুরেঠা সমেত সর্বদেহটি দুলে দুলে কেঁপে কেঁপে উঠছে গমকের পর্বে পর্বে। বাইরের জগতের জ্ঞান যেন তাঁর নেই।...কালে খাঁ সাহেব মালকৌশ রাগে সিদ্ধ, এমন কথা বললেন বিশ্বনাথজী। আমার ধারণা, খাঁ সাহেব সিদ্ধ মাত্র নন; তিনি রাগের অগ্নিতে বিদগ্ধ একটি সত্তা।"

নাটোর ভবনে কালে খাঁর গানের আসরের এই রসোত্তীর্ণ বর্ণনা থেকে ধারণা করা যায়, খাঁ সাহেব কত বড় সুরস্রষ্টা ছিলেন। সান্যাল মশায়ের এই উৎকৃষ্ট সাহিত্য-কর্ম থেকে ভাবীকালের পাঠক-সমাজ জানবে, কি প্রতিভাধর

গায়ক ছিলেন কালে খাঁ, কেমন ছিল তাঁর গানের রীতি-নীতি-প্রকৃতি। স্মৃতির অতল থেকে সঙ্গীত মুক্তার পাঁতি "স্মৃতির অতলে"র গ্রন্থকার সযত্নে আহরণ করে রেখেছেন।

গায়ক কালে খাঁর সঙ্গে ব্যক্তি কালে খাঁর কথাও কিছু কিছু আছে বইখানিতে। সে বিষয়ে এখানে দু-একটি কথা আলোচনা করা দরকার। কারণ খাঁ সাহেবের প্রকৃতির সম্বন্ধে এমন কোন কোন কথা শ্রদ্ধেয় সান্যাল মশায় বলেছেন যা তথ্য হিসেবে নির্ভুল নয়। সেজন্যে "স্মৃতির অতলে"র বিবরণ থেকে কালে খাঁ সাহেবের ব্যক্তিজীবন এবং সঙ্গীত-জীবন সম্পর্কেও কিছু ভুল ধারণা সৃষ্টি হতে পারে।

আত্মভোলা এবং অন্যমনস্ক স্বভাব কালে খাঁর পরিচয় দেবার প্রসঙ্গে গ্রন্থকার খাঁ সাহেবের বীণ্ না-বাজাবার কথা সকৌতুকে বর্ণনা করেছেন এবং একাধিকবার। খাঁ সাহেব বীণ্ বাজাতেন না, অথচ আঙ্গুলে মেজরাব্ চড়িয়ে রাখতেন, তাঁর বীণ্ লেখক (অর্থাৎ সান্যাল মশায়) বা তাঁর পরিচিত অন্য কেউ কখনও শোনেন নি, অথচ কালে খাঁ নিজেকে মস্ত বড় বীণ্কার ভাবতেন এবং বলতেন ইত্যাদি। অন্য কোন বীণ্কার তাঁর চেয়ে ভাল বাজান; একথা স্বীকার করতে চাইতেন না—এইসব মন্তব্য উক্ত গ্রন্থকার হাসি-তামাসার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। খাঁ সাহেবের আত্মা "নিজেকে সবচেয়ে বড় বীণ্কার মনে করে নিরীহ রকমের আত্মপ্রসাদে নিমগ্ন হত মাঝে মাঝে।...তিনি মনে মনে মনোবীণা বাজাতেন; মেজরাব্ দুটি বাঁ-হাতের আঙ্গুল ছেড়ে ডান হাতের আঙ্গুলে কখনো চড়ে বসত না।"

কিন্তু এই বিবৃতি সঠিক নয়। খাঁ সাহেবের মেজ্রাব বাঁ-হাত ছেড়ে যথাসময়ে ডান হাতের আঙ্গুলে সত্যই চড়ে বসত এবং তিনি বীণার তারে সুরের মায়াজাল সৃজন করতেন। তিনি একজন উচ্চশ্রেণীর বীণ্কার ছিলেন, যদিও বৃহত্তর সঙ্গীত জগতে সেকথা তেমন সুপরিচিত ছিল না, কারণ তিনি আসরে গানই গাইতেন এবং তাঁর প্রধান পরিচয় ছিল গায়করূপে। কিন্তু খাঁ সাহেবকে যাঁরা অন্তরঙ্গভাবে জানতেন, তাঁদের কাছে তাঁর বীণাবাদনের কথা অজানা ছিল না। যেমন বীডন স্ট্রীটের ওই বাড়ির বাসিন্দারা জানতেন তাঁর বীণ্ বাজাবার কথা। কালে খাঁ বীডন স্ট্রীটে এক বছরের বেশি বাস করেছিলেন এবং সে-সময়ে তাঁর নিজের বীণা যন্ত্রটি সেখানেই ছিল। বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিমের যে ঘরে খাঁ সাহেব থাকতেন, সেখানে বসে বহুদিন তাঁকে অপূর্ব বীণালাপ করতে শুনেছেন সে-বাড়ির অনেকে। তাঁদের মধ্যে যাঁরা এখনও

বর্তমান আছেন তাঁরা কালে খাঁর বীণ্‌ বাজাবার বিবরণ দিয়ে থাকেন। সে বিবৃতি অবিশ্বাস করবার কোন সঙ্গত কারণ নেই!

কালে খাঁর বিষয়ে "স্মৃতির অতলে"র আর একটি বিবৃতিও সমালোচ্য। তা হল বিখ্যাত বাঈজী গহর্‌জান ও কালে খাঁর সম্পর্ক নিয়ে।

নর্তকী ও গায়িকা গহর্‌জানের প্রসিদ্ধি ভারতব্যাপী হলেও তিনি প্রায় আজীবন কলকাতাতেই বাস করেছিলেন। তাঁর সমকালে গায়িকা হিসেবে তাঁর তুল্য খ্যাতি খুব কম বাঈজীরই ছিল। রাগসঙ্গীতে পারদর্শিনী গহর্‌জান বাংলা গানও গাইতেন প্রয়োজন হলে। কলকাতার অনেক বাঙ্গালী বাড়িতে বিবাহ ইত্যাদি উপলক্ষ্যেও তিনি মুজ্‌রো নিয়ে গান করেছেন। আসরে তিনি সাধারণত খেয়াল, ঠুংরি, গজল-ই গাইতেন, কিন্তু ধ্রুপদেরও চর্চা করেছিলেন প্রথম জীবনে। গ্রামোফোন রেকর্ডে তাঁর বাংলা গানেরও কিছু নিদর্শন আছে। রবীন্দ্রনাথের 'কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না পথের শুকনো ধূলি যত গানখানি কয়েক বাড়িতে গেয়ে বিস্ময় জাগিয়েছিলেন গহর্‌জান।

এই গহর্‌জান ও কালে খাঁর যুক্ত প্রসঙ্গ "স্মৃতির অতলে"-তে বর্ণনা করা হয়েছে। সান্যাল মশায় জানিয়েছেন যে, গহর্‌কে খাঁ সাহেব ডাইনী মনে করে ভীষণ ভয় করতেন এবং এড়িয়ে চলতেন। শুধু তাই নয়, গহর্‌জান নাকি অনেকবার কালে খাঁকে তাঁর বাড়িতে অতিথি হিসেবে থাকবার জন্যে আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু খাঁ সাহেব তাঁর কোন অনুরোধে কর্ণপাত করেন নি। খাঁ সাহেব এমন ছেলেমানুষের মতন গহর্‌কে ডাইনী ভেবে ভয় পেতেন! কালে খাঁ অবোধ ভয়ে গহরের সংস্পর্শ যদি এড়িয়ে না চলতেন, তা হলে খাঁ সাহেব নিশ্চিন্তে বসবাস করতে পারতেন কলকাতায়, দারিদ্র্যের কষ্ট তাঁকে পেতে হত না, ইত্যাদি।…"কালে খাঁ সাহেব, যিনি গহরের নাম শুনলেই অতিমাত্রায় ত্রস্ত, উত্তেজিত হয়ে উঠতেন।"…"মিথ্যা প্রবঞ্চনার অতীত ছিল সেই আত্মা, যে গহর্‌ বাঈজীকে ডাইনী মনে করে শিউরে উঠত,…।" "শ্যামলালজী বললেন—গহরের প্রতি খাঁ সাহেবের দৃষ্টি ছিল সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ আর কামনারহিত একটা প্রশংসার দৃষ্টি। গহরের গানের প্রতিভাই খাঁ সাহেবের হৃদয়কে আকুলিত করেছিল। কিছু কিছু বিচিত্র রকমের ভয় বা বর্জনের সংস্কারও ছিল খাঁ সাহেবের হৃদয়ে, যে কারণে তিনি গহরের অনুনয় ও সংস্রব এড়িয়ে গিয়েছেন। গহর্‌ কত বার তাঁর কাছে অনুরোধ পাঠিয়েছিল যে, তিনি কলকাতায় থাকবার কালে গহরের বাড়িতে সম্মানিত অতিথি ও মুরশিদের মতই থাকুন। খাঁ

সাহেব সে কথা কানে ধরেন নি। অথচ তিনি গহরের প্রস্তাবে সম্মত হলে তাঁর বসবাস আহারাদির জন্যে দুশ্চিন্তা করতে হত না। এমন একটা বাঞ্ছিত সুযোগকে তিনি উপেক্ষা করতে বাধ্য হয়েছিলেন।”

“স্মৃতির অতলে”-তে গহর্‌জান ও কালে খাঁর পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে এই সমস্ত কথা আছে—লেখকের বিবৃতিতে এবং তাঁর সঙ্গীত-গুরু শ্যামলাল ক্ষেত্রীর জবানিতে। কালে খাঁ গহর্‌কে কিরকম ভীতির চোখে দেখতেন এবং তাঁর বাড়িতে বাস করবার আহ্বানে সাড়া দিতেন না, ইত্যাদি কথা সান্যাল মশায় তাঁর গুরুজী শ্যামলাল ক্ষেত্রীর মুখে শুনেছিলেন মনে হয়।

কিন্তু এ বিষয়ে প্রায় উল্টো রকমের একটি কথা জানা যায়। তা হল, কালে খাঁ গহর্‌জানের বাড়িতে বাস করেছিলেন বীডন স্ট্রীটের বাড়িতে আসবার আগে। নাখোদা মসজিদ ও তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রীটের মাঝামাঝি, চিৎপুর রোডের পূবদিকে গহর্‌জানের বারান্দাওয়ালা দোতলা বাড়িতে খাঁ সাহেবের বাসের সময় একটি ঘটনা ঘটে। তা হল—গহর্‌জানকে কালে খাঁর বিবাহের প্রস্তাব এবং গহর্‌ কর্তৃক তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান। তার পরই হতাশ-প্রণয়ী খাঁ সাহেব চিৎপুর রোডের সেই বাড়ি থেকে চলে আসেন বীডন স্ট্রীটের ঘোষ ভবনে। গহরের প্রতি কালে খাঁর প্রেম-নিবেদন ও বিবাহের আবেদন এবং গহর্‌জানের তা অগ্রাহ্য করার কথা তখনকার ঘোষ-পরিবারের অনেকের কাছে সুপরিচিত ঘটনা ছিল। এখনও সে পরিবারের প্রাচীন ব্যক্তির মুখে সেসব স্মৃতিকথা শোনা যায়। সেই সব বিবৃতি থেকে মনে হয় যে, কালে খাঁর মনে গহর্‌ সম্পর্কে “বিচিত্র রকমের ভয় বা বর্জনের সংস্কার ছিল” না, ছিল গ্রহণের প্রবল প্রেরণা। এবং সেই গ্রহণের সংস্কার প্রচণ্ড বাধা পাবার পর থেকে হয়তো খাঁ সাহেব গহর্‌কে সামাজিকভাবে এড়িয়ে চলতেন। গহরের সংস্রব এড়াবার সেই কাহিনী বাইরের জল্পনায় পল্লবিত হয়ে কিছু অলীক কিংবদন্তীর সৃষ্টি করেছিল!

এখন থাক এসব কথা। বীডন স্ট্রীটের ঘোষ-বাড়িতে কালে খাঁ আর ইম্‌দাদ খাঁর কথা এবার আরম্ভ করা যাক। কালে খাঁ এখানে তারাপ্রসাদ ঘোষের আমন্ত্রণে বাস করতে আসেন গহর্‌জানের বাড়ি থেকে। অর্থাৎ গহর্‌জানকে খাঁ সাহেবের বিয়ে করার প্রস্তাব নাকচ করার পর।

বীডন স্ট্রীটে যখন কালে খাঁ এলেন, তার আগে থেকেই সেখানে ইম্‌দাদ খাঁ ছিলেন।

ইম্‌দাদ হোসেন খাঁ সঙ্গীতজগতে সুপরিচিত ছিলেন সেতার-সুরবাহারের শিল্পীরূপে। জীবনের শেষ ক'বছর তিনি ইন্দোর দরবারের সভাবাদক নিযুক্ত

থাকলেও, জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ তাঁর বাংলা দেশে কেটেছিল। বিশেষ কলকাতায়। ২০ বছরেরও বেশি তিনি কলকাতায় বাস করেছিলেন। তার মধ্যে প্রায় অর্ধেককাল ছিলেন বীডন স্ট্রীটের এই বাড়িতে।

ইম্‌দাদ খাঁ বাঙ্গালী ছিলেন না। তাঁদের বংশে তিনি প্রথম বাংলায় আসেন পশ্চিম থেকে। ঘোষ-পরিবারে আশ্রয় পাবার আগে তিনি যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুরের সঙ্গীতসভায় কিছুকাল ছিলেন।

ইম্‌দাদ খাঁর সম্বন্ধে শোনা যায় যে, তাঁদের বংশে তাঁর বাবাই প্রথম ইস্‌লাম ধর্ম নিয়েছিলেন। কোন লেখকের মতে, ইম্‌দাদের বাবা প্রথম জীবনে ছিলেন রাজপুত হিন্দু—হলেন সাহাবদাদ হোসেন খাঁ। তাঁর এই ধর্ম বদল করবার আসল কারণও ছিল—সঙ্গীত। মুসলমান ওস্তাদদের কাছে সঙ্গীতশিক্ষা করবার সময় দীর্ঘকাল ধরে তাঁর যে মুসলমান সংস্পর্শ ঘটতে থাকে, তার ফলে তিনি ক্রমে নিজের সমাজে একঘরে হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত পরিণত বয়সে সপরিবারে ইস্‌লামী শিবিরে চলে যান সাহাবদাদ হোসেন খাঁ নাম নিয়ে। তাঁর প্রথম ওস্তাদ ছিলেন গোয়ালিয়রের বিখ্যাত খেয়ালী হদ্দু খাঁর ভ্রাতা নথ্‌ু খাঁ। তার পর তিনি মিঞা মৌজ নামে জনৈক কলাবত এবং তানসেনের কন্যাবংশীয় নির্মল শার (ওমরাও খাঁর কাকা) কাছে যন্ত্রসঙ্গীতের কিছু তালিম পেয়েছিলেন। তিনি প্রধানত ছিলেন গায়ক। বিশেষ করে সাধনা করেছিলেন কণ্ঠসঙ্গীত। আর সুরবাহার ছিল শখের বাজনা। কিন্তু পরে তাঁর বংশে যন্ত্রসঙ্গীত চর্চাই প্রথম স্থান নেয়।

তিনি হন সাহাবদাদ খাঁ এবং তাঁর দুই ছেলের নাম করিমদাদ হোসেন খাঁ ও ইম্‌দাদ হোসেন খাঁ। করিমদাদ ও ইম্‌দাদ দুজনেই সেতার-সুরবাহারের সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। করিমদাদের অল্পবয়সে অবিবাহিত অবস্থায় মৃত্যু হয়। তাঁদের দুজনেরই পিতার কাছে সঙ্গীতশিক্ষা আরম্ভ হয় নাওগাঁও-তে। সেখানকার রাজদরবারে সাহাবদাদ খাঁ নিযুক্ত ছিলেন।

ইম্‌দাদ খাঁ শেষ বয়সে ইন্দোর দরবারে অবস্থান করলেও মধ্য জীবনের প্রায় ২০ বছর থাকেন বাংলা দেশে, একথা আগেই বলা হয়েছে। প্রথমে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গীতসভায়, কিছুদিন মেটিয়াবুরুজে নবাব ওয়াজিদ আলীর দরবারে, ইত্যাদি। আর প্রায় ১০ বছর ছিলেন তারাপ্রসাদ ঘোষের ওই বীডন স্ট্রীটের বাড়িতে।

সুরবাহার-বাদক ও সেতারীরূপে ইম্‌দাদ খাঁ স্বনামপ্রসিদ্ধ গুণী হয়েছিলেন এবং প্রথম যুগের গ্রামোফোন রেকর্ডে তাঁর সঙ্গীতকৃতির বেশ কিছু নিদর্শন বিধৃত

আছে। যথাঃ আশাবরী, ভৈরব, জৌনপুরী, সোহিনী, বেহাগ, কাফি, ইমন কল্যাণ, দরবারি কানাড়া ও খাম্বাজ। তার মধ্যে বিশেষ করে জৌনপুরীর আলাপটি থেকে বোঝা যায় যে একজন সত্যকার শিল্পী ছিলেন তিনি। যন্ত্রসঙ্গীতে তাঁর এই কলানৈপুণ্য তাঁর নিজস্ব সাধনার ফল। সঙ্গীতবিষয়ে তিনি প্রথম জীবনে পিতার কাছে যে শিক্ষা পান, তা কণ্ঠসঙ্গীতের। পরবর্তী-কালে সেতার-সুরবাহারের চর্চা যে ঐকান্তিকভাবে করেছিলেন, সে-বিদ্যা অন্যান্য সূত্রে লাভ করা। তিনি কোন এক বা একাধিক কলাবতের বিশিষ্ট সঙ্গীতধারার শিক্ষা সেতার-সুরবাহারে রীতিমত পান নি, এই তথ্যটি লক্ষণীয়। অর্থাৎ তিনি কোন ঘরানা তালিম লাভ করেন নি। পশ্চিমের কোন কোন অঞ্চলে এবং বাংলা দেশে বাস করবার সময়ে তিনি নানা কলাবতের সঙ্গীত-সম্পদের কাছে ঋণী ছিলেন শিক্ষা বিষয়ে। বলা যায়, পাঁচ বাগিচার ফুলে তিনি তাঁর সুরের ডালি ভরিয়েছিলেন। আর সেই সঞ্চিত পুষ্প-সম্ভার থেকে নিজের গাঁথা মালা নিবেদন করেছিলেন সুর সরস্বতীর পাদপদ্মে।

সেতার-সুরবাহার বাদনে তিনি যাঁদের কাছে উপকৃত, তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য ছিলেন—জয়পুরের (সেনীঘরের) রজব আলী খাঁ। এই বীণ্‌কারের কাছে ইম্‌দাদ দেড় বছর শিখেছিলেন। রজব আলী ছিলেন বীণ্‌কার বন্দে আলী খাঁর আত্মীয়। গোয়ালিয়রের সভাবাদক বীণ্‌কার-সেতারী আমীর খাঁরও বাজনা ঘনিষ্ঠভাবে অনেকদিন শোনেন ইম্‌দাদ। এই আমীর খাঁ ছিলেন বিখ্যাত সেতার-গুণী অমৃত সেনের (তানসেনের পুত্রবংশীয়) ভাগিনেয়। তা ছাড়া, অমৃত সেনের বাজনাও ইম্‌দাদ অনেক শুনেছিলেন। শুনে শিক্ষা তাঁর অনেকখানি হয়েছিল, কারণ তিনি ছিলেন নিপুণ শ্রুতিধর।

অবশ্য পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়িতে নিযুক্ত স্বনামধন্য সাজ্জাদ মহম্মদের কাছে তাঁর ঋণ সবচেয়ে বেশি। তাই পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে স্বরচিত 'হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতি'তে (চতুর্থ খণ্ড) এই ধরনের মন্তব্য করেছেন যে, 'আধুনিক প্রসিদ্ধ ইম্‌দাদ খাঁও শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের চাকরি করেছেন। শুনা যায়, তিনি সাজ্জাদের বাজনা শুনে বাজাতে শিখেছিলেন। সাজ্জাদের বাজনা শুনতে না পেলে ইম্‌দাদ খাঁকে আজ কেউ চিনত না।"

সে যা হোক, সঙ্গীতচর্চার বিষয়ে ইম্‌দাদ খাঁ সাধক-স্বভাবের ছিলেন। প্রতিদিন সকাল থেকে তাঁর যে কয়েক ঘণ্টার করণীয় সঙ্গীত-সাধনা ছিল, কোন রকমের বাধা-বিপত্তিতেই তার অন্যথা হত না। কলকাতায় থাকবার সময়ে একদিন শেষরাত্রে ইমদাদের এক কনিষ্ঠা কন্যার মৃত্যু ঘটে। কিন্তু তাতেও

প্রাত্যহিক সঙ্গীত-সাধনায় ছেদ পড়ে নি তাঁর। এবিষয়ে পরে ঘোষ-পরিবারের একজন খাঁ সাহেবকে প্রশ্ন করেছিলেন। তাতে তিনি বলেন, "বাবুজি, স্নেহ আমার নেই, তা কি হতে পারে? আমি কি মানুষ নই? কষ্ট আমার আর আর পাঁচজন মানুষের মতই হয়েছে। কিন্তু আমার ধর্ম হল রেওয়াজ করা। তা আমি বন্ধ করতে পারি না।"

স্বরসাধক ইম্‌দাদের এই হল শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

কালে খাঁ ছিলেন আলিয়া ফত্তুর ঘরানাদার এবং নিজেদের ঘরেই রীতিমত তালিম পেয়েছিলেন, একথা যথাস্থানে বলা হয়েছে।

সঙ্গীতচর্চার বিষয়ে কালে খাঁর স্বভাব ছিল ইম্‌দাদ খাঁর প্রায় বিপরীত। তাঁর সঙ্গীত-সাধনায় কোন নিয়মিত বা নির্দিষ্ট সময় বলে কিছু ছিল না। অত্যন্ত খামখেয়ালী ও মেজাজী ছিলেন তিনি। কখনও কখনও দিনের পর দিন কেটে যেত তাঁর বিনা সঙ্গীতে, অলস নিষ্ক্রিয়তায়। আবার গানের মেজাজ যখন আসত, তখন অসময় বলে কিছু নেই। হয়তো বেলা বারোটায় স্নান করতে চলেছেন, কারুর সঙ্গে সুরের কথায় মেজাজ এসে গেল, বসে গেলেন ঘোষ-বাড়ির সেই পুবদিকের ঘরে, সুরের জাল বুন্‌তে বুন্‌তে সময় কোথা দিয়ে চলে গেল তার সন্ধান নেই—পরিতৃপ্ত কালে খাঁ নিজের সঙ্গীত-সৃষ্টিতে নিজেই বিভোর হয়ে রইলেন। অবশ্য আসরের কথা আলাদা। সেখানে সময় মত যেতেন, গাইতেনও যথারীতি। নিজের ঘরে বসে তাঁর সঙ্গীতচর্চা করবার কোন সময় বা দিনের ঠিক ঠিকানা ছিল না। এমনিতেই তিনি আত্মসমাহিত মানুষ ছিলেন, তার ওপর স্বেচ্ছায় যখন গান-বাজনা করতেন তখন যেন কোন সুদূর সুরলোকে অধিষ্ঠান হত তাঁর।

ইম্‌দাদ খাঁ তারাপ্রসাদবাবুর বাড়িতে থাকবার সময়ে ভালভাবেই বুঝেছিলেন যে, কালে খাঁ কত বড় গুণী। তাই তাঁর বিশেষ ইচ্ছা হয় যে পুত্র এনায়েৎ কালে খাঁর কিছু তালিম পান। পুত্রদের নানা গুণীর শিক্ষা লাভ করাতে ইম্‌দাদ বড়ই আগ্রহী ছিলেন এবং পরে এনায়েৎ ও ওয়াহিদ-কে অনেক ওস্তাদের কাছে সঞ্চয় করে নেবার সুযোগ দিয়েছিলেন, ভারতের নানা সঙ্গীতকেন্দ্র পর্যটনের সময়ে।

তারাপ্রসাদবাবুর বাড়িতে থাকবার সময়ে, কালে খাঁর সঙ্গে ইম্‌দাদ খাঁর একটি মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয়। তাও ইম্‌দাদের পুত্রকে সঙ্গীতশিক্ষার ব্যাপার নিয়ে।

কালে খাঁ কি উঁচুদরের গুণী ছিলেন তা ইম্‌দাদ খাঁ বিলক্ষণ জানতেন।

তাই তিনি একদিন কথায় কথায় কালে খাঁকে অনুরোধ করেন এনায়েৎকে কিছু খেয়ালের তালিম দিতে। এক বাড়িতেই যখন রয়েছেন, তখন এনায়েৎকে শেখাবেন কালে খাঁ, এ আশা তিনি বিলক্ষণ করেছিলেন। কিন্তু কালে খাঁ সম্মত হন নি। একাধিকবার কথা প্রসঙ্গে ইম্‌দাদ কালে খাঁর কাছে তাঁর মনোবাঞ্ছা জানিয়েছিলেন। কিন্তু কালে খাঁ এড়িয়ে যান সে প্রস্তাব। এই নিয়ে দুজনের মধ্যে মনান্তরের সূত্রপাত। কালে খাঁর ওপর অসন্তুষ্ট হন ইম্‌দাদ এবং তাঁর প্রতিও বিরূপতা জাগে কালে খাঁর। কিন্তু এক বাড়িতে থাকার সূত্রে রোজই দেখা-সাক্ষাৎ ঘটে। ইম্‌দাদের পশ্চিমের সেই ঘরখানির সামনে দিয়ে তাঁর পূবদিকের ঘরে যাতায়াত করতে দু-একটা কথাবার্তাও হয় কালে খাঁর। এনায়েৎকে শেখানো না-শেখানো নিয়ে অবশ্য দুজনেরই মনের মধ্যে বিরোধের একটা কাঁটা থেকেই যায়।

এমন সময় একদিন প্রকাশ্য সংঘর্ষ হয়ে গেল দুজনের মধ্যে। তবে কোন সাধারণ আসরে নয়, ওই বাড়িতেই তাঁদের এক প্রচণ্ড সাঙ্গীতিক বচসা হয়ে গেল। তারাপ্রসাদবাবু ভিন্ন আর বিশেষ কেউ উপস্থিত ছিলেন না সেখানে।

তাঁদের সে কলহ কিন্তু যথার্থ গুণীরই যোগ্য, কোন সাধারণ লোকের তর্কাতর্কি বা ঝগড়া নয়। ইম্‌দাদ খাঁর সেই পশ্চিমের ঘরের সামনে দিয়ে কালে খাঁ আসবার সময় সেদিন দেখা হয়েছিল দুজনের। কি কথায় তার পর তাঁদের বচসা আরম্ভ হয়ে যায় তা সবটা জানা যায় নি। তবে নিজেদের সঙ্গীতচর্চার ধারা নিয়ে তর্ক বেধেছিল তাঁদের মধ্যে। কিন্তু সুরশিল্পীর বিবাদ কথা-কাটাকাটিতে পর্যবসিত না হয়ে পরিণত হয়েছিল সাঙ্গীতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায়।

তারাপ্রসাদবাবু যখন সেই অকুস্থলে এসে পড়েন, তখন কালে খাঁ মওড়া নিচ্ছিলেন।

ইম্‌দার খাঁকে তিনি আহ্বান জানিয়ে বলছিলেন, 'কি বাজনা আপনি বাজাবেন, বাজান। আমি গলায় সেসব কাজ দেখিয়ে দেব। কিন্তু আমার গলার জিনিস আপনি হাতে দেখান দেখি। এই রকম তো আপনি বাজান—'

বলে, কালে খাঁ ইম্‌দাদ খাঁর বাজনার ঢঙ্ তাঁকে গেয়ে শুনিয়ে দিতে লাগলেন। যেমন করে তিনি সুরবাহারে রাগের আলাপ কিংবা বিস্তার করেন, সেতারে গৎ বাজাবার সময় যেমন কায়দায় তান মারেন তার বেশ কিছু নমুনা কালে খাঁ দেখালেন গান গেয়ে। যে ক'টি কাজ তিনি দেখালেন, তা ইম্‌দাদের বাজনার প্রায় হুবহু নকল, বলা চলে। তাঁর সেই মিড়, গমক,

আশ্ ইত্যাদি সূক্ষ্ম অলঙ্কার কালে খাঁ গলায় অবলীলাক্রমে দেখিয়ে দিলেন।

ইম্‌দাদ খাঁ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন শুধু কালে খাঁর অদ্ভুত কণ্ঠনৈপুণ্যেই নয়, তিনি কি করে তাঁর হাতের বাজনার ঢঙ্, তাঁর রেওয়াজের সময়ে বাজানো জিনিস এমন খুঁটিয়ে তুলে নিয়েছেন? কি করে শুনলেন সব? তাঁর ঘরের সামনে দিয়ে আসা যাওয়া করবার সময় এসব এমন করে মনের পর্দায় উঠিয়েছেন? তা হলে তো এ ঘরে আর রেওয়াজ করাই চলবে না!

কালে খাঁ আবার তাঁকে চ্যালেঞ্জ করে বললেন, 'এখন যন্ত্রে ওঠান তো দেখি আমার এই সব গানের জিনিস।'

এই বলে তাঁর আশ্চর্য কণ্ঠে কয়েকটি তানের নিদর্শন দেখালেন।

প্রত্যুত্তরে ইম্‌দাদ খাঁ কি করতেন বলা যায় না, কারণ সেই বিসংবাদের ছেদ টেনে দিলেন গৃহস্বামী, দুই কলাবতের মধ্যস্থ হয়ে। কিন্তু তার জের সেখানেই মিটল না।

কারণ ইম্‌দাদ খাঁ অতিশয় ক্ষুব্ধ হয়ে জানিয়ে দিলেন, 'এ বাড়িতে কালে খাঁ থাকলে আমি চলে যাব।'

কালে খাঁ একথা শুনে নিজেই চলে যাবার কথা বললেন তারাপ্রসাদবাবুকে।

ঘোষমশায় তাঁদেরই অন্য এক জায়গায় খাঁ সাহেবকে থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু সেখানে বেশিদিন তিনি রইলেন না।

কিছুদিন বাস করবার পরই কালে খাঁ কলকাতা ছেড়ে চলে গেলেন ঢাকায়।

কলকাতা আজব শহর

রাগের রূপ ও তালের ব্যাকরণ সঠিক রেখে সঙ্গীত পরিবেশন করতে অনেকে পারেন। কারণ তা শিক্ষা-নির্ভর। কিন্তু সঙ্গীতে—অন্য সব আর্টেরই মতন —আসল কথা হল রসসৃষ্টি, যা সত্যকার শিল্পী ভিন্ন আর কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। এ কৃতিত্ব শুধু শিক্ষার ফলে অর্জন করা যায় না। আর কণ্ঠ-সঙ্গীতে সেই রসসৃজনে সবচেয়ে সাহায্য করে—কণ্ঠমাধুর্য। তাই কণ্ঠ-সঙ্গীতে তার আদর ও আবেদন এত।

কণ্ঠ-সঙ্গীতের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া তো প্রত্যক্ষ। গায়কের পক্ষে শ্রোতার অন্তর-তন্ত্রী স্পর্শ করা সহজতর হয় তিনি মধুকণ্ঠ হলে। শ্রোতার মর্মে তাঁর

সুরের আবেদন অনুরূপ ভাবের সঞ্চার করে। শিল্পী অমরত্ব লাভ করেন কণ্ঠ-মাধুর্যের প্রসাদে।

তেমন কণ্ঠসম্পদের অধিকারী অবশ্য কোন দেশেই সুলভ নন। বাংলায়ও তাঁদের সংখ্যা অল্প। এমন কয়েকজনের নাম সঙ্গীত-জগতের শ্রুতি-স্মৃতিতে বেঁচে আছে। তাঁরা ছিলেন বিভিন্ন যুগের, বিভিন্ন রীতির গায়ক। কেউ ধ্রুপদ, কেউ বা টপ্পা, কেউ বা খেয়াল অঙ্গের শিল্পী। যথা—বিষ্ণুপুরের ধ্রুপদী যদু ভট্ট; কৃষ্ণনগরের দেওয়ান, খেয়াল-গায়ক কার্তিকেয়চন্দ্র রায়; ধ্রুপদ, টপ্পা ও ভজন-গায়ক অঘোরনাথ চক্রবর্তী; টপ্পা-গায়ক মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়; রাণাঘাটের নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য; পাথুরিয়াঘাটার ধ্রুপদী পিতা-পুত্র মহীন্দ্রনাথ ও ললিতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়; এণ্টালীর ধ্রুপদী হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; তেলিনীপাড়ার টপ্পাশিল্পী জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (কালোবাবু); ধ্রুপদী ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; শিবপুরের টপ্পা-গুণী ফণীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়; খেয়াল-গায়ক ও ধ্রুপদী জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী; রাণাঘাটের টপ্পা-গায়ক নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (পদ্মবাবু) প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন কৃষ্ণনগরের কার্তিকেয়চন্দ্র রায়। তাঁর আগেকার যুগে কণ্ঠ-মাধুর্যের জন্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেন—নিধুবাবুর প্রিয় শিষ্য, হাফ্-আখড়াই গানের প্রবর্তক, বাগবাজারের মোহনচাঁদ বসু। তাঁরও আগে—বাংলার আদিযুগের টপ্পাশিল্পী নিধুবাবু স্বয়ং। পশ্চিমাঞ্চলের সুর-রাজ্য থেকে যাঁরা বাংলায় এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কণ্ঠ-মাধুর্যের জন্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন—খেয়াল-গায়ক কালে খাঁ, ঠুংরি-গায়ক মৌজুদ্দিন, টপ্পা-গায়ক রমজান খাঁ, খেয়াল-গায়িকা মুস্তারি বাঈ, প্রভৃতি।

এখন ওস্তাদ রম্‌জান খাঁর প্রসঙ্গ। অসামান্য সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের জন্যে তাঁর নাম সঙ্গীতক্ষেত্রে সঞ্জীবিত আছে। তাঁর কণ্ঠের যে হৃদয়গ্রাহী মাধুর্য আসরের পর আসর মাৎ করত, শ্রোতাদের পুলকে উদ্বেল ও বিষাদে বিধুর করে তুলত, তার কোন চিহ্ন আর কোথাও কিছু পাওয়া যাবে না। সেকালের গায়কদের এই এক ট্র্যাজেডি। তাঁদের দেহের সঙ্গে সুরেরও সমাধি ঘটে যেত। রম্‌জান খাঁর কণ্ঠস্বরও লুপ্ত হয়ে গেছে, যদিও তাঁর জীবনের মধ্যপর্বে আরম্ভ হয়েছিল গ্রামোফোনের যুগ।

খাঁ সাহেবের গান রেকর্ড করবার অবশ্য একবার সব বন্দোবস্ত হয়েছিল। কিন্তু একটা অদ্ভুত রকমের বাধা পড়ে ব্যর্থ হয়ে যায় সে প্রচেষ্টা। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর সে বিষয়ে কথাবার্তা সব পাকা হয়। গান দুখানিও তৈরি। নির্দিষ্ট

দিনে নির্ধারিত সময়ে তিনি এলেন রেকর্ড করতে, রেকর্ডিং ঘরে গাইতে। সেখানকার সব আয়োজনও প্রস্তুত।

সে আদিকালের রেকর্ড করবার পদ্ধতি ছিল অন্য রকম। লম্বা চোঙার ফনোগ্রাফের সামনে বসে গাইতে হত। আজকালকার মাইক্রোফোনের মতন স্বরকে গ্রহণ করবার শক্তি তার ছিল না। গায়কের গলার চড়া ও খাদের সব রকম কাজ নাকি করা যেত না ফনোগ্রাফ থেকে একই দূরত্বে মুখ রেখে। উদারা গ্রামের নীচের দিকে, অর্থাৎ স্বর যখন অনেক নেমে যেত, তখন চোঙার দিকে গায়কের মুখ দিতে হত একটুখানি এগিয়ে। তেমনি তারা গ্রামে সুর চড়ায় উঠে গেলে, গায়ক মুখ একটু পিছিয়ে নিতেন। মাঝামাঝি সুরে গাইবার সময় গায়ককে এমন দূরত্বের তারতম্য করতে হত না। স্বরের পার্থক্য যখন দ্রুত ঘটাবার দরকার, তখনই নাকি গায়কের কণ্ঠ ওইভাবে সমতা রক্ষা করত।

রমজান খাঁর এত কাণ্ড-কারখানা জানা ছিল না। তিনি ভাবে-ভোলা সঙ্গীত-শিল্পী। গান গাইতেন প্রাণের আবেগে, আত্মবিস্মৃত হয়ে। কর্তৃপক্ষ তাঁকে এত যন্ত্র-কৌশলের বিষয়ে অবহিত করা প্রয়োজন মনে করেন নি। তাঁর গলা যে তারা গ্রামের এত উঁচু পর্দায় কাজ করবে, তা হয়তো ভাবেন নি তাঁরা।

ওস্তাদজী চোঙার সামনে বসে গান আরম্ভ করেছেন। তাঁর ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে শুনছেন কর্তৃপক্ষের এক সাহেব, এই যন্ত্রের বিশেষজ্ঞ। সাহেব হঠাৎ দেখলেন, গায়ক খুব high pitch-এ (চড়া সুরে) গলা তুলেছেন। তিনি অমনি খাঁ সাহেবের মাথাটি ধরে একটু টেনে নিলেন পিছন দিকে। যন্ত্রের প্রয়োজনে।

আচম্‌কা এভাবে মাথা টেনে নেওয়াতে রম্‌জান খাঁ হতভম্ব হয়ে গান বন্ধ করে দিলেন। সে রেকর্ড নষ্ট হল। সাহেব তখন তাঁকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে অনুরোধ করলেন, গানটি আবার নতুন করে গাইতে।

কিন্তু তখন রমজানের মেজাজ একেবারে বিগ্‌ড়ে গেছে, আর তা ধাতস্থ হল না। 'আরে দূর করো' বলে সেই যে সেখান থেকে উঠে এলেন, আর ওমুখো হন নি কখনও। রেকর্ড করবার মেজাজ আর তাঁর কোনদিন ফিরে আসে নি।

রমজান খাঁর গলা কেমন মিষ্টি ছিল, সে বিষয়ে একটি চমৎকার কথা আছে। কথা না বলে কথা কাটাকাটি বললেই ঠিক হয়। সে একটি গানের আসরের ঘটনা। সেখানে বিশ্বনাথ রাওয়ের সঙ্গে একটি 'মনোজ্ঞ বচসা' হয়ে যায় রমজান খাঁর। সে কথা বলবার আগে বিশ্বনাথ রাওয়ের একটু পরিচয় দেওয়া ভাল।

ওস্তাদ বিশ্বনাথ রাও তখনকার কলকাতার আর একজন প্রতিষ্ঠাবান গায়ক। জাতিতে মারাঠী ব্রাহ্মণ, সঙ্গীতজ্ঞ পরিবারের সন্তান। সঙ্গীত-শিক্ষা হয় প্রধানতঃ পিতা সদাশিব রাওয়ের অধীনে, কাশীতে। পরে বাংলা দেশে চলে আসেন এবং প্রায় সমগ্র সঙ্গীত-জীবনই কলকাতায় কাটে। বাংলার সঙ্গীতাসরে ধামার গানে তিনি এত সুনাম অর্জন করেন, ধামার তাঁর দ্বারা এমন প্রচলিত হয় বাংলা দেশে যে তাঁর নামই হয়ে যায় বিশ্বনাথ ধামারী। তিনি ধ্রুপদ ও তেলেনাও অতি দক্ষতার সঙ্গে গাইতেন। সার্গম আর বাঁটের কাজে এমন পারদর্শী কলাবত খুবই কম ছিলেন তখনকার কালে। অনেক আসরেই তিনি প্রথমে ধ্রুপদ গেয়ে অতি পরিপাটি-ভাবে ও মুন্সিয়ানার সঙ্গে ধামার গাইতেন। বাঁটের সুনিপুণ কারুকর্মে-ভরা আর সার্গমের চমৎকারিত্বে তাঁর ধামার এক অভিনব উপভোগের বস্তু হয় বাঙ্গালী শ্রোতাদের পক্ষে। শ্রোতাদের মাতিয়ে দিয়ে বিশ্বনাথ রাও ধামারের এখানে প্রচার করলেন।

বাংলা দেশে বছরের পর বছর বাস করে তিনি এ দেশেরই একজন হয়ে যান। বাঙ্গালীদের সঙ্গেই তাঁর মেলামেশা ছিল বেশি, যদিও থাকতেন বড়বাজার অঞ্চলে, বাঁশতলায়। বাংলায় বেশ ভালই কথাবার্তা বলতে পারতেন। বাঙ্গালীদের সঙ্গে অনেক সময় বাংলাতে কথা বলতেন, উচ্চারণে একটু পশ্চিমী টান দিয়ে ; বাংলা গানও তিনি কিছু কিছু গাইতেন। তাঁর যে গানের রেকর্ড হয়েছিল, তা প্রায় সবই বাংলা গান। তাঁর গানের রেকর্ডের এক সময় বাংলায় বেশ চলন ছিল। সেই—'হর হর হর, বম্ বম্ বামে শোভে গৌরী' (প্রভাতী) ও 'এমন দিন কি হবে তারা' (কাফি সিন্ধু)। এই গান দুটির রেকর্ড নং—পি, ৮৬১। তাঁর আর একখানি গানের রেকর্ড ছিল—'তারা তারা তারা বলে কবে আমার প্রাণ যাবে' (ছায়ানট)। তা ছাড়া, 'রাখ রাখ মিনতি মম আজিকে গো রাই' (খাম্বাজ), 'জাল ফেলে যম রয়েছে বসে' (বেহাগ), 'মুই অধমের অধম' (আশাবরী, তেতালা), ইত্যাদি।

বাংলার সঙ্গীতক্ষেত্রে ধামারের প্রচলন ভিন্ন বিশ্বনাথ রাওয়ের আর কি দান ও সম্মানের আসন ছিল, তা তাঁর শিষ্যদের কথা স্মরণ করতে বোঝা যায়। বিখ্যাত গায়ক লালচাঁদ বড়াল তাঁর একজন শিষ্য। লালচাঁদের অবশ্য অন্য গুরুও ছিলেন। রাওজীর কাছে বিশেষ করে তিনি শেখেন ধামার ও সার্গম। প্রসিদ্ধ পাখোয়াজী ও ধ্রুপদী সতীশচন্দ্র দত্ত (দানীবাবু) বিশ্বনাথ রাওয়ের কাছে ধ্রুপদ ও ধামার শিক্ষা করেন। ধ্রুপদী অমরনাথ ভট্টাচার্য ও নাটোররাজ যোগীন্দ্রনাথ রায়ের অন্যতম সঙ্গীত-গুরু বিশ্বনাথ রাও। 'সঙ্গীত সঙ্ঘ'-সম্পাদক

ও ওজস্বী কণ্ঠে বন্দেমাতরম্ গানের জন্যে বিখ্যাত গায়ক ব্রজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও তাঁর শিষ্য। তা ছাড়া, ধ্রুপদী বিনোদবিহারী মল্লিক (পাখোয়াজী গোপাল মল্লিকের কনিষ্ঠ পুত্র), প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ (অধ্যাপক ঈশানচন্দ্র ঘোষের পুত্র), শ্রীরামপুরের সতীশচন্দ্র ঘোষ, মেদিনীপুরের প্রবোধচন্দ্র দত্ত, লালচাঁদের জ্যেষ্ঠ পুত্র কিষণচাঁদ বড়াল, ২৪ পরগণার রাজপুরের আশুতোষ চক্রবর্তী, ভোলানাথ পাঠক, মানদা প্রভৃতি অনেকেই বিশ্বনাথের শিষ্য।

স্যর আশুতোষ চৌধুরী ও প্রতিভা দেবী পরিচালিত 'সঙ্গীত-সঙ্ঘ'এর তিনি কণ্ঠ-সঙ্গীতের অধ্যাপক ছিলেন। 'সঙ্গীত-সঙ্ঘ' যে কত উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীত-শিক্ষাকেন্দ্র ছিল তা আজকের দিনে স্মরণযোগ্য। ওস্তাদ কৌকভ ও করামতুল্লা খাঁ ভ্রাতৃদ্বয়, তবলাগুণী দর্শন সিং, সেতার-সুরবাহার বাদক ইম্‌দাদ খাঁ, ওস্তাদ লছমীপ্রসাদ মিশ্র, গঙ্গা গিরি প্রভৃতির মতন ব্যক্তিরা বিভিন্ন সময়ে এখানে শিক্ষাদান করে গেছেন। সে-সব কথা একটি পৃথক নিবন্ধের বিষয়।

শিষ্যদের শেখাবার বিষয়ে বিশ্বনাথ বিশেষ উদার ছিলেন। উপযুক্ত পাত্রে সঙ্গীতবিদ্যা দান করতে তিনি কখনও কার্পণ্য করতেন না, সে যুগের অনেক পেশাদার ওস্তাদের যে গুণের অভাব ছিল। তাঁর অবিবাহিত-অপত্যহীন হওয়াই তার কারণ নয়। এ সম্বন্ধে তাঁর স্বভাবের মধ্যেই একটি প্রসন্ন ঔদার্য ছিল—এই তাঁর কয়েকজন শিষ্যের অভিমত।

নাটোর মহারাজার সঙ্গীতসভায় তিনি অন্যতম সম্মানিত কলাবত ছিলেন। এবং তাঁর শিষ্য যোগীন্দ্রনাথের পিতা, মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় মাঝে মাঝে পাখোয়াজ সঙ্গত করতেন তাঁর গানের সঙ্গে।

কিন্তু বিশ্বনাথজীর গানের বিষয়ে একথা থেকেই যায় যে, তাঁর কণ্ঠে মিষ্টত্ব কিংবা মাধুর্য ছিল না। আর তাই নিয়েই রমজানের সঙ্গে তাঁর সেই আসরের প্রসঙ্গ। সে আসরে তাঁদের মধ্যে যে তর্কাতর্কির ইঙ্গিত করা হয়েছে তা রাগের রূপ বা বিন্যাস নিয়ে কিছু নয়—যা নিয়ে সেকালের আসরে শ্রোতাদের সামনেই গায়ক বাদকের মধ্যে ঝুটোপুটি বেধে যেত। এ ঘটনাটি তেমন কিছু নয়। অন্তত বিশ্বনাথ রাও তেমন কিছু হতে দেন নি। রম্‌জান খাঁর একটি অপ্রিয় মন্তব্যকে বিবাদের দিকে এগিয়ে না দিয়ে কথার মোড় ঘুরিয়ে দেন অন্যদিকে। সুরের আসরে অসুরের আবির্ভাব ঘটে নি। সেটি ছিল এক ঘরোয়া আসর।

তখন সে আসরে গানের পালা সবে সাঙ্গ হয়েছে। সকলে কথাবার্তা বলছেন। রম্‌জানের সঙ্গে বিশ্বনাথের আগে কি কথা হয়েছিল, জানা যায় নি।

হঠাৎ শোনা গেল, বিশ্বনাথজীকে খাঁ সাহেব বলছেন, 'কেয়া হ্যায় হ্যায় হ্যায় হ্যায় করতা। গলেমে তো স্বরস্‌সতী ঝাড়ু মার দিয়া।'

অর্থাৎ, হ্যায় হ্যায় করে কি সুরের কাজ দেখাচ্ছ? গলায় তো সরস্বতী সম্মার্জনী প্রয়োগ করেছেন—মিষ্টত্বকে একেবারে ঝাঁটা দিয়ে বিদায় দিয়েছেন।

বিশ্বনাথের গলা একটু কড়া ছিল, একথা ঠিক- অঘোরনাথ চক্রবর্তী তো তাঁর সম্পর্কে বলতেন, 'পাহারাওলার গলা।' কিন্তু তাই বলে একজন সমব্যবসায়ীর পক্ষে অমন ভাষায় দশজনের সামনে তা বলাও শোভন নয়। কণ্ঠে মিষ্টত্ব থাকা না থাকায় গায়কের হাত কিছু নেই। জীবনব্যাপী সাধনা করলেও কোন গায়ক মধুকণ্ঠ হতে পারেন না। কণ্ঠ-মাধুর্য স্বভাবজ। সাধনার ফলে তা মার্জিত, পরিশীলিত হতে পারে মাত্র। রূপ-লাবণ্যবতী তরুণীর সৌন্দর্যে যেমন তার নিজের কৃতিত্ব কিছু নেই। তবে সুরমুগ্ধ শ্রোতা বা রূপমুগ্ধ দর্শক এ দার্শনিক তত্ত্বে ভুলবে কেন? সে বিচার করবে তার প্রাপ্তি দিয়ে, তৃপ্তি দিয়ে। মধুকণ্ঠের, তনু-সৌন্দর্যের আকর্ষণ কোন যুক্তিতে রোধ করা যায় না। তেমনি সৌন্দর্যময়ী তার রূপের জন্যে গরবিনী থাকে, কিন্নর-কণ্ঠ গায়কও গৌরব বোধ করে কণ্ঠের জন্যে।

সে যা হোক, শ্রোতাদের সামনে তাঁর কণ্ঠ নিয়ে এই নিষ্ঠুর বিদ্রূপেও বিশ্বনাথজী বিচলিত হলেন না। হলে একটা হাতাহাতি হয়ে যেত সেদিন। বরং রম্‌জানের মন্তব্য এক রকম স্বীকার করে নিলেন। আর প্রকারান্তরে ওই দার্শনিক তত্ত্বটি আশ্রয় করলেন—মনোরম-কণ্ঠ না হওয়া তাঁর নিজের দোষে নয়, যেমন নিজের গুণে নয় রম্‌জানের মধুকণ্ঠ হওয়া!

খাঁ সাহেবের কটু ভাষণের উত্তরে তিনি সপ্রতিভ ভাবে বললেন, তুম্‌হারা কেয়া? নারায়ণ কণ্ঠ্ দিয়া, তব্ ফুটানি মারতা!

অর্থাৎ, তোমার আর কি? নারায়ণ অমর গলা দিয়েছেন, তাই ফটর ফটর করতে পারছ!

রমজানের কণ্ঠের কত বড় প্রশংসাই করলেন তিনি। ব্যাপারটির ওইখানেই সমাপ্তি ঘটেছিল।

তবে সেদিন বিশ্বনাথজীকে অমনভাবে শোনালেও, নিজের গলা নিয়ে রম্‌জান বড় একটা অহঙ্কার করতেন না। বরং বিনয়ী ছিলেন এ বিষয়ে। বিনয় প্রকাশ করতেনও বেশ অভিনব কায়দায়। বলতেন, 'কল্‌কাত্তা আজব শহর্। হাম্‌সে গানা সুন্‌তা হ্যায়!'

অর্থাৎ—কলকাতা একটা অদ্ভুত জায়গা। তাই এখানে লোকে আমার

মুখে গান শোনে। আমার আর কি এমন আছে গাইয়ে হিসেবে? আমি আবার গাইয়ে নাকি? আমি তো আসলে সারেঙ্গীয়া।

প্রথম জীবনে রমজান সারেঙ্গীই ছিলেন। সারঙ্গ সঙ্গে করেই তিনি জোয়ান বয়সে কলকাতায় আসেন, জীবিকা অর্জন করতে। কলকাতায় তাঁর সারেঙ্গী বলেই সুনাম হয়। সারঙ্গ বাজাতেন নাকি চমৎকার। হাতও খুব মিষ্টি ছিল। এখানকার অনেকের গানের সঙ্গেই তখন সারঙ্গে সঙ্গত করেছেন আসরে। অঘোরনাথ চক্রবর্তী তাঁর অনেক গানের আসরে তাঁকে কতবার নিয়ে গেছেন নিজের গানের সঙ্গে বাজাবার জন্যে। তাঁর সারঙ্গ সহযোগিতা অঘোরবাবু গাইবার সময় বড় পছন্দ করতেন। সারঙ্গ বাজাবার জন্যে ১৫ টাকা মুজরো নিতেন রমজান।

তিনি কাশীর লোক। মায়ের মৃত্যুর পর কলকাতায় আসেন সারঙ্গওয়ালা হয়ে। তবে তারও আগে তিনি গাইয়েই ছিলেন। তালিমও পান গলায়। আর নিজের 'ঘরে'ই সে শিক্ষা। গান দিয়ে আরম্ভ করে পরে ধরেন সারঙ্গ। কারণটা ঠিক জানা যায় না। পেশার প্রয়োজনেও হতে পারে। সারঙ্গ-সঙ্গতে হয়তো নগদ-প্রাপ্তির সুযোগ পেয়ে যান বেশী। মিষ্টি হাতের ওস্তাদী সঙ্গতের জন্যে বোধ হয় মহ্ফিল্ ভালই হতে থাকে। তাঁর গানের কথা তখন চাপা পড়ে যায় আসরে। আত্মভোলা শিল্পী নিজেও সে কথা উত্থাপন করেন নি।

অথচ আপনার 'ঘরে', মায়ের কাছেই রীতিমত তালিম পেয়েছিলেন গানে। বারাণসীর বিখ্যাত টপ্পা-গায়িকা ইমাম বাদী রমজানের জননী। কাশী নরেশের সঙ্গীতসভায় নিযুক্ত গায়িকা ইমাম বাদী। তাঁর কাছে খুব কম বয়স থেকেই রমজান গান শিখেছিলেন।

টপ্পা গানে খুব নাম ছিল রমজান-জননীর। ঘরানা টপ্পা-গায়িকা হিসেবে তিনি সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। রমজান ভিন্ন তাঁর আর একজন শিষ্যের কথা জানা যায়, যিনি বাংলার এক শ্রেষ্ঠ টপ্পা-শিল্পী বলে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি হলেন—রাণাঘাটের নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—নগেন্দ্রনাথ দত্ত, নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (পদ্মবাবু) প্রভৃতির সঙ্গীতগুরু। গুরুভাই রমজান খাঁর সঙ্গে ভট্টাচার্য মশায়ের সঙ্গীতক্ষেত্রে বরাবর একটি প্রীতির সম্পর্ক ছিল।

কাশীতে মায়ের কাছে রমজানের গান-শিক্ষা। তার পর মায়ের মৃত্যুতে তাঁর কলকাতায় বসতি। তার আগেও নাকি একবার রমজান কলকাতায় এসেছিলেন। কিন্তু তা কিছুদিনের জন্যে। সে সময় তিনি কলকাতায় দু-এক জায়গায় গানও গেয়েছিলেন। কিন্তু তখন তাঁর সে গানের কথা কেউ মনে রাখে নি।

পরে তিনি কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে এলেন, পেশাদার সারঙ্গী হয়ে। কলকাতার সঙ্গীতের আসরে তাঁর সারঙ্গওয়ালা বলেই ক্রমে নাম-ডাক হয়ে গেল। এখানকার সঙ্গীত-সমাজে তাঁকে পরিচিত করতে অনেকখানি সাহায্য করেছিলেন—পাখোয়াজী কেশবচন্দ্র মিত্র। অঘোরবাবু সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন বলেও রম্‌জান অনেক আসরে আমন্ত্রণ পেতেন।

সারঙ্গ-বাজিয়ে রম্‌জান গাইয়ে রম্‌জান বলে পরিচিত হন ঘটনাচক্রে। বৌবাজারের একটি সঙ্গীতাসর তাঁর এই রূপান্তরের উপলক্ষ্য হয়েছিল। সেদিনের আসরে তাঁর হঠাৎ গানের খেয়াল যদি না হত, আরও কতকাল তিনি বাংলা দেশে সারঙ্গওয়ালা থেকে যেতেন, কে জানে।

সেদিনকার আসরের গল্প তিনি নিজেই বলতেন পরবর্তীকালে। গল্প নয়, সত্যি ঘটনা। তিনি শিষ্যদের কাছে নিজে না বললে, সে-সব কথা আর জানা যেত না।

রম্‌জান সেদিন হাঁটতে হাঁটতে চলেছিলেন বৌবাজারের একটি গলি দিয়ে। হিদারাম ব্যানার্জী লেন।

এই গলির মধ্যে যেটি দেওয়ান-বাড়ি বলে পরিচিত, সেটি সেকালে সঙ্গীতের আসরের জন্যে প্রসিদ্ধ ছিল। অনেক বড় বড় জল্‌সা এখানে হয়ে গেছে। বহু বিখ্যাত ওস্তাদ এখানকার আসরে তাঁদের গুণপনার পরিচয় দিয়েছেন। এই আসরের কথা তখন সকলেরই জানা ছিল কলকাতার সঙ্গীত-সমাজে। এ বাড়ির কর্তারা সঙ্গীত ও সঙ্গীতজ্ঞদের পৃষ্ঠপোষক বলে সুপরিচিত ছিলেন।

রম্‌জান তখনও সারঙ্গ-বাদক। আর সেই সূত্রে এখানকার আসরে কয়েকবার যোগ দিয়েছেন। সারঙ্গ বাজিয়ে এখানে সুনাম ও গৃহকর্তার স্বীকৃতি পেয়েছেন। এ আসর রম্‌জানের বিশেষ জানাশোনা।

বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় তিনি বুঝতে পারলেন, দোতলার সেই ঘরে আসর বসেছে।

তখন সন্ধ্যে পার হয়ে গেছে। রাস্তায় বেশি শব্দ নেই। সে-যুগের কলকাতায় এত যান্ত্রিক আর নানা রকমের আওয়াজ শোনা যেত না। তাই তিনি রাস্তা থেকেই দোতলার আসরের গান স্পষ্ট শুনতে পেলেন। আর দাঁড়িয়ে একটু শুনেই তাঁর বড় ভাল লাগল।

তিনি সে আসরে তখন যাবার জন্যে এ পথে আসেন নি। অন্য জায়গায় যাচ্ছিলেন। কিন্তু সেই গান এত ভাল লাগল যে, থমকে দাঁড়িয়ে শুনলেন খানিকক্ষণ। গান তখনও চলেছে। গানের টানে তিনি উঠে এলেন দোতলায়।

গৃহকর্তা তাঁকে দেখতে পেয়ে আসরে সামনের দিকে খাতির করে বসালেন। আর রম্‌জান তন্ময় হয়ে শুনতে লাগলেন গান।

খানিকক্ষণ পরে গান শেষ হতে, কর্তা কথায় কথায় রম্‌জানকে বললেন, 'খাঁ সাহেব, যদি যন্তরটা আনতেন তা হলে বেশ এখন শোনা যেত।'

রমজান জবাব দিলেন—'আমাকে তো আর আপনি মহ্‌ফিলে নেমন্তন্ন করেন নি। আমি তাই শোনাবার জন্যে তৈরি হয়ে আসি নি।'

মুখে একথা তিনি বললেন বটে, কিন্তু মনে তখন তাঁর সুর জেগেছে। ওই গায়কের গান তাঁর প্রাণে সাড়া তুলে ঘুম ভাঙিয়েছে তাঁর গানের। ওই গান শুনে তিনি নিজের মধ্যে গানের প্রেরণা অনুভব করেছেন।

তাই তাঁর কথায় যখন গৃহকর্তা বললেন, 'নেমন্তন্ন আপনাকে আমি এখনই করতে পারি। কিন্তু আপনার যন্তর কোথায়?'

তিনি তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, 'যন্তর আমার সঙ্গেই আছে।'

বলে আঙুল তুলে নিজের গলার দিকে ইঙ্গিত করলেন।

—'আপনি কি গান গাইবেন? তা হলে বেশ তো, আরম্ভ করুন।'

তার পর যথারীতি রম্‌জান অনুরুদ্ধ হলেন গান গাইতে। এবং গান আরম্ভ করলেন।

সে আসর বেশ বড় আর উঁচুদরের। আরও কয়েকজন গুণী গায়ক-বাদক রয়েছেন। আগেকার গানের ফলে শ্রোতায় পরিপূর্ণ সে আসর তখন জম্‌জমাট। এমন আসরে রম্‌জানের এই প্রথম গান। কলকাতার শ্রোতা এমন প্রকাশ্যে সারঙ্গ-বাদক রম্‌জান খাঁর গান তার আগে শোনেন নি।

সেখানকার শ্রোতারা মুগ্ধ-বিস্ময়ে পরিচয় পেলেন তাঁর এই নতুন গুণের। গান তাঁর খুবই ভাল হল, বলা যায় আসর মাৎ। এমন মধুর কণ্ঠ তাঁরা কমই শুনেছেন।

সেই আসর থেকেই মুখে মুখে তাঁর গানের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। অনেক আসর থেকে তাঁর ডাক আসতে লাগল গানের জন্যে। তাঁর গান কোন আসরে একবার হলে, আবার সেখান থেকে বায়না পেতে লাগলেন।

এমনি করে তাঁর কলকাতায় গায়ক-জীবন আরম্ভ হল। সারঙ্গ বাজনাও তাঁর তখনও চলত। অনেক আসরে সারঙ্গও তিনি বাজাতেন মুজ্‌রো পেলে।

কিছুদিন ধরে গান আর সারঙ্গ দুই চলতে লাগল তাঁর। পরে সারঙ্গের মহ্‌ফিল্‌ ক্রমেই কমে এল। আর বাড়তে লাগল তাঁর গানের আসরের সংখ্যা।

শেষ পর্যন্ত তিনি পুরোপুরি গায়কই হয়ে গেলেন। আসরে তাঁর গানেরই জয়-জয়কার পড়ে গেল।

বাংলা দেশ। তাই বাঙ্গালী শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে রইলেন তাঁর মধুকণ্ঠের গুণে। অবশ্য শুধুই কণ্ঠ-মাধুর্য তাঁর সম্বল ছিল না। গানের জন্যে যা যা দরকার সবই ছিল রম্‌জানের। যেমন তৈরি গলা, তেমনি সুরের কাজ, তেমনি গানের বন্দেশ, আর রাগের রূপবন্ধ। টপ্পা এবং টপ্‌ খেয়াল অঙ্গ।

কলকাতা সত্যিই কিছু আজব শহর নয় যে, নির্গুণকে মাথায় তুলেছে। গুণগ্রাহী কলকাতা গুণের কদরই করেছে। রম্‌জান খাঁর জন্ম দিয়েছে কাশী। গায়ক রম্‌জানের সৃষ্টি ও লালন-পালন করেছে কলকাতা। কলকাতার পক্ষে এ কম গৌরবের কথা নয়।

কে জানে, বাংলায় না এলে রম্‌জান হয়তো সারঙ্গওয়ালাই থেকে যেতেন। এদেশে এসে তিনি হলেন অমৃতকণ্ঠ টপ্পাগায়ক। আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে—টপখেয়াল গায়ক।

জন্মস্থান কাশীতে তাঁর সংস্থান হয় নি। জীবিকার সন্ধানে তিনি চলে আসেন বাংলা দেশে। এসে ভালই করেছিলেন। বাংলা তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। শুধু প্রাণে নয়, সঙ্গীত-শিল্পী রূপেও।

তাঁর অনুপম কণ্ঠে অভিনব টপ্‌-খেয়াল পদ্ধতির গান বাঙ্গালী মুজ্‌রো দিয়ে শোনে। মাসের পর মাস। বছরের পর বছর। রম্‌জান তো এদেশে কম দিন থাকেন নি। পঞ্চাশ বছরেরও বেশী বাংলায় বাস করেছিলেন তিনি।

অতি অল্পে তুষ্ট থাকতেন রম্‌জান। মুজ্‌রোর ব্যাপারেও। দশ টাকা মুজ্‌রো দিয়ে তাঁকে আসরে নিয়ে আসা তেমন শক্ত ছিল না। পনেরো টাকা হলে তো কথাই নেই। এমন কি, শিষ্য বা তেমন কোন আলাপী লোক হলে পাঁচ টাকাতেও রম্‌জান রাজি।

কলকাতার বহু আসরে তাঁর গান হয়েছে। তা ছাড়া, কলকাতা থেকে অনেক দূরে দূরেও লোকে তাঁকে আসর করতে নিয়ে গেছে। মফঃস্বলের কত আসরে তাঁর গান হয়েছে। কলকাতায় তো কথাই নেই। মুজ্‌রো দিয়ে গান শুনেও কখনও কখনও শেষ হয় নি। কোন কোন সঙ্গীতপ্রেমী তাঁকে নিয়মিত বেতন দিয়ে মাসের পর মাস নিজের সঙ্গীতাসরে যুক্ত রেখেছেন। যেমন, মজিলপুরের হেমচন্দ্র দত্ত। তাঁর আসরে মাসিক আশী টাকায় এক সময়ে রম্‌জান থেকে এসেছেন।

শুধু আসরে গান শোনাই কি সব? এই গীতি-রীতি, এই সঙ্গীত-সম্পদ্‌

আহরণ করে নিতে হবে। নিজেদের মধ্যে আত্মস্থ করে নিয়ে গাইয়ে হবে এমনি ধরনে। নচেৎ এই সুচারু সুর-সঞ্চয় ওস্তাদের সঙ্গেই মাটিতে মিশিয়ে যাবে।

অতএব এমন জিনিস শিখে নাও যে যত পার। যার ক্ষমতা আছে সে শেখ মন-প্রাণ দিয়ে। আর ওস্তাদের যখন এমন দিল্‌দরিয়া মেজাজ! এত অল্পে তিনি যখন সন্তুষ্ট! মাসে কিছু করে টাকা তাঁকে দাও, নিষ্ঠা আর গান তুলে নেবার ক্ষমতা দেখাও—তিনি ঢেলে দিয়ে শেখাতে কসুর করবেন না।

রম্‌জান খাঁর কাছে যাঁরা এখানে গান শিখলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিখ্যাত হলেন। যাঁরা বিখ্যাত হলেন না নানা কারণে, তাঁরাও পেলেন অনেক কিছু যা তাঁরা আবার তাঁদের শিষ্যদের মধ্যে দান করতে পারলেন।

বাংলা দেশ তাঁর কাছে কি পেয়েছে, এদেশে পশ্চিমী টপ্পা ও টপ্‌খেয়ালের ধারায় তাঁর দান কতখানি, তা তাঁর শিষ্যদের তালিকা থেকে অনেকটা বোঝা যায়। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ব্যক্তি তাঁর কাছে সঙ্গীতশিক্ষা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের কথা উল্লেখযোগ্য।

প্রসিদ্ধ গায়ক লালচাঁদ বড়াল তাঁর অন্যতম শিষ্য। লালচাঁদের যদিও আরও একাধিক ওস্তাদ ছিলেন, কিন্তু রম্‌জানের রীতিই তিনি তাঁর গানে বেশী অনুসরণ করতেন। গায়কীতে লালচাঁদের স্বকীয়তা ছিল বটে, কিন্তু তিনি প্রধানতঃ টপ্‌খেয়াল-পদ্ধতির গায়ক। সে গানের রীতি-নীতি এবং তান-লহরাতে রম্‌জানের প্রভাব সর্বাধিক।

তেলিনীপাড়ার জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রম্‌জানের একজন যথার্থ শিষ্য। সঙ্গীত-জগতে কালোবাবু নামে সুপরিচিত এই গুণী গায়ক কণ্ঠ মাধুর্যের জন্যে বরণীয় ছিলেন। রম্‌জানের গানের কারুকৃতি কালোবাবুর কণ্ঠে চমৎকার ফুটে উঠত এবং তিনি গণ্য হতেন বাংলার এক শ্রেষ্ঠ টপ্পা-গায়ক বলে।

শিবপুরের বিখ্যাত অন্ধ-গায়ক নিকুঞ্জবিহারী দত্তও রম্‌জানের কাছে তালিম নিয়েছিলেন। নিকুঞ্জ দত্ত অঘোরবাবুর শিষ্য ছিলেন ধ্রুপদ ও ভজনে আর রম্‌জানের কাছে টপ্‌খেয়াল ও টপ্পা-অঙ্গের শিক্ষা পান।

শিবপুরে রম্‌জান খাঁর একজন প্রকৃত শিষ্য ছিলেন, ফণীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়। মধুকণ্ঠ ফণীশঙ্কর টপ্পা-রীতি অতি নিপুণভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। রম্‌জানের অতি প্রিয়শিষ্য ফণীশঙ্করের অকালমৃত্যু না ঘটলে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ গায়ক বলে খ্যাতিমান্ হতেন সুমিষ্ট কণ্ঠ ও মনোরম গায়কীর জন্যে।

যে সুকণ্ঠ গায়ক গগনচন্দ্র দাসের "বিদ্যাসুন্দর" যাত্রা এক সময়ে বাংলা

দেশে সুবিখ্যাত হয়েছিল তাঁর "সুন্দর"-এর গীতিভূমিকার জন্যে, তিনিও রম্‌জানের কাছে সঙ্গীত-শিক্ষা করেছিলেন।

গিরিবালা নাম্নী এক পেশাদার গায়িকারও ওস্তাদ ছিলেন রম্‌জান। আর খাঁ সাহেব বলতেন যে, তাঁর কাছে যাঁরা গান শেখেন তাঁদের অনেকের চেয়ে গিরিবালার গলা ভাল আর গান গাওয়া ভাল। এই গায়িকার গান রেকর্ড হয়েও এককালে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করে।

খ্যাতিমতী গায়িকা আখ্‌তারি বাঈ, যাঁর ৫০ খানিরও বেশি গানের রেকর্ড আছে মেগাফোন কোম্পানীতে, রম্‌জানের কাছে গান শিখেছিলেন।

সানাইবাদক ফর্জন আলী ও সুরবাহারী মানোয়ার সুলতান (নবাব টিপু সুলতানের এক বংশধর) রম্‌জানের কাছে রাগ শিক্ষা করেন।

শেষোক্ত তিনজন অবাঙ্গালী হলেও বসবাস করেছিলেন বাংলায়।

মহম্মদ খাঁর শিষ্য এবং বাংলার গুণী সুরবাহার-বাদক জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ও রম্‌জানের কাছে রাগবিদ্যার কিছু পাঠ নিয়েছিলেন।

বিখ্যাত গায়ক ও গুণী লক্ষ্মীনারায়ণ বাবাজীরও খাঁ সায়েবের কাছে টপ্পা-সংগ্রহের কথা তাঁর সঙ্গীতশিক্ষার প্রসঙ্গে অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে।

এ'টালি অঞ্চলের সুগায়ক এবং কয়েকটি সঙ্গীত-গ্রন্থ প্রণেতা হৃষিকেশ বিশ্বাস রম্‌জান খাঁর আর একজন শিষ্য। তিনি দীর্ঘ ২০ বছর ওস্তাদের সঙ্গ করেছিলেন।

কৌকভ ও করামতুল্লা খাঁ ভ্রাতৃদ্বয়ের শিষ্য সেতার-বাদক ননী মতিলাল রম্‌জানের শিক্ষাও কিছু পেয়েছিলেন।

সঙ্গীতক্ষেত্রে বাংলার এক সর্বতোমুখী গুণী, বিশেষ করে ধ্রুপদী ছিলেন মোহিনীমোহন মিশ্র। তিনি একজন উৎকৃষ্ট টপ্পা-গায়কও। তাঁকে কেউ কোন ওস্তাদের কাছে টপ্পার তালিম নিতে শোনে নি—রম্‌জানের কাছেও না। কিন্তু সত্যের খাতিরে বলতে হয়, তিনিও রম্‌জানের এক শিষ্য। তবে বিচিত্র রকমে। রম্‌জান যখন ফণীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়কে তাঁর শিবপুরের বাড়িতে তালিম দিতে যেতেন, তখন মোহিনীমোহন ছিলেন ফণীশঙ্করের প্রতিবেশী এবং শেষোক্তের কাছে তবলাবাদক বলে পরিচিত। মোহিনীবাবু নিয়মিত ফণীশঙ্করের বাড়ি এসে তাঁর গানের সঙ্গে তবলা সঙ্গত করতেন। ফণীবাবুর রেওয়াজের সময় শুধু নয়, রম্‌জান খাঁ যখন তাঁকে তালিম দিতেন, তখনও। রম্‌জান ফণীশঙ্করকে সপ্তায় দিন-দুয়েক তালিম দিতে আসতেন। আর সেই সময়েও তাঁদের গানের সঙ্গে সঙ্গত করতেন মোহিনীমোহন।

রম্‌জান ফণীশঙ্করকে তালিম দিতেন। কিন্তু তাঁদের দুজনের কেউই জানতেন না যে, সেই সব গান আর তান মনে মনে তুলে নিচ্ছেন সেই তবলচি। মোহিনীবাবুর টপ্পা-'শিক্ষা' ও সঞ্চয়ের মূল এইখানে। তাই তাঁকে রম্‌জানের শিষ্যশ্রেণীর একজন বললে বোধ হয় ভুল হবে না।

বাংলার সুপরিচিত ও প্রবীণ টপ্পা-গায়ক কালীপদ পাঠকও রম্‌জান খাঁর কাছে কিছুদিন শিখেছিলেন। পাঠক মশায় আগে শিবপুরে থাকতেন। রম্‌জান সেখানে যখন যেতেন, সে সময় কিছু কিছু শেখবার সুযোগ পান কালীপদবাবু। পাঠক মশায় ফণীশঙ্কর ও নিকুঞ্জবিহারী দত্ত দুজনের কাছেই যাতায়াত করতেন। তাঁর সঙ্গীতশিক্ষা প্রধানতঃ নিকুঞ্জবাবুর কাছেই ঘটে। রম্‌জানকেও তিনি সেখানেই বেশী পেতেন।

রম্‌জানের আর একজন ভাল শিষ্য ছিলেন খিদিরপুরের শরৎচন্দ্র দাস। শরৎবাবুর খ্যাতি বৃহত্তর সঙ্গীতসমাজে ছড়াবার সুযোগ হয় নি। ব্যবসায়িক কাজকর্মের অবসরে নিয়মিত বাড়ির বৈঠকখানায় গানের আসর বসাতেন। প্রথম জীবনে তিনি কৌকভ খাঁর কাছে সরোদ শিখেছিলেন কিছুদিন। কিন্তু পরে যন্ত্রে তৃপ্তি না পেয়ে রম্‌জানের কাছে অনেক বছর টপ্‌খেয়াল শেখেন। নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি গান শিখেছিলেন, আর নিষ্ঠার সঙ্গে গাইতেনও। কণ্ঠে তাঁর মাধুর্য ছিল, দরদ ছিল, তাল-লয়ে নিপুণ তানকর্তব পরিপাটি ভাবে তিনি করতেন। তা ছাড়া, মোহিনী মিশ্র মশায় লেখককে বলেন যে, শরৎবাবু রম্‌জানের কাছে যেমনটি শিখেছিলেন সেই চালেই গাইতেন।

এতক্ষণ যাঁদের কথা বলা হল তাঁরা ভিন্ন নরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ প্রভৃতি রম্‌জানের অন্য শিষ্যও ছিলেন। কারণ তাঁর কাছে গান শেখবার ঢালাও সুযোগ ছিল।

বিশ্বনাথ রাওয়ের মতন বাংলা দেশে শেষ পর্যন্ত বসবাস করে রম্‌জানও যেন এদেশের একজন হয়ে গিয়েছিলেন। বিশ্বনাথজীর চেয়ে তিনি আরও অনেক বেশীদিন ছিলেন এখানে। কারণ, তিনি আরও দীর্ঘজীবী। ভাঙা ভাঙা বাংলা বলতে পারতেন। বুঝতেন আরও বেশী। কয়েক বাংলা গানও তিনি শিখেছিলেন। তেমন তেমন আসরে ফরমায়েশ হলে সেই বাংলা টপ্পা তিনি বেশ দরদের সঙ্গে গাইতেন, তাঁর ঈষৎ বাঁকা পশ্চিমী উচ্চারণে।

তাঁর যে-সব বাংলা গান পছন্দ ছিল, তাদের মধ্যে এই ক'খানির নাম করা যায়। প্রথমেই বলতে হয়, বাংলা টপ্পা-গানের রাজা নিধুবাবুর সেই মনোরম গানটি—'কি যাতনা যতনে মনে।'

তার পর, 'কি দেখে এলাম সই যমুনারি কূলে' (ভৈরবী)। আর একখানি

ভৈরবীর (তেতালা) গান—'হায় হায় একি দায় নিশি পোহাইল।'

এই শেষের গানটি তাঁর একটি আসরে গাইবার একটি হৃদয়গ্রাহী বিবরণ পাওয়া যায়। রম্‌জান সে আসরে প্রথমে পাঞ্জাবী টপ্পা গেয়েছিলেন। শেষে গান ওই বাংলা টপ্পাটি।

এই গানের আসর হয়েছিল এণ্টালিতে। জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ নামে সেখানকার এক গায়কের বাড়িতে।

এটি এক ঘরোয়া আসর। দুর্গাপূজার নবমীর রাত্রে এই গানের আসরটি হয়েছিল। আসর বড় না হলেও অনেক গুণীজন সেখানে ছিলেন। এণ্টালির মধুর-কণ্ঠ ধ্রুপদী (অঘোরবাবুর শিষ্য) হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রম্‌জান খাঁ প্রভৃতি আরও কয়েকজন গান করেন সেদিন।

তখন মাঝ রাত। ওস্তাদ রম্‌জান তাঁর ঘরানা টপ্পা ধরেছেন। অন্যান্য গায়কদের গান হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁরা সবাই বসে রয়েছেন রম্‌জানের গান শোনবার জন্যে। এবং একমনে শুনছেন গৃহকর্তা, জিতেন্দ্রনাথের পিতা, হুঁকো হাতে দরজায় দাঁড়িয়ে। সেখান থেকেই সকলকে অভ্যর্থনা করেছেন, তামাকু সেবনের সঙ্গে সঙ্গে গানও শুনেছেন। তখনও শুনছেন।

অপূর্ব মনে হল তাঁর রম্‌জানের গান। খাঁ সাহেব গান শেষ করতে, তিনি মুখ থেকে হুঁকোটি নামিয়ে তাঁকে বললেন, 'অনেকের গান এই ঘরে আগে হয়ে গেছে। কিন্তু এমন গান আমি এখানে শুনি নি। তা শুনেছি, খাঁ সাহেব বাংলা গানও জানেন। আজ এই পুজোর রাত্তিরে যদি একখানি বাংলা গান শোনান, বড় ভাল হয়।

রাত আর তখন বিশেষ বাকি নেই। ভোর হতে আর অল্পক্ষণ আছে। রম্‌জান রাজি হয়ে ভৈরবীতে ধরলেন—

হায় হায় একি দায়
কেন নিশি পোহাইল।
চরণে চন্দন জবা
মঙ্গলঘট শুকাইল॥
লম্বোদর নিয়ে কোলে,
ভাসিতেছে নয়ন জলে,
কৈলাসেতে যাবে চলে,
এ কি প্রমাদ ঘটিল॥

গান হবার সঙ্গে ওদিকে ভোরও হয়েছে। নবমীর উৎসব-রাত্রি শেষ হয়ে

বিজয়া-দশমীর প্রত্যুষ। বিসর্জনের শান্ত-করুণ সকাল। গানের সঙ্গে প্রভাতী পরিবেশের কি অপরূপ মিলনই ঘটল। গানের ভাব, ভাষা আর সুরের সঙ্গে বিজয়ার উষাকাল একাকারে মিলে গেল। দুর্গাপূজার বিসর্জনের আভাস যেন ফুটে উঠেছে দশমীর ভোরের আকাশে। পিতার রাজসদন ছেড়ে পুত্র-কোলে উমা দরিদ্র স্বামীর গৃহে চলে যাবেন, কৈলাসে। বাতাসে যেন সেই পৌরাণিক বিদায়ের হাহাকার বাস্তব হয়ে মিলে গেছে। রমজানের দরদভরা কণ্ঠের মাধুর্য—উদাসী ভৈরবীর উদাস-করা রূপ আর উমার দুঃখ একাকারে মিশিয়ে দিয়েছে।

রমজানের চোখ দিয়ে ভাবাবেগে জল পড়ছে। ভাবাবেশে হরিবাবুর মতন ধ্রুপদীর চোখও তখন অশ্রুসজল। সমস্ত শ্রোতার মনে ঝঙ্কার দিয়ে উঠছে উমা আর ভৈরবীর বেদনা একাত্ম হয়ে—

কেন নিশি পোহাইল।
চরণে চন্দন জবা
মঙ্গলঘট শুকাইল।…

রমজান খাঁ এমনি গান গাইতেন। একদিকে যেমন ভাবের ভাবুক, অন্যদিকে তেমনি সিদ্ধ ওস্তাদ। ইচ্ছে হলে ওস্তাদী ফলাতেন। নানারকম কায়দা-কানুন মুন্সিয়ানা দেখিয়ে দিতেন।

আসরে তিনি গাইতেন টপ্পা আর টপ্‌খেয়াল। কিন্তু ধ্রুপদ গান যে জানতেন না, বা গাইতে পারতেন না, তা নয়। আগেকার প্রায় সমস্ত ওস্তাদই, আসরে যে-রীতির গান করুন না কেন, ধ্রুপদ অল্প-বিস্তর চর্চা করে রাখতেন। কারণ, রাগসঙ্গীতের ভিত্তিমূলে যে ধ্রুপদ, এ বাস্তব জ্ঞান তাঁদের ছিল। তাই তাঁরা অনেকেই ধ্রুপদ শিখতেন। বিনা ধ্রুপদে ভারতীয় সঙ্গীত-শিক্ষা পাকা হয় না। এই ছিল নিষ্ঠাবান্ সঙ্গীতজ্ঞদের—কি গায়ক, কি যন্ত্রীর—ধারণা। খেয়াল-গায়ক আলী বক্স ও কালে খাঁ, সুরবাহার-সেতার-বাদক ইম্‌দাদ খাঁ, ঠুংরির রাজা গণপৎ রাও, বীণ্‌কার বন্দে আলী খাঁ—কত আর নাম করা যাবে এখানে, এমন কি গহরজান, মাল্‌কাজান প্রভৃতি বাঈজীরা পর্যন্ত, তানসেনের পুত্র ও কন্যার ধারায় প্রত্যেক গুণী রবাবী, বীণ্‌কার, সুরশৃঙ্গার-বাদক কিংবা সেতারী ধ্রুপদে প্রাজ্ঞ ছিলেন।

রমজানও ধ্রুপদ জানতেন। তবলার গানকে ধ্রুপদ করে গাইতেন, ইচ্ছে হলে। বিভিন্ন গীতিরীতির ওপর, রাগ-তাল আর লয়ের ওপর তাঁর এমন দখল ছিল।

গানের আগে আলাপ করা পছন্দ করতেন না রম্‌জান খাঁ। তিনি এই রকম বলতেন—আলাপচারী করবে নবীশেরা। রাগ বিস্তারের বাঁধা ধাপে ধাপে ভর দিয়ে তারা এগিয়ে যাবে। কিন্তু যারা ওস্তাদ, তাদের আলাপের আবার দরকার কি? আলাপের সব জিনিস তারা গানের মধ্যে দরকার মতন বিস্তার করে দেখাবে।

এখানে বলে রাখা যায়, ধ্রুপদী অঘোরবাবুরও মত অনেকটা এই ধরনের ছিল। তিনিও গানের আগে আলাপচারী করতেন না।

রম্‌জান আলাপচারী রীতিমত করতে পারতেন না বলে যে এ ধরনের কথা বলতেন, তা নয়। আলাপের সম্বন্ধে ওই ছিল তাঁর আন্তরিক ধারণা। ইচ্ছে করলে তিনি আলাপচারী দস্তুরমতন করতে পারতেন। যেমন একদিন করেছিলেন তালতলার একটি বাড়ির আসরে।

সেদিন তিনি ইমনের আলাপ শুনিয়েছিলেন। শুনিয়ে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ করে দিয়েছিলেন আসরের শ্রোতাদের। ইমনের আলাপচারী যে এমন বিস্তারিত হতে পারে তা তাঁর সেদিনের অনেক শ্রোতারই অভাবিত ছিল।

যথারীতি তিনি উদারা গ্রাম থেকে রাগালাপ আরম্ভ করলেন। তার পর মুদারায় উঠে স্বরবিহার করতে লাগলেন আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে। শ্রোতারা অবাক্ হয়ে শুনছেন—খাঁ সাহেব কতক্ষণ ধরে ইমনের কি চিত্তরঞ্জক সৌন্দর্য সৃষ্টি করে চলেছেন। কিন্তু কই, ষড়জ তো স্পর্শ করছেন না একেবারে। কড়ি মধ্যম, পঞ্চম আর গান্ধারের কি লীলা-বিলাসই দেখাচ্ছেন। আবার খাদের নিখাদে নেমে কি মনোরম ভঙ্গিতে চক্রাকারে উঠে যাচ্ছেন রেখাব গান্ধার দিয়ে। এই ঊর্ধ্বযাত্রার শেষে তারাগ্রামের কাজ দেখিয়ে, বিচিত্র পথে স্বরের ঝর্ণা নেমে আসছে। গান্ধারের সৌন্দর্য খুলে দিয়ে রম্‌জান রেখাবে এসেছেন, নিখাদে নামলেন। এই বুঝি দাঁড়াবেন ষড়জের ওপর ভর করে। ষড়জে ফিরি ফিরি করেও কিন্তু ফিরলেন না। তাকে স্পর্শ না করে আবার আঁকাবাঁকা দোলায় উঠে গেলেন। শ্রোতাদের সাগ্রহ আশা পূর্ণ হবার পূর্ব মুহূর্তেই যাত্রা করলেন অচিন্ত্য পথে। শ্রোতাদের উৎকর্ণ রাখলেন, আগ্রহ জাগিয়ে তুললেন নতুন সম্ভাবনায়। শ্রোতারা বিরক্তি বা পুনরুক্তি বোধ করা দূরে থাক, অনাস্বাদিত আনন্দ অনুভব করলেন।

এমনিভাবে বহুক্ষণ ধরে ইমনের বিস্তার দেখাতে লাগলেন ষড়জকে একেবারে না ছুঁয়ে। তার পর এমন অতর্কিত চমক সৃষ্টি করে ষড়জে এসে দাঁড়ালেন যে শ্রোতারা এক রমণীয় আরাম বোধ করে হাল্‌কা হলেন।

শ্রোতাদের এমনই উত্তেজনায় উৎকণ্ঠ রেখেছিলেন এতক্ষণ ধরে।

তার পর আরও খানিকক্ষণ আলাপচারী চলল। শেষে তিনি গান ধরলেন।

শ্রোতারা আসরের শেষে রম্‌জানের সম্বন্ধে একটি নতুন ধারণা নিয়ে গেলেন। গায়ক রম্‌জানের একটি অনাবিষ্কৃত পরিচয় তাঁরা লাভ করলেন সেদিন।

শ্রোতাদের সম্মোহিত করবার মতন কণ্ঠ যে তাঁর ছিল, একথা তাঁর সমসাময়িক গায়করাও সকলে জানতেন এবং মানতেনও। বিশ্বনাথজীর কথা আগেই বলা হয়েছে। অঘোরবাবুরও একটি গল্প আছে, বলবার মতন।

অঘোরবাবুর কণ্ঠ-লালিত্যের পরিচয় নতুন করে দেবার দরকার নেই। তাঁর মতন গায়কও রম্‌জানের কণ্ঠকে কতখানি পরোয়া করতেন, এই ঘটনাটি থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

রম্‌জান তখনও আসরে সারঙ্গ বাজাতেন, মুজ্‌রো হলে। আবার গাইয়ে বলে নামও করেছেন। সকলে তাঁর মধুকণ্ঠের পরিচয় পেয়েছেন। অঘোরবাবু রম্‌জানের সারঙ্গের সঙ্গত নিজের গানের সঙ্গে খুবই পছন্দ করতেন। তাই তাঁকে সারঙ্গওয়ালা করে নিয়ে যেতেন নিজের গানের আসরে।

এমনই এক সময়ের কথা।

অঘোরবাবুর গানের সঙ্গে সারঙ্গ বাজাবার জন্যে রম্‌জান এসেছেন। অঘোরবাবুও আসরে উপস্থিত। গান আরম্ভ করবার আগে তাঁদের গল্পসল্প হচ্ছে। কথায় কথায় রম্‌জান কি বেফাঁস বলে ফেললেন।

এখন, খাঁ সাহেবের সুরের নেশার সঙ্গে আকারান্ত ওই ব্যাপারটা ছিল। তিনি জলপথে ভ্রমণ করতে বড় ভালবাসতেন। তবে গভীর জলে নয়। সারাদিন ধরে একটু একটু আর কি। যদু ভট্ট, মুরাদ আলী প্রভৃতির তুলনায় এককালীন মাত্রা অনেক কম।

সে যা হোক, আসরের মধ্যে রম্‌জানকে বেফাঁস বলে ফেলতে দেখে অঘোরবাবুর ভাল লাগল না। তিনি ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গে বললেন, আঃ, কি 'ইয়ে'মি হচ্ছে?

এই তিরস্কার শুনে খাঁ সাহেবের মনে ভারি দুঃখ হল। বড় অভিমান হল তাঁর।

—কেয়া? 'ওঘোর' হামকো 'ইয়ে' বোলা?

এ আসরে আজ তিনি বাজাবেন না। আর থাকবেন না এখানে।

বিনা বাক্যব্যয়ে যন্ত্রটি তুলে নিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তার পর গুট্ গুট্ করে বেরিয়ে এলেন আসর থেকে।

অঘোরবাবু এতটা ভাবেন নি। তিনি, গৃহকর্তা আর আসরের কেউ কেউ রম্‌জানকে উঠে পড়তে দেখে তাঁকে ডাকাডাকি করতে লাগলেন।

—এ কি খাঁ সাহেব, কোথায় যাচ্ছেন? বসুন, বসুন। শুনছেন?

না। খাঁ সাহেব আর কোন কথা শুনবেন না। কিছুতেই থাকবেন না এখানে। তাঁর মনে বড় লেগেছে। এত লোকের সামনে 'ইয়ে' বলেছেন 'ওঘোর'বাবু!

কারও কথায় কর্ণপাত না করে দোতলা থেকে নীচে নেমে এলেন, একেবারে বাড়ির বাইরে। কিন্তু চলে গেলেন না। রাস্তার ধারে, বাড়ির চওড়া রোয়াকের ওপর বসলেন, পাশে সারঙ্গটি রেখে। তখন মনে তাঁর দুষ্ট সরস্বতীর উদয় হয়েছে।

তিনি ঠিক করলেন, সেইখানেই বসে গাইবেন। সেই দেয়ালের ওপরকার দোতলায় অঘোরবাবুর আসর হবার কথা, যেখান থেকে তিনি চলে এসেছেন।

এখন সেই দোতলায় আসরের ঠিক নীচে, রাস্তার ধারের রোয়াকে তোড়জোড় করে বসলেন গান গাইবার জন্যে। নিজের সামনে চাদর না কাগজ কি একটা বিছিয়ে দিলেন, যাতে লোকে পেলা দেয়। তার পর একেবারে গলা ছেড়ে গান আরম্ভ করলেন।

ওদিকে গৃহকর্তা যখন দেখলেন যে, রম্‌জান আর ফিরে আসবেন না, তখন অঘোরবাবুকে বিনা সারঙ্গেই গান গাইতে অনুরোধ করলেন।

তখন আসরে খবর এল যে, রম্‌জান নীচে রোয়াকে বসে গান আরম্ভ করেছেন। অঘোরবাবু তা শুনে রম্‌জানের উদ্দেশে একটা অম্ল-মধুর মন্তব্য করে বললেন, এই রেঃ, আজ দেখচি গাইতে দেবে না।

কিন্তু আসরের সকলের কথায় তিনি গান আরম্ভ করলেন। তাঁর নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও।

নীচে রম্‌জানের গান তখন বেশ জমে উঠেছে। রাস্তায় ভিড় জমে গেছে। এমন মধুকণ্ঠের গান এত কাছে হচ্ছে শুনে অনেক শ্রোতা দাঁড়িয়ে পড়েছে রাস্তায়। পেলাও পড়তে আরম্ভ করেছে। দু পয়সা, চার পয়সা, দু আনা।

একে রম্‌জানের গলা। তার ওপর আবার তিনি ক্ষুব্ধ মনে জেদের সঙ্গে গাইছেন। তাঁর সুর ভেসে আসতে লাগল ওপরের আসরে। আসরের শ্রোতাদের মন সেই সুর যেন কেড়ে নিতে লাগল। শ্রোতারা অন্যমনস্ক হয়ে

পড়লেন। অঘোরবাবুর চিত্তও বিক্ষিপ্ত হল। তাঁর গান ছাপিয়ে উঠল রমজানের গান। তাঁর সুরকে যেন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিলে রম্‌জানের সুর। ভারে নয়, ধারে।

অঘোরবাবু গান বন্ধ করলেন। এখানে কি করে গান হবে? বরং এক কাজ করলে ভাল হয়। রম্‌জানকে এই আসরে নিয়ে এলে গানবাজনা হতে পারে। অঘোরবাবু বললেন রম্‌জানকে ধরে নিয়ে আসতে।

আসরের সকলেরই সেইরকম ইচ্ছে।

তখন আসরের পক্ষ থেকে আবার রম্‌জানকে ওপরে আসবার জন্যে বলতে যাওয়া হল।

—চলুন খাঁ সাহেব। গাইছেনই যখন, এখানে কেন? আসরে গিয়ে গাইবেন চলুন।

সামনের রাস্তা তখন উদ্‌গ্রীব শ্রোতায় ভরে রয়েছে।

রম্‌জান গান থামিয়ে পেলায় পয়সা গুণতে লাগলেন। অনেক জমেছে—পয়সা, আনি, সিকি, দু আনি। হিসেব করে দেখলেন, পনেরো টাকার কিছু বেশিই হয়েছে।

এখানকার আসরে তাঁর পনেরো টাকা মুজ্‌রোর কথা ছিল। তাই রম্‌জান পেলা উঠিয়ে পকেটে পুরলেন। সেলাম করলেন রাস্তার শ্রোতাদের। সেলাম ঠুকলেন আসরের পক্ষ থেকে যাঁরা বলতে এসেছিলেন, তাঁদেরও। তবে আজ আর তিনি গান করবেন না। রোজগার হয়ে গেছে।

সারঙ্গটি বগলদাবা করে রম্‌জান রাস্তায় নেমে পড়লেন। ওপরে গাইতে গেলেন না কিছুতেই।

অঘোরবাবুর আসর সেদিনকার মতন পণ্ড!

জীবনের শেষ পর্যন্ত রম্‌জানের কণ্ঠ সতেজ ও সুরসাধ্য ছিল। শরীর ছিল সুস্থ, সুপটু। কলকাতার একদিক থেকে আর একদিক তিনি অক্লেশে পায়ে হেঁটে যাতায়াত করতেন।

শ্যামবর্ণ গায়ের রঙ, মাঝারি গড়ন, উচ্চতাও মাঝামাঝি। মুখে-চোখে একটি আত্মসমাহিত ভাব। পরনে আধ-ময়লা পাজামা, জামা। শিষ্যবাড়ি কি অন্য কোথাও যাতায়াত করতে মাইলের পর মাইল হাঁটতেন। সর্বদাই বেশ একটা সুখী সন্তুষ্ট ভাব, খুশি মেজাজ। রাস্তায় চলতেন আপনার ভাবে আপনি মগ্ন হয়ে। আর তেমন তেমন দোকান দেখলে একবার টুক্ করে ঢুকে

পড়তেন। ঢুক্ ঢুক্ করে একটু চলত।

মৃত্যুর একদিন আগেও অনেকটা পথ প্রদক্ষিণ করে এসেছেন। অসুখ বলতে কিছু ছিল না, বোঝবার মতন। তখন তাঁর বয়স কত হয়েছিল, তা সঠিক জানা যায় না। খাঁ সাহেবের নিজেরও বয়সের হিসেব কিছু ছিল না। জিজ্ঞেস করলে বলতেন, কেয়া মালুম!

তাঁর এক শিষ্য হৃষীকেশ বিশ্বাস বলেন যে, খাঁ সাহেবের বয়স নব্বই বছর হয়েছিল। লেখকের মনে হয়, তার চেয়ে কয়েক বছর কম হতে পারে। রম্‌জানের এই ফটোটি তোলা হয় তাঁর মৃত্যুর দুবছর আগে, হৃষীবাবুর কুড়ি হাজরা বাগান লেনের (এণ্টালি) বাড়িতে। ছবি দেখে অষ্টআশী বছর-বয়সী মনে হয় না।

সে যাই হোক, রম্‌জান সে-সময় একদিন হৃষীবাবুকে বললেন যে, তাঁর মিঠাই খেতে ইচ্ছে হয়েছে।

শিষ্য ওস্তাদের সে সাধ মেটালেন। কিন্তু তখনই তাঁর মনে একটা খট্‌কা লাগল—ওস্তাদ মিষ্টি খেতে চাইলেন! কিন্তু 'ইয়ে' লোকের পক্ষে এটা তো বড় অস্বাভাবিক! ভাবতে ভাবতে নিজের বাড়ি ফিরে এলেন।

তার একদিন পরে আবার ওস্তাদের বাড়ি গেলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে।

রম্‌জান, জীবনের শেষ ক'বছর, চাঁদনী অঞ্চলের একটি মাঠকোঠায় থাকতেন। ৫, নীলমণি হালদার লেন। সেখানে রম্‌জান বাস করতেন নিজের সংসারে। পত্নী বিগতা, কন্যারা ছিলেন। হৃষীবাবু সেখানে বিকালে যেতে খাঁ সাহেবের বড় মেয়ের সঙ্গে দেখা হল। আর তাঁর মুখে শুনলেন স্তম্ভিত হয়ে—রম্‌জান আর নেই! গতকাল রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন! আজ দুপুরে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়ে গেছে ; আর কিছু বাকি নেই। সব শেষ!

এ কি আশ্চর্য! পরশু দিনও যে মানুষের কোন অসুখ জানা যায় নি, যিনি হেঁটে বেড়িয়েছেন, মিষ্টি চেয়ে খেয়েছেন—তার পরের দিনই তাঁর সমস্ত শেষ?

তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর মতন আরও এক বিস্ময়ের ব্যাপার—কেমন করে মৃত্যু এল! সঙ্গীতশিল্পীর পক্ষে তার চেয়ে মহনীয় মৃত্যু আর কি হতে পারে?

রম্‌জানের পরলোক গমনের বিবরণ তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা এইভাবে হৃষীবাবুকে দিয়েছিলেন :

"বাপ্‌জান তাঁর বিছানায় শুয়েছিলেন। আমরা ভেবেছিলুম, তিনি ঘুমোচ্ছেন। রাত তখন এগারটা কি বারোটা হবে, জানি না। হঠাৎ বাপ্‌জান

আমায় বললেন, 'আমাকে বসিয়ে দে'। শুনে আমার একটু আশ্চর্য লাগল। কোনদিন তো এমন বলেন না। যা হোক, তাঁর কথা মতন হাত ধরে তাঁকে বিছানাতেই বসিয়ে দিলুম, দুদিকে দুটি বালিশ দিয়ে। তিনি তার পর বললেন, 'একতারাটা এনে দে।' দেয়ালে একটা একতারা টাঙানো থাকত। কখনও বিশেষ তা বাজাতেন না। সেটি সেখান থেকে পেড়ে এনে বাপ্‌জানের হাতে দিলুম। তিনি একতারার সুরটা একটু ঠিক করে নিয়ে, গান গাইতে লাগলেন। সঙ্গে ওই একতারার তারে সুরের রেশ তুলে। সে কি গান, আপনাকে তার কি বর্ণনা দেব। আপনারা তো বাপ্‌জানের অনেকদিন অনেক গান শুনেছেন। কিন্তু আমার মনে হয়—তেমন গান বোধ হয় আপনারাও শোনেন নি, কাল যা বাপ্‌জান গাইলেন। সে কি তন্ময় হয়ে, কি দরদের সঙ্গেই যে গাইতে লাগলেন। টপ্‌ টপ্‌ করে জল ঝরতে লাগল চোখ দিয়ে। তিনি যেন আত্মহারা হয়ে গেয়ে গেলেন। খানিক পরে গান শেষ করে একতারাটি কোল থেকে পাশে নামিয়ে রাখলেন। তার পর আস্তে আস্তে শুয়ে পড়লেন, বালিশে মাথা দিয়ে। শুয়ে, ঘুমিয়ে পড়লেন। সে ঘুম আর ভাঙল না। আমরা তখনই বুঝতে পারি নি কিছু। একটু পরে আমরা তাঁকে ডাকতে লাগলুম—'বাপ্‌জান, বাপ্‌জান!' কিন্তু আর তাঁর কোন সাড়া পাওয়া গেল না।"

মঙ্গুবাঈয়ের কণ্ঠে জয়দেবের পদাবলী

কোথায় বারো শতকের রাঢ়ভূমিতে অজয় নদীর তীরে কেন্দুবিল্ব গ্রামের পদ-রচয়িতা জয়দেব, আর কোথায় বিশ শতকের প্রথম পাদে গোয়ালিয়রের ধ্রুপদ-গায়িকা মঙ্গুবাঈ! কত যুগ-যুগান্তরের, কত দূরত্বের ব্যবধান! কিন্তু এই দুস্তর কালের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেছে, সঙ্গীত। জয়দেবের পদাবলী যে শুধু কাব্য রূপে নয়, সঙ্গীত স্বরূপেও তার আবেদন বিশ শতক পর্যন্ত হারায় নি, তা মঙ্গুবাঈয়ের গানে আর একবার প্রমাণিত হল।

আরও লক্ষণীয়, মঙ্গুবাঈ যে জয়দেবের পদাবলী গাইলেন, তার গীতি-রীতি। বাংলা দেশে জয়দেবের কোমলকান্ত পদ সাধারণত কীর্তনগানের আসরেই শোনা যায়। বৈষ্ণবভাবের চির-মাধুর্যময় এই পদাবলী কীর্তনাঙ্গে বাঙ্গালীর কাছে অতিশয় হৃদয়স্পর্শী। বৈষ্ণব গায়ন-সমাজ জয়দেবকে ভক্ত কবিরূপে গ্রহণ করে তাঁর লীলামধুর পদাবলী তাঁদের নিজস্ব-গীতি এই কীর্তন-রীতিতে আস্বাদ

করেছেন এবং গৌড়জনদের মনে আবেগবিধুর রসমাধুরীর অনুভব ঘটিয়েছেন।

কিন্তু মঙ্গুবাঈ জয়দেবের পদ গাইলেন পূর্ণাঙ্গ ধ্রুপদ পদ্ধতিতে। আসরটিও ছিল শুধু ধ্রুপদ গানের এবং বাংলার কয়েকজন সুপরিচিত ধ্রুপদী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বাংলা দেশের সেই এক বিশিষ্ট আসরে, গুণগ্রাহী বাঙ্গালী শ্রোতাদের সামনে গোয়ালিয়রের স্বনামধন্যা ধ্রুপদ-গায়িকা গেয়ে শোনালেন বাংলা তথা ভারতের এক শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতবিদ্ কবির পদাবলী। বাংলার সঙ্গীতাসর বলেই পশ্চিম ভারতের এই গায়িকা বোধ হয় আগ্রহ করে জয়দেবের পদ শোনালেন। কিন্তু কবির নিজের দেশে এমন ধ্রুপদাঙ্গে তাঁর পদাবলী গান এক অভিনব বস্তু। এখানকার শ্রোতাদের এ এক অভাবিত অভিজ্ঞতা। উপস্থিত বাঙ্গালী ধ্রুপদীরাও চমৎকৃত হলেন।

সে আসরের বর্ণনা করবার আগে জয়দেবের পদাবলীর প্রসঙ্গে কিছু বলা প্রয়োজন।

গৌড়ের এবং ভারতবর্ষের শেষ স্বাধীন হিন্দু নৃপতি লক্ষ্মণ সেনের রাজসভার শ্রেষ্ঠ কবি জয়দেব। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, গায়ক, নৃত্যবিদ এবং সঙ্গীততাত্ত্বিক। গীতকার এবং সুরকাররূপে জয়দেবের অমর সৃষ্টি "গীতগোবিন্দম্" গীতি-গুচ্ছ। গীতগোবিন্দের পদাবলী তিনি স্বয়ং মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সভায় গেয়েছিলেন বলে কথিত আছে। তাঁর সঙ্গীতের সঙ্গে নৃত্য করতেন তাঁর জীবনসঙ্গিনী পদ্মাবতী, যাঁর তিনি "চরণ-চারণ চক্রবর্তী"— এমন জনশ্রুতিও পাওয়া যায়।

গীতগোবিন্দের যশ ক্রমে লক্ষ্মণ সেনের রাজসভা পার হয়ে, গৌড় রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করে ভারতবর্ষের দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর সমস্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। জয়দেব এবং তাঁর পদাবলীর তুল্য এমন খ্যাত ও আলোচিত হওয়ার দৃষ্টান্ত বেশি দেখা যায় না। সমগ্র ভারতে, প্রদেশে প্রদেশে তাঁর গীতগোবিন্দের চল্লিশ খানির অধিক ভাষ্যগ্রন্থ রচিত হয়। গীতগোবিন্দের অনুকরণে অনেক কবি সংস্কৃতে কাব্য রচনা করেন যদিও তাঁদের সকলের বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণের প্রেম-কাহিনী ছিল না। রাম-সীতা বা হর-গৌরীর লীলাও অনেকে তাঁদের কাব্যের বিষয় করেছিলেন।

জয়দেবের কালে উড়িষ্যাও ছিল লক্ষ্মণ সেনের গৌড়-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এবং পুরীর মন্দিরে জয়দেব-পদ্মাবতীর সঙ্গীত পরিবেশনের কিংবদন্তী আছে। নাভাজী রচিত 'ভক্তমাল' গ্রন্থে পদ্মাবতীর নৃত্য-পটিয়সী নটীরূপে বর্ণনা পাওয়া যায়। গীতগোবিন্দে জয়দেবের 'পদ্মাবতী চরণ-চারণ চক্রবর্তী' এই আত্ম-

পরিচয়ের নাকি তাৎপর্য এই যে, তিনি পদ্মাবতীর নৃত্য-গীতের তাল রক্ষা করতেন। পুরীর মন্দিরে তাঁদের অবস্থানের এই সূত্রে আবার ইদানীং কালের উড়িষ্যার কোন কোন পণ্ডিতব্যক্তি জয়দেবকে দাবি করেন উড়িষ্যার সন্তান বলে। শিক্ষিত উড়িষ্যাবাসীদের কাছে জয়দেব কতখানি প্রিয়, তা এই থেকে বোঝা যায়। অবশ্য তাঁদের এই দাবির মূলে যে কোন সত্য নেই, তা প্রমাণ করে দিয়েছেন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিতেরা।

আধুনিক কালে ইউরোপ ভূখণ্ডে পর্যন্ত গীতগোবিন্দের জনপ্রিয়তা প্রসারিত হতে দেখা যায়। ইউরোপের বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতবর্গ কাব্যরূপে গীতগোবিন্দের প্রতি শুধু অনুরাগ প্রদর্শন করেন নি, তার রীতিমত অনুশীলন করেছেন, আপন আপন ভাষায় অনুবাদ পর্যন্ত করেছেন। গীতগোবিন্দের প্রথম মুদ্রণও হয়েছে ইউরোপে, জয়দেবের স্বদেশে নয়। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর বন্ শহরে লাসেন সম্পাদিত সংস্করণই গীতগোবিন্দের আদিতম মুদ্রণ। ইউরোপীয়দের মধ্যে গীতগোবিন্দের প্রথম অনুবাদ করেন স্যার উইলিয়ম জোন্স। তাঁর সেই ইংরেজী অনুবাদ ১৮০৭ খ্রীঃ তাঁর Collected works-এর মধ্যে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। তার পর Edwin Arnold ও একটি স্বাধীন ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন ১৮৭৫ খ্রীঃ The Indian Song of Songs নামে। এই দুটি ইংরেজী অনুবাদের মধ্যবর্তী কালে গীতগোবিন্দের জার্মান ভাষায় অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন এফ. রিউকার্ট, ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে। তার পর ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীস থেকে ফরাসী অনুবাদ করেন জি. কোর্টিলিয়ে। এমনি ভাবে বর্তমান ইউরোপের পণ্ডিত সমাজেও গীতগোবিন্দ জয়যাত্রা করেছে।

নানা কারণে পাঠক ও শ্রোতাদের চিত্ত আকৃষ্ট করে স্মরণীয় হয়ে আছে জয়দেবের এই পদাবলী। কোথাও ধর্ম-গ্রন্থ, কোথাও কাব্য, কোথাও সঙ্গীতরূপে। কোথাও বা নৃত্য-নাট্যরূপে, যেমন ভারতের দক্ষিণে তাঞ্জোর প্রভৃতি অঞ্চলে। এমন প্রেমের আবেগে প্রতপ্ত পদগুলিকে বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনেকে তাঁদের বিশিষ্ট ধর্মতত্ত্ব ও রসশাস্ত্রের নিদর্শন হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু জয়দেব ধর্মীয় প্রেরণা থেকে গীতগোবিন্দ রচনা করেছিলেন কিনা সে বিষয়ে একশ্রেণীর পণ্ডিতেরা গভীর সন্দেহ পোষণ করেন—আর রূপ গোস্বামীর রসশাস্ত্র প্রণয়নের তিন শ' বছরেরও আগে তো রচিত হয়েছিল জয়দেবের পদাবলী।

মধ্যযুগের প্রিয় বিষয়বস্তু রূপে রাধাকৃষ্ণের অপার্থিব প্রেমকে তিনি বিষয়রূপে নিয়ে গীতগোবিন্দ রচনা করেন বটে, কিন্তু তাঁর পদাবলী সুগভীর হৃদয়াবেগে

পূর্ণ ও মানবিক আবেদনে মুখর হয়ে উঠেছে। এইখানেই তার বৈশিষ্ট্য এবং এইজন্যেই হয়তো তার এত বেশি জনপ্রিয়তা। রাধাকৃষ্ণের মিলন-প্রসঙ্গ মানবোচিত নিবিড় আন্তরিকতায় সকলের অন্তর স্পর্শ করে। রাধাকৃষ্ণ-ঘটিত বিষয় অবলম্বনে সমগ্র ভারতবর্ষে কাব্য রচনার কখনও অভাব হয় নি, কিন্তু গীতগোবিন্দ এক অনন্য স্থান অধিকার করে আছে সংস্কৃত কাব্য-জগতে। বিষয়বস্তু পুরনো হলেও তা জয়দেবের নিজস্ব অনুভবের অভিনব, অনুপম সৃষ্টি।

পণ্ডিত ব্যক্তিরা গীতগোবিন্দ কাব্যের বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, জয়দেব সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে এক নতুন পথে অভিযান করেছেন। তাঁর পদ-রচনার প্রণালী ও শৈলী গতানুগতিক সংস্কৃত কাব্যকৃতির ধারা অনুসরণ না করে স্বকীয় সৃষ্টিতে উজ্জ্বল। তাঁর দৃষ্টিকোণ ও মানসিকতা অলৌকিকের সন্ধান না করে লৌকিক বা মানবিক ভাব প্রকাশে বেশি উন্মুখ। আত্মিক মিলন-গাথার চেয়ে দেহযমুনার তটে কামনার তরঙ্গধ্বনি যেন বেশি শোনা যায় তাঁর কাব্যে। তার গঠন অনেকাংশে নাটকোচিত হলেও, অন্তর্গূঢ় প্রেরণা হল 'গীতিকবিতা'! কাব্য হিসাবেও গীতগোবিন্দ সংস্কৃত ঐতিহ্য অনুকরণ না করে অপভ্রংশের (বাংলা ভাষারূপের জননী) কারুকৃতি ও প্রাণস্পন্দন ঝঙ্কৃত করেছে। ছন্দ-প্রকরণেও সংস্কৃতের চেয়ে বাংলার সগোত্র অপভ্রংশের রীতিনীতি, ভঙ্গি বেশি প্রকট। বাক্য-গঠনও সংস্কৃত ব্যাকরণের পদ্ধতির চেয়ে দেশীয় ভাষার ধারার অধিকতর অনুসারী।

তবে এ সবই গীতগোবিন্দের বহিরঙ্গের কথা। তার ভূমিকাংশ ও বর্ণনাত্মক শ্লোকগুলি প্রাচীন কাব্যরীতির ছন্দবন্ধে গ্রথিত হলেও, সুরমাধুর্যে পূর্ণ পদাবলী সঙ্গীতরূপেই রচিত হয়েছিল এবং সেই সব অপূর্ব পদের জন্যেই গীতগোবিন্দের সমাদর। সঙ্গীতরূপে গীতগোবিন্দ সমগ্র ভারতে গীত হয়েছে, তবে সর্বত্র একই পদ্ধতিতে নয়। যেমন আগেই বলা হয়েছে, বাংলাদেশে শ্রীচৈতন্যের অনুগামী কীর্তনীয়াগণ এবং ভক্তবৃন্দ জয়দেবের পদাবলী কীর্তনাঙ্গে রূপান্তরিত করেছেন। কীর্তন পদ্ধতিতে মন্দিরে, আখ্ড়ায়, আসরে গীতগোবিন্দ গেয়েছেন। তাঁদের অনুসরণে বাংলার যাত্রার পালায় এবং থিয়েটারের প্রথম যুগ থেকেও জয়দেবের পদাবলী কীর্তন-গানরূপে বহুল প্রচারিত হয়েছে। সেজন্যে বাংলায় গীতগোবিন্দ কীর্তনরূপেই সকলের কাছে সুপরিচিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রভাবে জয়দেবের পদাবলীর গীতিরীতি বাংলাদেশে যেমন কীর্তনাঙ্গে পরিণত হয়েছে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে কিন্তু এমন ঘটে নি।

কীর্তন পদ্ধতির জন্মের তিন শতাব্দীরও আগে রচিত ও গীত হয় জয়দেবের

পদাবলী। তাঁর কালে গীতগোবিন্দের সঙ্গীত ছিল 'প্রবন্ধে'র পর্যায়ভুক্ত। জয়দেব নিজেও তাঁর পদাবলীকে প্রবন্ধ বলেছেন এবং গীতগুলির সঙ্গে গেয় রাগের ও তালের নাম উল্লেখ করেছেন।

প্রবন্ধ-সঙ্গীতের অন্তর্গত ধ্রুব নামক গীত থেকেই নাকি কালক্রমে ধ্রুবপদ বা ধ্রুপদ সঙ্গীত গঠিত ও রূপায়িত হয়েছে। গীতগোবিন্দের সেই সব প্রবন্ধ রচনা ও গঠিত করেন জয়দেব ধ্রুব প্রভৃতি গানের রীতিতে, কোন কোন মহলের এই ধারণা। সেজন্যে উত্তর কালে জয়দেবের এই পদাবলী ধ্রুবপদ বা ধ্রুপদ রূপে দেখা যায়। সেই ধ্রুপদ গানেরই একটি ধারা হয়তো এসে পৌঁছেছিল গোয়ালিয়রের মঙ্গুবাঈ পর্যন্ত, যার রূপ তিনি প্রদর্শন করেছিলেন সেবারকার কলকাতার একটি ধ্রুপদের আসরে। তাঁর সেই আসরের কথার আগে জয়দেবের পদাবলীর প্রসঙ্গ আরও একটু বলবার আছে।

জয়দেবের মৃত্যুর পর তাঁর সঙ্গীতশৈলী ক্রমে লোপ পেয়ে যায়। প্রায় ২৫০ বছর পরে, ১৫ শতকের মধ্যভাগে মেবারের মহারাণা কুম্ভ, যিনি ছিলেন একাধারে মহাযোদ্ধা নৃপতি এবং সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ ও বীণ্‌কার, গীতগোবিন্দের নব-রূপায়ণ করেন। মহারাণা কুম্ভের সেই শৈলী তখনকার কালে প্রচলিত প্রবন্ধ-সঙ্গীতের এক নিদর্শন।

তাঁর আরও কয়েক শতক পরে ভারতের অন্য এক অঞ্চলে প্রচলিত গীতগোবিন্দের সঙ্গীতরূপের আর এক পরিচয় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী প্রণীত "গীতগোবিন্দের স্বরলিপি" গ্রন্থ (১৮৭২ খ্রীঃ প্রকাশিত) থেকে পাওয়া যায়। ক্ষেত্রমোহন ছিলেন বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রবর্তক রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের এক কৃতী শিষ্য এবং তিনি পুস্তকটির উপসংহারে বলেছেন যে, গীতগোবিন্দের গীতাবলী তিনি প্রথম জীবনে রামশঙ্করের শিক্ষাধীনে লাভ করেছিলেন। রামশঙ্কর ভট্টাচার্য আঠারো শতকের চতুর্থপাদে (১৭৮২-৮৩ খ্রীঃ) বিষ্ণুপুরে আগত আগ্রা-বৃন্দাবন অঞ্চলের জনৈক বৈষ্ণব-সঙ্গীতাচার্যের শিক্ষায় সঙ্গীতচর্চা আরম্ভ করেন। ক্ষেত্রমোহনকে উনিশ শতকে রামশঙ্কর যে গীতগোবিন্দ শিক্ষা দেন, তার গীতরূপ তিনি সম্ভবত লাভ করেছিলেন তাঁর পশ্চিমা, বৈষ্ণব সঙ্গীতাচার্যের কাছে। ক্ষেত্রমোহন তাঁর উক্ত গ্রন্থে গীতগোবিন্দের যে ২৫টি গানের স্বরলিপি প্রকাশ করেন, সেই ধরনের ধ্রুপদাঙ্গের গান তা হলে আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে বৃন্দাবন অঞ্চলে প্রচলিত ছিল—রামশঙ্করের সঙ্গীতগুরুর সঙ্গীতচর্চার দেশ-কালের নিরিখে একথা বোঝা যায়। তার পর জয়দেবের পদাবলীর এই গীতিরীতি প্রচলিত হয় বিষ্ণুপুর ঘরানায়।

বৃন্দাবন অঞ্চলে গীতগোবিন্দ চর্চার এক শতাব্দ পরে ভারতের অন্য এক অঞ্চলের স্বনামধন্য সঙ্গীতকেন্দ্রে সেই পদাবলী গীতির আর এক রূপের প্রচলন ছিল জানা যায়, যার এক শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিলেন মঙ্গুবাঈ। গোয়ালিয়রের ধ্রুপদ-গায়িকা এবং সেখানকার সুপ্রসিদ্ধ খেয়ালগুণী ভ্রাতৃদ্বয় হদ্দু ও হসসু খাঁর শিষ্যা মঙ্গুবাঈ। তিনি কি তা হলে গীতগোবিন্দের ধ্রুপদ-রীতির গান হদ্দু, হস্সু খাঁর ঘরে পেয়েছিলেন? সে-কথা সঠিক জানা না গেলেও গোয়ালিয়রের সঙ্গীত-সমাজে যে তা মঙ্গুবাঈয়ের আগে থেকে প্রচালিত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে হদ্দু খাঁ ও হস্সু খাঁর সঙ্গীত জীবন। উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতজগতে তাঁদের অতি সম্মানের আসন ছিল গোয়ালিয়রী রীতির খেয়াল গানের জন্যে। সেই ভারি চালের খেয়াল ছিল ধ্রুপদ-ঘেঁষা এবং ধ্রুপদ থেকে তার উৎপত্তি। হদ্দু, হস্সু খাঁ সেকালের অনেকের মতন খেয়াল অঙ্গে গাইলেও রীতিমত ধ্রুপদী ছিলেন। সেজন্যে তাঁদের তালিমে মঙ্গুবাঈ হয়েছিলেন ধ্রুপদসাধিকা।

তাঁদের সঙ্গে বাংলার সঙ্গীত-সমাজের এই সম্পর্ক ছিল যে, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সভাগায়ক গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী গোয়ালিয়রে অবস্থান করে তাঁদের কাছে খেয়াল অঙ্গের শিক্ষা পান। বাংলাদেশে মহিষাদল রাজ-বাড়ির আসরে হদ্দু খাঁ একবার সঙ্গীতানুষ্ঠান করেছিলেন, একথাও শোনা যায়।

হদ্দু, হস্সু খাঁর কাছে মঙ্গুবাঈয়ের শিক্ষা হয় গোয়ালিয়রে এবং তাঁর সঙ্গীতপ্রতিভার প্রকাশও ঘটে প্রধানত গোয়ালিয়র রাজদরবারকে কেন্দ্র করে। মঙ্গুবাঈ ছিলেন গোয়ালিয়র দরবারের বিশেষ সম্মানিত সভাগায়িকা। তিনি দরবারে তাঞ্জামে চড়ে গান গাইতে যেতেন, এমন তাঁর সমাদর ছিল সেখানে।

এ হেন মঙ্গুবাঈ সেবার কলকাতায় একটি উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীত-সম্মেলনে ধ্রুপদাঙ্গে গীতগোবিন্দ শুনিয়ে আসর মাৎ করলেন। সে হল ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের কথা এবং তিনি তখন অশীতিপর বৃদ্ধা। কিন্তু তাঁর গীতকণ্ঠ তখনও সতেজ, সাবলীল, স্বরসমৃদ্ধ। সুদীর্ঘকালের একনিষ্ঠ সাধনার ফলে তখনও তা শিল্পীর সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যেমন দেখা গেছে, খেয়ালীদের তুলনায় ধ্রুপদীরা বেশি বয়স পর্যন্ত সঙ্গীত-সক্ষম থাকেন—মঙ্গুবাঈও তার এক স্মরণীয় দৃষ্টান্ত।

কলকাতায় তিনি সেবার যোগদান করতে আসেন লালচাঁদ উৎসবের আসরে। লালচাঁদ উৎসবের পরিচয় এখানে দেবার দরকার নেই, মুস্তারি বাঈয়ের প্রসঙ্গে তা পাওয়া যাবে।

সেই উৎসবের প্রথম দিনের অধিবেশনে যে ধ্রুপদের আসর হত, সেখানেই সেদিন গাইলেন মঙ্গুবাঈ। বাংলার কয়েকজন সুপরিচিত ধ্রুপদীও সে আসরে ছিলেন। গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

বাংলাদেশের আসর বলেই বোধ হয় মঙ্গুবাঈ গীতগোবিন্দ গাইবেন স্থির করেছিলেন। ভালই হয়েছিল তাঁর এই নির্বাচন। নচেৎ জয়দেবের পদাবলীর ধ্রুপদ রূপের অভিজ্ঞতা থেকে উপস্থিত বাঙ্গালী ধ্রুপদী ও শ্রোতাদের বঞ্চিত হতে হত। মঙ্গুবাঈ-এর এই গান শোনবার পর তাঁরা একবাক্যে বলেছিলেন যে, এ বাণীর ধ্রুপদ তাঁরা আগে শোনেন নি।

তাঁর গানের সঙ্গে সেদিন মৃদঙ্গে সঙ্গত করেন গোয়ালিয়রের গুণী মৃদঙ্গী পর্বত সিং। (জোরাওয়ার সিং-এর পৌত্র ও শুকদেব সিং-এর পুত্র)।

মঙ্গুবাঈ সে আসরে এত বৃদ্ধ বয়সেও যে গুণপনা দেখালেন তাতে শ্রোতারা চমৎকৃত হয়ে যান। গীতগোবিন্দের পদাবলী সম্পূর্ণ ধ্রুপদাঙ্গে গানই যে শুধু অভিনব হয়েছিল, তা নয়। রাগের রূপায়ণ তাঁর যেমন অনিন্দ্য, তেমনি তাল-লয়ের কারুকর্মে আশ্চর্য মুন্সিয়ানা দেখান তিনি। সে এক জাত-ধ্রুপদীর যোগ্য অনুষ্ঠান।

প্রথমে চৌতালে গাইলেন বেশ বিলম্বিত লয়ে। শেষে ধামার ধরলেন। কিন্তু দুর্লভ বিশেষত্ব এই দেখা গেল যে—চৌতালে গাইবার সময়ে যে বিলম্বিত লয়ে স্থিত হন সম বিসম অতীত অনাঘাত সমস্ত মোকাম ঘুরে এসে, সেই লয়েই ধামার ধরেন। অর্থাৎ ধামার আরম্ভ করবার সময়ে লয় একেবারেই বাড়ালেন না। সাধারণত ধ্রুপদীরা কিন্তু তা করেন না। লয় বাড়িয়ে নেন ধামার ধরবার সঙ্গেই। মঙ্গুবাঈ এইভাবে যে লয়কারী দেখালেন, তা যেমন কঠিন তেমনি উপভোগ্য হল বোদ্ধা শ্রোতাদের। এমন বড় একটা শোনা যায় না। গানের বিষয়বস্তু এবং গানের রীতি দুদিক্‌ থেকে আসরের মন অধিকার করে নিলেন মঙ্গুবাঈ। এক দমে তিনি গেয়ে গেলেন।

তার পর যখন সেই অশীতিপর বৃদ্ধা গান বন্ধ করলেন, দেখা গেল, প্রায় দু-ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে গেছে তাঁর গানে।

ধ্রুপদ-সাধিকা মঙ্গুবাঈয়ের সঙ্গে ভারতীয় সঙ্গীতের একটি প্রাচীন ধারারও যেন যুগান্ত ঘটে যায়।

উত্তর ভারতে ধ্রুপদাঙ্গে জয়দেবের গীতগোবিন্দ গানের নিদর্শন আর বিশেষ পাওয়া যায় না।

স্মরণের স্বর্ণ-দেউল

বিগতযুগের বাংলা দেশে কীর্তন গানে শ্রীমতী পান্নাময়ীর ছিল অসামান্য খ্যাতি। কীর্তন গায়িকারূপে তাঁর নাম একসময়ে কীর্তনপ্রিয় বাংলার ঘরে ঘরে সুপরিচিত হয়েছিল। অর্ধ শতাব্দেরও আগে তাঁর একটি আসরের মুজ্‌রো ছিল ২০০।২৫০ টাকা। টাকার হিসেব দেওয়া হল, কেননা এটি এখন আমাদের কাছে গুণ বিচারের সবচেয়ে বড় মাপকাঠি!

তাঁর গলা যেমন ভরাট, তেমনি ছিল তার বিস্তার। সেই দরাজ গলায় সুরকে তিনি দূর পাল্লায় প্রসারিত করে দিতেন আর তার ধারা-নিঃসারে আসর ভরে যেত। 'একবার দেখা দাও হে' বলে কোন গানের কলিতে যখন উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানাতেন, তখন ফুটে উঠত হৃদয়মথিত এক অপূর্ব আকুতি। তাঁর সেই প্রাণ-আকুল-করা এবং আন্তরিকতায় উদ্বেল কীর্তন শ্রোতাদের মনে জাগাত পুলক-বেদনার বিচিত্র মাধুরী। কারণ, তাঁর কণ্ঠে সেই সঙ্গে ছিল দরদ আর মনে অনুভূতি। গানের অন্তর্নিহিত ভাবের তিনি প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতেন। কীর্তনের বাণীরূপ সুরের পাখা মেলে পৌঁছাত শ্রোতা-দের মরমে। আর সেখানে অনুরূপ ভাবের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করত।

শোক-বাসর থেকে সঙ্গীতের আসর পর্যন্ত অসাধারণ জনপ্রিয়তা ছিল পান্নাময়ীর গানের। সেই সব আসরে শোনা তাঁর কীর্তন মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে বিখ্যাত হত। যেমন, 'একবার এইখানে দাঁড়াও হে বংশীধারী,' 'উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী, কিশোরী করেছি সার' ইত্যাদি গান।

গ্রামোফোন রেকর্ডের সেই যুগে তাঁর কয়েকটি গান রেকর্ড হয়েছিল। তিন মিনিটের রেকর্ডে কীর্তন গানের রূপ সুষ্ঠুভাবে বিধৃত হতে পারে না, তবু সেই সীমাবদ্ধতার মধ্যে তাঁর রেকর্ডগুলি বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেছিল শ্রোতাদের কাছে। সেকালে যাঁদের রেকর্ড সবচেয়ে বেশি বিক্রয় হত, যাঁদের রেকর্ডের চাহিদা ছিল সর্বাধিক, পান্নাময়ী তাঁদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট। 'কি ছার দারুণ মানের লাগিয়ে বঁধূরে হারায়েছিলাম,' 'কানু কহে রাই কহিতে ডরাই,' 'ও কুব্জার বন্ধু হরি, আজ হতে রাধানাথ আর বলব না হে,' 'উঠিতে কিশোরী,

বসিতে কিশোরী' তাঁর এইসব রেকর্ডের গান একসময়ে বাংলার আকাশে-বাতাসে ভাসত আর কীর্তনপ্রিয় সবাই কান পেতে সাগ্রহে শুনত।

কণ্ঠে মাধুর্য ও দরদ, আর মনে ভাবের আবেগ যে গায়ক-গায়িকার আছে, তাঁদের কীর্তন গানে শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে থাকে। পান্নাময়ীর কীর্তন শুনেও তাই পরিপূর্ণ তৃপ্তিলাভ হত শ্রোতাদের। শ্রেষ্ঠ কীর্তন গানের জন্যে গায়ক-গায়িকার যে গুণাবলীর প্রয়োজন, তা তাঁর ছিল।

কীর্তন বাংলার এক নিজস্ব এবং অপরূপ সঙ্গীতসম্পদ্। বাংলার প্রেমের অবতার শ্রীচৈতন্যের সঙ্গীতজগতে অমৃত-মধুর দান। বাঙ্গালী চরিত্রের বিশিষ্ট হৃদয়াবেগ ও মাধুর্য, এবং বাংলার কাব্য-সৌন্দর্যের নির্যাস সুরে মিশ্রিত করে যেন কীর্তনের সৃষ্টি হয়েছে। কীর্তনের তাই এমন মর্মস্পর্শী আবেদন দেখা যায় বাঙ্গালীর প্রাণে আর মনে। পান্নাময়ীর কীর্তন সেজন্যে এত প্রিয় ছিল সেকালে। আজ থেকে অর্ধ-শতাব্দেরও আগে, তাঁর সঙ্গীত-প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের যুগে।

কিন্তু কে ছিলেন সেই পান্নাময়ী? কি তাঁর পরিচয়? অর্থাৎ তাঁর সঙ্গীত-পরিচয় ভিন্ন অন্য কিছু জানবার আছে কি?

এ প্রশ্নের উত্তর কোন পাঠক-পাঠিকা দিতে পারবেন কি না সন্দেহ!

পান্নাময়ীর সামাজিক বা পারিবারিক পরিচয় জানা বা দেওয়া হয়তো কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। সে এক অন্ধকারের যবনিকা। কে তা উন্মোচন করবে?

প্রশ্নটিও অনেকের কাছে অবান্তর, এমন কি হৃদয়হীন মনে হতে পারে। পান্নাময়ীর গায়িকা ভিন্ন অন্য কি পরিচয় থাকতে পারে, দেবার মতন? সে যুগের গায়িকাদের আবার সামাজিক পরিচয় জানতে চাওয়া কি অর্থহীন নয়? সামাজিক পরিচয় না থাকাই তো তাঁদের 'সামাজিক' পরিচয়! তাঁদের যে 'সমাজ', সে তো সমাজবহির্ভূত! সে পরিচয় তো কারুরই জানবার কথা নয়, একমাত্র সমাজ-বিজ্ঞানী ছাড়া! সেকালের গায়িকারা (অভিনেত্রীদের মতন) সমাজ-বহির্ভূত একটি বিশেষ স্তর থেকে আবির্ভূত হ'তেন, একথা, কার অবিদিত আছে?

তাই প্রশ্নটি অবান্তর বোধ করতে পারেন অনেকেই। কেন এই গায়িকাকে অকারণ সেই কলঙ্কিত পরিবেশের সঙ্গে জড়িত করে আবার স্মরণ করা? সেই কালিমাময় স্মৃতির পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজন কি?

না। সেই অসামাজিক শ্রেণী থেকে পান্নাময়ী উদ্ভূত হ'ন নি! তা যদি হতেন, তা হলে এ প্রসঙ্গের নিশ্চয়ই অবতারণা করা হত না! জন্মসূত্রে কোন

সমাজ-নিন্দিত কলঙ্ক তাঁকে স্পর্শ করে নি। সমাজের সব শিশুদেরই মতন পিতৃ-পরিচয় চিহ্নিত হয়ে তাঁর প্রার্থিত জন্ম হয় এক বিশিষ্ট পরিবারে! যার নাম উল্লেখ করলে সে বংশ বাংলার সঙ্গীতপ্রেমী পাঠক-পাঠিকাদের অনেকেই চিনতে পারবেন। সুতরাং সে পরিচয় উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব নয়—অস্বীকৃতির অতলে তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে বহুকাল আগে। আর তাকে সূর্যালোকে মেলে ধরবার কোন সার্থকতা নেই। যা গেছে, আর তাকে ফিরিয়ে আনা যাবে না। আর যাঁদের নিয়ে এই মর্মন্তুদ প্রসঙ্গ, তাঁরাও সুখ-দুঃখ সম্মান অপমানের সমস্ত চিহ্ন ইহজগতে ফেলে রেখে প্রয়াণ করেছেন চির-অজানা লোকে!

তবে পান্নাময়ীর সম্মান প্রতিষ্ঠায় সেই বিস্মৃত প্রসঙ্গের কিছু সার্থকতা আছে, উত্তরকালের দরবারে। ভাবীকালের মানুষ তাঁর সত্য পরিচয় জেনে হয়তো তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে একবিন্দু সহানুভূতির অশ্রু ফেলতে পারে।

পান্নাময়ীর সে বংশ-পরিচয় অবশ্য বিবৃত করতে হবে নাম-ধামের উল্লেখ না করে। শুধু ঘটনার বিবরণ দিয়ে। কারণ সেই সুপরিচিত কুল-পরিচয়ে তিনি পরিচিতা হতে পারেন নি। সেই তাঁর চরম দুর্ভাগ্য এবং সে দুর্ভাগ্যের জন্যে তাঁর নিজের কোন অপরাধ ছিল না।

নচেৎ 'দাসী' পদবীতে আখ্যাতা হবার কথা তাঁর নয়। সে আমলের রেকর্ডের গানের পুস্তিকা এবং অন্যান্য সূত্রে প্রকাশিত তাঁর চিত্র বা গানের সঙ্গে তাঁর নাম দেখা যায়—পান্নাময়ী দাসী! অথচ মাতৃ-পিতৃকুলের যথার্থ পরিচয়ে 'দেবী' রূপে ভূষিতা হবার অধিকার তাঁর ছিল। সে যুগের দেবী—অর্থাৎ বিগত কালের প্রথারূপে ব্যবহৃত ব্রাহ্মণকন্যার পদবী। প্রাক্-সাম্প্রতিক যুগের সিনেমাজগতে রাতারাতি যে সব দেবীদের উদয় হত (যাদের উদ্দেশে মনীষী রাজশেখর বসু মহাশয় বলেছিলেন—"সিনেমাওয়ালীরা দেবীদের জাত মেরে দিয়েছে"), তেমন দেবী পান্নাময়ী নিশ্চয়ই ছিলেন না।

তাঁর পূর্ব জীবনের কথা বলতে গেলে গল্পকথার মতন শোনাবে। সুদূর কালের ব্যবধানও তাকে অবাস্তব করে তুলেছে। অতীতের অতলে নিমজ্জিত হয়ে আছে সে কাহিনী। সেখান থেকে যদি উদ্ধার করা হয় সত্যকার বিবরণ, তবেই প্রকাশ হবে পান্নার প্রকৃত বৃত্তান্ত। জানা যাবে একটি মাটির মানুষের জীবন-ইতিহাসের এক অধ্যায়। একটি অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং একটি ছন্দপতনের ইতিকথা। আর তারই পৃষ্ঠপটে পান্নার পূর্ব-বৃত্তান্ত।

সে কাহিনীর যবনিকা উন্মোচন করতে হলে আরও কিছুকাল পিছিয়ে যেতে হবে। স্থানেরও পরিবর্তন ঘটবে। উত্তর কলকাতার যে অংশে পান্নার বাস

ছিল, যেখান থেকে তাঁর সঙ্গীতক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ হয়েছিল, তার অনেক দূরে এই ঘটনাস্থল। স্থানের নাম উল্লেখ করলে সকলেরই পরিচিত হতে পারত। কাল—আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে।

সে সময়ে সেখানে যে পরিবারটির অবস্থান ছিল, তা যেমন বৃহৎ, বাংলার সঙ্গীত জগতে তেমনি বিখ্যাত। সে বংশের নাম-পরিচয়ের বিষয়ে শুধু একটি কথা জানান যায় যে, সেই বংশ তারও আগে থেকে সঙ্গীতচর্চার জন্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। সে বিষয়ে এক ডাকে চেনবার মতন ছিল সেই পরিবার। কারণ সেই বংশের একাধিক গুণী বাংলার সঙ্গীতের আসরে নিজেদের নাম স্মরণীয় করে গেছেন। বাংলাদেশের সঙ্গীত-চর্চার ইতিহাসে অতিশয় সম্মানের সঙ্গে লেখা থাকবে তাঁদের নাম।

কিন্তু তাঁদের সঙ্গে কিংবা সঙ্গীতের সঙ্গে এই ঘটনার কোন সম্পর্ক নেই। সেই পরিবারের হলেও এ এক স্বতন্ত্র কাহিনী।

সেকালের নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ সংসার। তার এক ভিন্নতর পরিবেশ। সংস্কৃত-চর্চা থেকে আরম্ভ করে আচার-বিচার আর বিধি-নিষেধের পালন যথাযথ হয়ে থাকে। যে সময়ের কথা, তখন শাস্ত্র-চর্চার সঙ্গে সঙ্গীত-চর্চা যুক্ত আছে নামে মাত্র। তার আগে বংশে সঙ্গীত-চর্চাই ছিল প্রধান, সঙ্গীত-সাধনাই বলা উচিত। সঙ্গীতের ঝঙ্কারে পরিপূর্ণ থাকত সেই বাড়িটি, আগেকার আমলে। সে-সব সঙ্গীত-সাধকের সঙ্গে সঙ্গীত-চর্চার পাটও প্রায় তখন উঠে গেছে। সঙ্গীতকে তেমন করে অবলম্বন করে থাকবার মতন মানুষ আর তখন বংশে কেউ নেই।

তবে সঙ্গীতপ্রীতি একেবারে অন্তর্ধান করে নি। সঙ্গীতপ্রেম তখনও বজায় আছে, বিস্মৃতপ্রায় সুরের রেশের মতন। পরিবারের প্রায় সকলেই মনেপ্রাণে সঙ্গীত ভালবাসে। সুরের আবেদন ঠিক সাড়া জাগায় অন্তরে। সুরের কানও আছে। ভাল-মন্দ গানের আর সুর-বেসুরের পার্থক্য সহজাত বুদ্ধি দিয়েই এ বংশের লোকেরা বুঝে থাকে। সঙ্গীতের চর্চা আর না থাক, তার শখ আছে ঠিকই। সঙ্গীত-শিল্পী আর না থাক, সঙ্গীতের প্রতি আন্তরিক আকর্ষণ একটা আছে। সাঙ্গীতিক পরিবার বলে আগে যে নাম-ডাক ছিল তার ক্ষীণ অবশেষ দিয়ে লোকে তখনও দিত তার পরিচয়। সঙ্গীতের সেই পুরনো সূত্র ধরে বংশের উল্লেখ করত সবাই, অন্তত যারা জানত সে-সব আগেকার আমলের কথা।

সঙ্গীত-খ্যাতি আর না থাক, সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন তখন তাদের একরকম চলে

যায়। স্বচ্ছল সুখী পরিবার, শান্তিতে দিন কাটে। সেকালের নিস্তরঙ্গ, কিন্তু আনন্দময় দিন। সংঘাত-সঙ্কুল নয়, সমস্যা সংগ্রামও নেই। কাছের শান্ত নদীটির প্রায়-স্থির বুকে পাল-তোলা নৌকোর মতন একটানা তার ছন্দ।

কিন্তু সংসারে নিরবচ্ছিন্ন সুখ-শান্তি আছে কোথায়? পরিবারটির একটানা চলার ছন্দে অকস্মাৎ যতিভঙ্গ হল। নিস্তরঙ্গ সরোবরের স্থির জলে যেন লোষ্ট্রপাত হয়ে তটের কিনারা পর্যন্ত চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে গেল জলের স্তরে স্তরে। সেই পরিবারের একটি ঘটনা সংবাদ হয়ে সে অঞ্চলের লোকের মুখে ক'দিন ফিরতে লাগল। কারুর আর জানতে বাকি রইল না সেই অঘটনের কথা।

একটি তরুণী তার পরম দুর্ভাগ্যের বোঝা বহন করে সেই পরিবারে দিন যাপন করত। আশ্রিতা নয়, সেই বংশেরই আদরের মেয়ে। বাড়ির অন্য সকলের সঙ্গে মিলে-মিশে দিন চলে গেলেও, তাদের মতন জীবন তার ছিল না। তার ব্যর্থ জীবন। প্রথম যৌবনেই বিধবা হয়ে সব সাধ আনন্দ তার নিঃশেষ হয়ে যায়। একটি নবজাত শিশু কোলে নিয়ে যেদিন সে স্বামীকে হারিয়েছিল, সেদিন থেকেই তার সব সুখের জলাঞ্জলি। তার পর থেকেই শ্বশুরবাড়ির পাট চুকিয়ে তার এইখানে বাস চলছিল। তার দুর্ভাগ্যের জন্যে স্নেহে আর সহানুভূতিতে ভরা ছিল সকলের মন। আদর দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে সবাই তাকে আনন্দে রাখবার যথাসাধ্য চেষ্টা করত। জীবনের পরম অভাব অবশ্য তাতে পূর্ণ হবে না, ভাগ্য আর তাকে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না। এ কথাও সকলের জানা ছিল। তবু যতটুকু সুখে-শান্তিতে তাকে রাখা যায়! আর শিশুটির মুখ চেয়ে সে একরকম সন্তুষ্ট হয়েই থাকত। অন্তত বাড়ির সকলের সেই ধারণাই ছিল।

কিন্তু মানুষের মনোলোক বিচিত্র আর বিচিত্রতর সে মনের গহন গতি। সেই তরুণীর রুদ্ধ বুকের অন্তরালে যে তরঙ্গ দোলা দিত, বাইরে থেকে কেউ তার সন্ধান পায় নি। কেউ কল্পনাও করতে পারে নি, সেই নতমুখী মেয়েটি কোনদিন এমন নস্যাৎ করে দিতে পারে তার এতদিনের সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষা সংস্কারকে!

একদিন সকালে সেই অসূর্যম্পশ্যাকে আর দেখতে পাওয়া গেল না। বাড়িতে কোথাও নেই!

বিপদের প্রথম বিস্ময়ের মুখে তার অনুসন্ধানে চতুর্দিকে চেষ্টা করা হল। বিমূঢ় হয়ে পড়লেন বাড়ির কর্তাব্যক্তিরা। এ কি আত্মহত্যা? পুকুরে, খালে-বিলে জেলে দিয়ে জাল ফেলে তন্নতন্ন করে খোঁজা হল। সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের

বাড়ি সংবাদ গেল—এমন করে না বলে কোথাও সে কখনও যায় নি, তবু খবর নেওয়া হল আপনার লোকদের বাড়ি বাড়ি। কিন্তু কোথাও কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

এ সবই নিরুদ্দেশ হওয়ার প্রথম দিকের কথা। প্রথম উত্তেজনার সময়ে, সব দিক্ ধীরভাবে বিবেচনা করে দেখবার আগে। আর একটা সম্ভাবনা যে থাকতে পারে, এমন চিন্তা কারুর মনে তখন উদয় হয় নি। কিংবা সে কথা এতই অসম্ভব, এমন অপ্রীতিকর বোধ হয়েছিল যে, ঘৃণায় সে চিন্তা মনেও স্থান দেয় নি কেউ।

কিন্তু অবশেষে সেই নিতান্ত অনভিপ্রেত সম্ভাবনাই সত্যে পরিণত হল। জানা গেল—এটি পলায়ন। গৃহত্যাগ। কুলত্যাগ। মুখে মুখে কোথা থেকে খবর এল—সেই একই রাত থেকে জানাশোনা আর একটি বাড়ির একজনও নিরুদ্দেশ হয়েছে। বলা বাহুল্য, সে ব্যক্তি পুরুষ।

তখন থেকে সে হতভাগিনীর অনুসন্ধানের সব চেষ্টা বন্ধ হল। তার নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ হয়ে গেল পরিবারে। অথচ চেষ্টা করলে শুধু সন্ধান নয়, তার উদ্ধার করাও অসম্ভব হত না। কিন্তু সংসারে, সমাজে আর তাকে ফিরিয়ে আনা তার নিকট আত্মীয়দের কাম্য ছিল না। একটিবারের ভুলের জন্যে সমাজ থেকে একেবারে বহিষ্কার—এই ছিল রীতি। সেকালের হৃদয়হীন অর্গলবদ্ধ সমাজ! একবার কুলের বার হলে আর তার সেখানে স্থান নেই—তার পর তাকে অকুলে ভাসতেই হবে। ক্ষণিকের মোহ, বারেকের পদস্খলন—কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত আমৃত্যু অভিশপ্ত জীবন। আর অবশ্যই এ শাস্তি শুধু নারীর জন্যে। সমান, কিংবা আরও বেশি পাপী পুরুষ যে কোনদিন আবার ফিরে এসে স্বস্থানে দশজনের সঙ্গে নতুন করে সংসার পাততে পারে। সমাজে তার স্থান হয়ে যায়।

সেই তরুণীও যে সেই রাতের অন্ধকারে পুরনো জীবনকে ফেলে আর এক জগতে চলে গেল, সেখান থেকে ফিরে আসবার আর কোন পথ রইল না! একটি মায়া শুধু কাটাতে পারে নি সে। দু-বছরের কন্যাটিকে বুকে নিয়ে কুলত্যাগিনী হয়েছিল!

ফুলের মতন নিষ্পাপ, ফুলেরই মতন সুন্দর সেই মেয়েটির পরে নাম হয়—পান্না।

নতুন জায়গায় এসে নতুন করে জীবন আরম্ভ করলে পান্নার মা। কলকাতা শহরের মধ্যেই বিধবার আবার নতুন সংসার পাতা হল। কিন্তু সে অন্য

কলকাতা। সমাজের বাইরে এক অন্ধকার কলকাতা। আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দুস্তর ব্যবধান, তা অতিক্রম করবার ক্ষমতা কোনদিনই নেই। শুধু মনের অদৃশ্য সূত্র দুই প্রান্তে যুক্ত রয়ে গেল। বাইরেকার বিষম ঝড়েও তা ছিন্ন হল না। পান্নার মায়ের পক্ষে তা না-জানার না-ভোলার কথাই নেই। আকাশের চাঁদের মতন, সোনার মন্দিরের মতন তার মনোলোক আলোকিত করে রইল পূর্ব-জীবনের অক্ষয় স্মৃতি। সে এক বিচিত্র অনুভব। অদৃশ্য অন্তর্লোকে স্মৃতির শিকড় সঞ্চারিত থাকে। মানুষ ভুলতে পারে না। অন্য প্রান্তেও তেমনি এক অবর্ণনীয় যোগ রইল, যার কোন প্রকাশ নেই।

দুই তটের মাঝখান দিয়ে কালের স্রোত দুর্নিবার বয়ে চলল। সময়ের সমষ্টিতে গড়া মাস, বছর, যুগ পার হয়ে গেল অনন্তের যাত্রাপথে।

এমনিভাবে দু যুগ পার হয়ে গেছে। অল্প সময় নয়। বহু পরিবর্তন ঘটেছে এর মধ্যে। কন্যার জননীর সে-সব সংবাদের কোন প্রয়োজন নেই। সেই দু বছরের শিশুটি এখন উদীয়মানা কীর্তন-গায়িকা পান্নাময়ী!

খুব কম বয়স থেকেই তার গানের গলা লক্ষ্য করেন তার মা। মেয়ের মিষ্টি গলা আর গানের দিকে ঝোঁক দেখে মা স্পষ্টই বোঝেন, বংশের সঙ্গীত-চর্চার ধারা ঘুরে এসেছে মেয়ের মধ্যে। আর সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে—কিন্তু অন্তরের এই একটি সম্পদ কেমন অন্তঃসলিলা হয়ে বয়ে এসেছে। অথচ মূল পরিবারে সঙ্গীতের চর্চা তখন অন্তর্হিত। এ কি আশ্চর্য জীবনলীলা!

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পান্নার সুকণ্ঠ উত্তরোত্তর ফুটতে লাগল এবং তার মা মেয়ের সঙ্গে এই সম্পদটিও সযত্নে লালন-পালন করতে লাগলেন। ভিন্নতর পরিবেশে পান্নার সঙ্গীত-শিক্ষায় আর কোন বাধাও নেই। মেয়ের সঙ্গীতে নৈপুণ্য দেখে মা তার এটিকে পেশা করবার কথাও চিন্তা করলেন এবং তার নিয়মিত সঙ্গীত-শিক্ষারও ব্যবস্থা হল।

ক্রমে দেখা গেল, মেয়ের কীর্তন গানই সবচেয়ে বেশি ভাল লাগে আর কীর্তনই সে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে গাইতে। তখন তার মা বিশেষ করে মেয়ের কীর্তন শেখবার ব্যবস্থা করলেন উপযুক্ত শিক্ষকের কাছে। অতি দ্রুত পান্না কীর্তনের রীতি-নীতি গায়ন-পদ্ধতি আয়ত্ত করতে লাগল। আর অল্প বয়স থেকেই তার নাম হল, সুমধুর কীর্তন গানের জন্যে। কীর্তন-গায়িকা পান্নার খ্যাতির বৃত্ত দেখতে দেখতে বৃদ্ধি পেলে। শেষে কীর্তনই হল তাঁর জীবনের প্রধান অবলম্বন। কাছে দূরে নানা জায়গা থেকে তাঁর ডাক আসতে লাগল কীর্তনের আসরে। আর যেখানে গাইতেন সেখানে তাঁর নামে একটা

সাড়া পড়ে যেত। তাঁর গান শোনবার জন্যে আসর ভরে উঠত উৎসাহী শ্রোতায়।

পান্নাময়ীর মা মেয়ের কাছে বংশ-পরিচয় গোপন রাখেন নি। নিজের পিতৃকুলের কথা মেয়েকে সবই জানিয়েছিলেন, তার বোঝবার মতন বয়স হলে। সে যেন নিজেকে হীন না মনে করে, আত্মমর্যাদা যেন তার সদা-জাগ্রত থাকে, কারণ অতি সৎকুলে তার জন্ম। দেশের লোক জানে না, সমাজ মানে না, তবু পান্না যেন ভুলে না যায় তার বংশ গৌরবের কথা! এই চিন্তায় ব্যাকুল হয়েই তিনি মেয়ের কাছে নিজের পিতৃ-পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন। না করে পারেন নি। পান্নার গানের গলার কথায় তাকে স্মরণ করিয়ে দিতেন, কোথা থেকে এসেছে এই সঙ্গীতের ধারা। নিজে যেমন বংশ-গৌরবের বিষয়ে সচেতন ছিলেন, মেয়েও যেন তেমনি থাকে, এই তাঁর বড় ইচ্ছা ছিল। আর সেই সঙ্গে রক্তসম্পর্কের টান—তা তো কোনদিনই যাবার নয়। যত বেদনা তত আনন্দ বয়ে আনে এই নিষিদ্ধ পরিচয়-কথা।

মায়ের মুখে শোনা এই সব অতীত কাহিনী পান্নার মধ্যেও গভীরভাবে মুদ্রিত হয়ে যায়। তাঁর মনের পটে অপূর্ব মায়া-অঞ্জন এঁকে দেয় সেসব কথা এবং তিনি অদম্য আকর্ষণ বোধ করতেন সেই হারানো কুলের কথা স্মরণ করে। বিশেষ করে বড় হবার পর থেকে। সেই উৎসমূল, যার বৃন্তের ওপর দল মেলেছে তাঁর মায়ের জীবন, তাঁর নিজের জীবন—তাকে মনের সঙ্গোপনে পরম মমতায় লালন করতেন। অন্তরে সেই সুদূর স্মৃতির এক স্বর্ণ-দেউল রচনা করে অঞ্জলি দিতেন নিজেরই মনের মাধুরী দিয়ে। আর মনে তাঁর এক অদ্ভুত সাধ জাগত। প্রাণ চাইত 'সপ্ত পুরুষ যেথায় মানুষ' সেই সোনার চেয়ে দামী ভিটাকে একবার প্রণতি জানাতে সেখানে গিয়ে। সেখানকার মানুষদের কাছে গিয়ে একবার দাঁড়াতে। তাঁদের বলতে—আমি তোমাদেরই একজন। আমাকে তোমরা চেন না, কিন্তু আমি তোমাদের চিনি। আমি মনে মনে তোমাদের সঙ্গে মিশে আছি। আমি তোমাদের কাছে আর কখনও আসব না। কিন্তু তোমরা আমাকে ভুলে যেও না। মনের এক কোণে আমায় একটু ঠাঁই দিও। আমি আর কিছু চাই না তোমাদের কাছে।

এমন সাধ যে কি অদ্ভুত আর কত অসম্ভব, পান্নার নিজেরও তা অজানা নয়। তাই সে সাধের অসাধ্য সাধন করবার কথা সত্যি সত্যি মনে হয় না। শুধু একটি প্রিয় দিবাস্বপ্ন হয়ে মনের আকাশ মাঝে মাঝে রঞ্জিত করে দেয়। শুধু নিভৃত অবসরে জল্পনা-কল্পনা। নিজের মনের গহনে সুখের স্বর্গ রচনা।

কিন্তু অবশেষে একদিন সেই আকাশের স্বপ্ন মাটির কাছাকাছি নেমে এল। পান্নাময়ীর তখন গায়িকারূপে আরও প্রসিদ্ধি, আরও প্রতিষ্ঠা হয়েছে। জীবনে অর্থ ও প্রতিপত্তি লাভ করলে, যশস্বিনী হলে অনেক অভাবিত বিষয়ও সম্ভব হতে পারে। তিনিও এক অভিনব উপায় স্থির করলেন জন্মভূমি দর্শন করবার।

মায়ের মুখে শুনেছিলেন, সেই স্বর্গপুরীর সামনে আছে একটি দেবস্থান। এক প্রাচীন মন্দির। তিনি স্থির করলেন, সেই মন্দিরের চত্বরে একটি কীর্তনের আসর করবেন দেবতাকে গান শোনাবার জন্যে। সেখানে লোক মারফত সংবাদ পাঠালেন নিজের ইচ্ছার কথা জানিয়ে। এবং সেখানকার প্রধানদের কাছে অনুরোধ করলেন তাঁর এই সাধ যেন পূর্ণ করা হয়।

বলা বাহুল্য, স্থানীয় নেতৃমণ্ডলী সানন্দে সম্মত হলেন। পান্নাময়ীর মতন স্বনামধন্যা গায়িকা স্বেচ্ছায় গান শোনাতে আসতে চান—এই কথায় সেখানে সাড়া পড়ে গেল। তাঁরা তাঁকে আসবার আমন্ত্রণ জানিয়ে অবিলম্বে আসরের আয়োজন করলেন মন্দিরের বিরাট চত্বরে। প্রকাণ্ড সামিয়ানা বাঁধা হল। তার একদিকে ঘন চিকের আড়ালে মহিলাদের নির্দিষ্ট স্থান। মাঝখানে ফরাসের ওপর কীর্তনের আসর।

যথাসময়ে পান্নাময়ী সেখানে সদলে এসে উপস্থিত হলেন। বিশেষ অভ্যর্থনা জানালেন উদ্যোক্তারা। পান্নার সমস্ত ইন্দ্রিয় তখন অধিকার করে আছে একটিমাত্র চেতনা—ওই সেই জন্মস্থান আমার চোখের সামনে এতদিন পরে ধরা দিয়েছে। ওই আমার সাধের পূর্বপুরুষের ভিটা। মায়ের মুখে শুনে শুনে সে বাড়ির রূপ তাঁর মনের পটে আঁকা হয়ে আছে। সে বাড়ি চিনে নিতে তাঁর মুহূর্তও দেরি হল না। প্রাণ ভরে দেখতে লাগলেন সেই চির আপন আর চিরকালের পর বাড়িটির দিকে। শুধু ইঁটকাঠে গড়া তার বহিরঙ্গ নয়। সেই ভিটায় সুখ-দুঃখ হাসিকান্নায় ভরা জীবন্ত সংসার এখনো আছে। বেঁচে আছেন তাঁরই কত আত্মজন, যাঁরা কেউ তাঁকে চেনেন না, যাঁদের কাউকেও চেনেন না তিনি।

যত ব্যবধানই থাক, তাঁদের সেই সংসারের সামনে যে তিনি এতদিন পরে সত্যিই এসেছেন, একথা চিন্তা করেই পান্নার মন ভরে উঠেছে। পরিচিত হতে, পরিচয় পেতে, আত্মীয়তার দাবি করতে—কিছুই তিনি চান না। এখানে উপস্থিত হতে পেরেই তিনি কৃতার্থ হয়েছেন। জীবনের পরম তীর্থস্থানে আজ তিনি সমাগতা, আর কোন আকাঙ্ক্ষা তাঁর নেই। স্মৃতির

স্বর্ণ-দেউলের দ্বারে তীর্থযাত্রিণী আজ সমুপস্থিত। অন্য সকলে যাকে মন্দিররূপে দেখছে, তা তাঁর মন্দির নয়। তাঁর সোনার মন্দির ওই ভিটার মাটি।

পরিপূর্ণ সভার মাঝখানে বসে পান্নাময়ী গান আরম্ভ করলেন। তাঁর নিজের কাছে তা গান নয়, প্রাণের একান্ত আকূতি। সুরের অঞ্জলি যেন অঝোর ধারে নিবেদন করতে লাগলেন মনোমন্দিরের দেবতাকে। তৃপ্ত অন্তরের আবেগে তিনি গাইতে লাগলেন—

কি ছার দারুণ মানের লাগিয়ে
বঁধুরে হারায়েছিলাম।

উৎকর্ণ শ্রোতৃমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছেন পান্নাময়ীর সেই বিখ্যাত কীর্তন। তিনি আপন ভাবে বিভোর হয়ে আখর দিয়ে গেয়ে চলেছেন—

এমন বঁধু কার বা আছে—বঁধুর মতন গো,
এমন বঁধু আর কার বা আছে।

তাঁর অন্তস্তল থেকে সুরের মন্দাকিনী ধারা উৎসারিত হতে লাগল। আর এক বেদনা-মধুর সুধারসে পূর্ণ হয়ে উঠল সকলের মন। চক্ষু সজল।

পান্নাময়ী সেদিন নিজেই নিজেকে অতিক্রম করে গেলেন, এত দরদ দিয়ে তিনিও সচরাচর গান করেন না। শ্রোতারা উপলক্ষ্য, মন্দিরের দেবতা উপলক্ষ্য। লক্ষ্য—নিজের অন্তরাত্মা। তাকে তৃপ্তি দেবার জন্যে তিনি সুরের ডালি উজাড় করে দিয়েছেন। তাই তাঁর নিজের অনুভূতি এমন প্রাণ পেয়েছে গানের সার্থক ব্যঞ্জনায়।

আসরে চিকের আড়াল থেকে যে মহিলারা গান শুনছিলেন, তাঁদের মধ্যে পান্নার মাতৃকুলের কয়েকজন ছিলেন। তাঁরা জানতেন গায়িকার পরিচয়, অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের কথা। আর তা জেনেই তাঁরা কীর্তনের আসরে এসেছিলেন। গান শুনতে তত নয়, যত গায়িকাকে দেখবার জন্যে। আসরের পুরুষদের মধ্যেও সে পরিবারের অনেকেই ছিলেন।

পান্না অবশ্য এসব কথা জানতেন না। যাঁদের জন্যে তাঁর সমস্ত অন্তর এক বিচিত্র আকর্ষণ বোধ করছে, তাঁদের কয়েকজন তাঁর সামনেই বসে রয়েছেন এবং তাঁরা তাকে জানেনও! তাঁরই কয়েকজন আত্মীয়া চিকের নেপথ্যে উন্মুখ কৌতূহলে তাঁর দিকে চেয়ে—তাঁর প্রত্যেকটি কথা, সুর, হাব-ভাব সাগ্রহে লক্ষ্য করছেন। এসব তাঁর জানা ছিল না।

তাঁদের কথা জানতে পারলে নিশ্চয় পান্নার ভাল লাগত। তিনি কিছু শান্তি ও সান্ত্বনা পেতেন। কিন্তু দু পক্ষে কোন জানাজানি হল না, এত

কাছাকাছি এসেও। সেই অকূল ব্যবধান খণ্ডন করবার সাধ্য কারুরই নেই। না হলে পান্নার মনের কাঁটা হয়তো ফুল হয়ে ফুটতে পারত।

এক আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসতে চায়, আর এক আবেগে সুরের উৎস বাধা মানে না। সারা মন প্রাণ মথিত করে সুর ঝরে পড়ে আর সেই গান এগিয়ে চলে পান্নার কণ্ঠে—

একি কেমন সুন্দর রূপ মনোহর,
আমি পরশে সে প্রাণ পেলাম,
সখি জুড়াইল মোর হিয়ে।
আমার বঁধুর অঙ্গের সুগন্ধ সৌরভ
তাহার বাতাস পেয়ে।

নীড়হারা বিহঙ্গের মন নিয়ে পান্না শেষের কলিটি গাইলেন—

তোমরা সখিগণ করহ সিনান,
(পাপিনী পরশ করহে)
আমার বঁধুর যত অমঙ্গল সকল যাউক দূরে॥

তার পর গান শেষ হল। শ্রোতারা একে একে দলে দলে আসর শূন্য করে চলে গেলেন। কিন্তু পান্না তখনও আচ্ছন্ন হয়ে বসে। স্মৃতির স্বর্ণ-দেউল থেকে তাঁর কাঙ্গাল মন তখন স্মরণের বালুচরে পথ হারিয়েছে। সম্বিৎ ফিরে পেলেন স্থানীয় কয়েক ব্যক্তির কথায়।

সচকিত হয়ে পান্না শুনলেন, তাঁকে মুজ্‌রো নেবার জন্যে অনুরোধ করা হচ্ছে। যদিও পান্না স্বেচ্ছায় এসেছেন দেবস্থানে গান শোনাতে, তবু তাঁরা তাঁকে দক্ষিণা দিতে চান। এত নামী গায়িকাকে—আর গানই যাঁর জীবিকা—টাকা না দেওয়া তাঁরা উচিত মনে করেন নি। বিশেষ, প্যালাও পড়েছে অনেক টাকা। সে সমস্তই তাঁরা পান্নাকে দিতে চাইলেন।

তাঁরা বললেন, 'এ টাকা আপনারই প্রাপ্য। তা ছাড়াও আপনাকে দক্ষিণা দেওয়া আমাদের কর্তব্য। আপনি অনুগ্রহ করে এতদূর থেকে এসেছেন—'

বাধা দিয়ে পান্নাময়ী বলে উঠলেন, 'না, না, না। এখানে আমি টাকা নিতে পারব না। আমি এখানে দেবতাকে গান শোনাতে এসেছি। এখান থেকে আমি কিছুই নেব না। প্যালার টাকা সব মন্দিরে দিয়ে দিন। আমি এখানে টাকার জন্যে আসি নি। আমায় আপনারা ক্ষমা করুন…'

তাঁদের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে থেকে পান্না মুখ ফিরিয়ে নিলেন। উদ্গত অশ্রুধারা রোধ করবার সাধ্য আর তাঁর নেই!

গান্ধীজীর অপূর্ব অভিজ্ঞতা

মহাত্মা গান্ধী যে সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন, একথা সাধারণভাবে প্রায় সকলেরই জানা আছে। তাঁর প্রার্থনা সভার অনুষ্ঠানে ভজন গান যে নিয়মিত অঙ্গ ছিল, তা শুধু গানের বিষয়বস্তুর জন্যে নয়, সাঙ্গীতিক আবেদনও তার কারণ।

তিনি অন্তরে কেমন সঙ্গীতভক্ত ছিলেন, তার একটি দৃষ্টান্ত এখানে বর্ণনা করা হবে। তার ভূমিকা-স্বরূপ গান্ধী-সকাশে দিলীপকুমার রায় মহাশয়ের সঙ্গীত প্রসঙ্গ তাঁর "ভ্রাম্যমানের দিনপঞ্জী" গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করে দেওয়া হল, কারণ মহাত্মাজীর সঙ্গীতপ্রিয়তার এক মনোজ্ঞ ও অন্তরঙ্গ পরিচয় এই বিবরণে পাওয়া যায় :

"আমি সঙ্গীতের ছাত্র শুনে মহাত্মাজী সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করলেন। মীরাবাঈয়ের সুন্দর গানগুলির সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে কি না জিজ্ঞাসা করাতে, মহাত্মাজী বললেন, খুব আছে। আমি মীরার অনেক গানই শুনেছি ও তার অনেক গানেরই আমি ভক্ত।...আমি সঙ্গীত বড় ভালবাসি যদিও সঙ্গীতের সমঝদার নই।

"আমি মীরাবাঈয়ের 'চাকর রাখোজী' বলে একটি ভজন ও বৃন্দাবন সম্বন্ধীয় 'দীন দয়াল গোপাল হরি' বলে একটি পূরবী গাইলাম।

"গান শুনতে শুনতে মহাত্মাজীর প্রশান্ত উজ্জ্বল চোখ দুটি যেন অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল, কারণ সেই স্তিমিত আলোতেও তাঁর চোখ দুটি চক্ চক্ করতে লাগল।

"আমি বললাম,...আমার বরাবরই একটা ধারণা ছিল যে, আপনি সঙ্গীত বা অন্যান্য সুকুমার কলার বিরোধী।

"মহাত্মাজী সবিস্ময়ে বলে উঠলেন : আমি সঙ্গীতের বিরোধী! আমি? বলেই খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তার পর প্রশান্ত ভাবে একটু হেসে বললেন, বুঝেছি, বুঝেছি। আমার সম্বন্ধে নানা লোকের মনে এত রকম ভুল আছে যে, এখন সেসব ধারণার মূলোৎপাটন করা কঠিন হয়ে পড়েছে।...আমি সঙ্গীতের মতন সুকুমার কলার বিরোধী! আমি তো সঙ্গীতকে বাদ দিয়ে ভারতের আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশের কথা ভাবতেই পারি না। আমি যে সঙ্গীতাদি ললিতকলার ভক্ত, একথা আমি খুব জোর করেই বলতে চাই।"

মহাত্মা গান্ধী সঙ্গীত কত গভীরভাবে ভালবাসতেন, তা তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলে অজানা ছিল না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনও জানতেন। তাই সেবার যখন গান্ধীজীর দেশবন্ধুর ভবানীপুরের বাড়িতে আসবার কথা হল, তখন তিনি অতিথিকে একদিন সঙ্গীত শোনাবার ব্যবস্থা করলেন—তবে কণ্ঠসঙ্গীত নয়, যন্ত্রসঙ্গীত।

গান্ধীজীর জন্যে যে সঙ্গীতজ্ঞকে চিত্তরঞ্জন আমন্ত্রণ জানালেন, তাঁর কথা বিশেষ করে জানবার আছে। বহু গায়ক, বাদক, কীর্তনীয়ার সঙ্গে দেশবন্ধু পরিচিত থাকলেও, নিয়ে এলেন রাগ সঙ্গীতের এক অনন্যসাধারণ গুণীকে—বাঙ্গালী, কিন্তু সর্বভারতীয় সঙ্গীতক্ষেত্রে এক দিক্‌পাল। বীণ্‌কার ও ধ্রুপদী প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সাধারণত রুদ্রবীণা বা সুর-শৃঙ্গারবাদক রূপে সঙ্গীতাসরে সুপরিচিত ছিলেন বটে, কিন্তু সারস্বত বীণাতেও তিনি রীতিমত শিক্ষা পান পুণার বীণ্‌কার ও দ্বারবঙ্গরাজের সভাবাদক আন্না ঘোড়পুরের কাছে। স্বনামধন্য উজীর খাঁর কাছে প্রমথনাথ সুরশৃঙ্গার যন্ত্রে তালিম পেয়েছিলেন। শুধু ওই দুই মহাগুণী নন, আরো কয়েকজনের কাছেও শিক্ষার সুযোগ পান তিনি। বলা যায়, তাঁর উত্তরকালের সঙ্গীতজীবন যেমন গৌরবের, তেমনি ছিল তাঁর সঙ্গীতশিক্ষার পর্বও।

প্রথম জীবনে তিনি কণ্ঠসঙ্গীতের সাধনাও রীতিমত করেছিলেন, বিশেষ ধ্রুপদ। প্রায় ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি ছিলেন প্রধানত ধ্রুপদী। পরে যন্ত্র-সঙ্গীতশিল্পী রূপেই আসরে আত্মপ্রকাশ করেন। বিখ্যাত ধ্রুপদী মুরাদ আলী খাঁ এবং আলী বখ্‌শ দুজনের কাছেই তিনি পেয়েছিলেন শিক্ষার সুযোগ। তা ছাড়া, (নবাব ওয়াজেদ আলীর দরবারের গায়ক) আন্‌সাদ্ দৌলার কাছে খেয়াল, সুপ্রসিদ্ধা শ্রীজান বাঈয়ের কাছে খেয়াল ও টপ্পা, গুরু বিনায়কের কাছে ধ্রুপদ, (মেটিয়াবুরুজের শানাইবাদক প্যারে খাঁর শিষ্য) শ্যামলাল গোস্বামীর কাছে এস্রাজ ইত্যাদি বহু বিচিত্র শিক্ষা লাভ তাঁর ঘটে। সেই সঙ্গে ছিল নিজের একনিষ্ঠ সাধনা। তার ফলে সমগ্র ভারতবর্ষে তিনি একজন প্রথমশ্রেণীর কলাবতরূপে স্বীকৃত হন। এই শতকে পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গীত সম্মেলনে বাংলা থেকে যাঁরা আমন্ত্রিত হন, তিনি তাঁদের মধ্যে একজন অগ্রণী। আমেদাবাদ ও লক্ষ্ণৌ সঙ্গীত সম্মেলনে (দুটিই ১৯২৪ খ্রীঃ), তা ছাড়া লাহোর, পুণা, নাগপুর, বাঙ্গালোর, শিমলা, কাশ্মীর, কাশী, গিধৌড়, পাটনা, দ্বারবঙ্গ প্রভৃতি স্থানের আসরে ও দরবারে যোগ দিয়ে তিনি গুণপনা দেখিয়েছিলেন। যে সব বিদেশী সঙ্গীতবিদ্ তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন, তাঁদের মধ্যে বিশ্ববিখ্যাত রুশ পিয়ানোবাদক মিরোভিচ হলেন একজন। জীবনের শেষ ৫ বছর (সুদীর্ঘ ৯৩

বছর ছিল তাঁর আয়ু) তিনি দিল্লীর সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমীর কার্যকরী বোর্ডের সদস্য ছিলেন।

প্রমথনাথের প্রতিভা সব চেয়ে স্ফূর্তি পেত বিলম্বিত আলাপচারীতে। এমন ঢিমা চালের আলাপে মুন্সিয়ানা খুব কম গুণীই দেখাতে পেরেছেন। তাঁর এই আলাপচারীর পদ্ধতি ওস্তাদ উজীর খাঁর অনুবর্তী ছিল না, ছিল অনেকখানি আন্না ঘোড়পুরের রীতির অনুসারী। প্রমথনাথের অন্যতম কৃতী শিষ্য মোহিনী-মোহন মিশ্রের মতে, ধ্রুপদী মুরাদ আলীর ঢিমা আলাপের ঢঙও তাঁর বাজনায় ফুটে উঠত। আসরে প্রমথনাথ অনেক সময় সুরশৃঙ্গার যন্ত্রে রাগালাপ করে গৎ বাজাতেন তাঁর নিজের ফরমায়েশে তৈরী একটি যন্ত্রে। হার্পের অনুকরণে কাঠের ফ্রেমে আঁটা ২২ তারের এই যন্ত্রটির তিনি নাম দেন 'সুর আয়না'।

প্রমথনাথের সঙ্গীতজীবনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। তিনি প্রমথনাথকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা তদ্‌গত মনে শুনতেন তাঁর যন্ত্রসঙ্গীত।

তাঁরই অনুরোধে প্রমথনাথ সঙ্গীতকে জীবনের বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন। তাঁর আগ্রহে দুই কন্যার (শ্রীমতী অপর্ণা ও শ্রীমতী কল্যাণী) সঙ্গীতশিক্ষক হন প্রমথনাথ মাসিক ১৫০ টাকা দক্ষিণায়। সে বোধ হয় ১৯১৩ খ্রীঃ কিংবা তার কাছাকাছি সময়ের কথা।

চিত্তরঞ্জন তখনও দেশবন্ধু হন নি। কিন্তু মানিকতলা বোমা মামলা পরিচালনা করে ও শ্রীঅরবিন্দের মুক্তিলাভ ঘটিয়ে তার অনেক আগেই লব্ধকীর্তি এবং বিপুল-পসারী ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জনের মহাপ্রাণতা ও গুণগ্রাহিতার খ্যাতি সে সময় অনেকের কাছেই সুবিদিত। উপরন্তু তিনি তখন কবি এবং কাব্য সাহিত্য সঙ্গীত ইত্যাদি জাতীয় মানস-সম্পদের একান্ত অনুরাগী এবং সে-সবের সেবকদের সহৃদয় পৃষ্ঠপোষক।

অবশেষে তিনি যখন হলেন দেশবন্ধু, দেশের হিতার্থে যথাসর্বস্ব ত্যাগী— তখনো কিন্তু ত্যাগ করতে পারলেন না সঙ্গীত ইত্যাদির প্রতি প্রীতি। প্রমথনাথকে তিনি আগে কর্পোরেশনের চাকুরি থেকে অসময়ে অবসর গ্রহণ করান সঙ্গীতচর্চায় পরিপূর্ণ ভাবে আত্মনিয়োগ করার জন্যে এবং তাই তাঁর মাসিক নির্দিষ্ট আয়ের ব্যবস্থা করিয়েছিলেন নিজের বাড়িতে। এখন কংগ্রেসের কাজে আইন ব্যবসা ত্যাগ করেও কিন্তু প্রমথনাথের প্রতি দায়িত্ব বিস্মৃত না হয়ে তাঁকে পাটনায় থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। তাঁর নির্দেশে ভ্রাতা পি. আর.

দাশ মহোদয়ের গৃহে এবং ডুমরাওনের রাণীর ভবনেও সঙ্গীতশিক্ষক নিযুক্ত হলেন প্রমথনাথ।

শুধু তাই নয়, আমেদাবাদ সঙ্গীত সম্মেলনে প্রমথনাথের যোগ দেবার বন্দোবস্ত করলেন তাঁর সংগঠক বিষ্ণুদিগম্বর পালুসকরকে চিঠি দিয়ে। সেই সম্মেলনেই (ফেব্রুয়ারী, ১৯২৪ খ্রীঃ) বিখ্যাত ধ্রুপদী আল্লাবন্দে খাঁর (যাঁর পুত্র সুকণ্ঠ নাসিরুদ্দিন) সঙ্গে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কিছু অম্লমধুর পরিচয় ঘটেছিল। আল্লাবন্দে খাঁর মধ্যে ওস্তাদ-সুলভ রীতিমত দাপট প্রকাশ পেত— গানে এবং ব্যবহারেও। তিনি পশ্চিম ভারতের সঙ্গীত সম্মেলনে সম্ভবত এই প্রথম বাঙ্গালী দেখে—প্রমথনাথের গুণপনার বিষয়ে তাঁর কোনই ধারণা ছিল না—একটি স্থূল শ্লেষপ্রয়োগ করে তাঁর প্রতি কটাক্ষ করলেন (অবশ্যই উর্দুতে), 'ওঃ বাংলাদেশ থেকে এসেছেন দেখছি! থিয়েটারের গান বাজাবেন তো ?'

সেটা সম্মেলন আরম্ভ হবার আগেকার কথা। প্রমথনাথ সংযত হয়ে রইলেন, খাঁ সাহেবের এই অকারণ আক্রমণেও বিবাদের মধ্যে গেলেন না। মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করলেন, বাংলার গুণের পরিচয় দেবেন যথাস্থানে, যথাসময়ে। তার পর যখন সম্মেলনের আসরে তাঁর পালা এল, তিনি সুর-শৃঙ্গারে বাজালেন ভীমপলশ্রী। তাঁর বিশিষ্ট রীতিতে এবং পূর্ণ আত্মবিশ্বাসে, বিশেষ করে আলাবন্দে খাঁর বিদ্রূপ মনে রেখে তিনি ভীমপলশ্রীর রাগরূপ অতিশয় নৈপুণ্যে রূপায়িত করলেন। বাজনা শেষ হতে সমবেত গুণীদের সাধুবাদ পেলেন তিনি। এবং ওস্তাদ আল্লাবন্দে খাঁ প্রথমে হতবাক্ থেকে পরে যোগ দিলেন সেই প্রশংসার উচ্ছ্বাসে। বাংলায় এমন গুণী থাকতে পারেন, এ নাকি তাঁর ধারণার অতীত ছিল, ইত্যাদি।

সেই প্রমথনাথকে দেশবন্ধু আনলেন গান্ধীজীকে যথার্থ সঙ্গীত আস্বাদন করাবার জন্যে। দেশবন্ধুর তখন শেষ জীবন। কিন্তু তখনও, মৃত্যুর এক-দেড় বছর আগেও, তিনি মাঝে মাঝে প্রমথনাথকে বাড়িতে আমন্ত্রণ করে এনে তাঁর যন্ত্রসঙ্গীতে পরিতৃপ্ত হতেন।

এই অনুষ্ঠানটিও সেই সময়ে কোন এক দিনের ঘটনা। সন তারিখ সঠিক জানা নেই।

মহাত্মাজী তখন দেশবন্ধুর গৃহে অতিথি, সঙ্গে আছেন একান্ত সচিব মহাদেব দেশাই।

সেদিন সকালবেলা দেশবন্ধু তাঁকে সঙ্গীত শোনাবার ব্যবস্থা করেছেন। সেই রসা রোডের বাসভবনের দোতলায়—যা লুপ্ত হয়ে এখন গড়ে ওঠেছে

তাঁরই নামাঙ্কিত সেবাসদন—সেদিনের আসর বসেছে। অবশ্য সাধারণ আসর নয়, বাইরের বিশেষ কাউকে দেশবন্ধু আমন্ত্রণ জানান নি সেখানে।

তাঁর সেই ভবনের দোতলায় পশ্চিমের অর্থাৎ ট্রাম রাস্তার দিকে বারান্দায় বাদক ও শ্রোতারা উপস্থিত। গান্ধীজী এক ধারে বসে আস্তে আস্তে চরকায় সুতো কাটছেন, পাশে আছেন মহাদেব দেশাই। সামনে বসেছেন চিত্তরঞ্জন, তাঁর পাশে বসে প্রমথনাথ সুরশৃঙ্গারের তার ক'টি সুরে বেঁধে নিচ্ছেন।

দিনটি সোমবার। গান্ধীজীর মৌনদিবস। তিনি মুখ ঈষৎ নীচু করে দক্ষিণ হাতে চরকার হাতল ঘোরাচ্ছেন, বাঁ-হাতের টানে তুলো থেকে সুতোর আবির্ভাব ঘটছে। তাঁর পকেট-ঘড়িটি সামনে রয়েছে সময় অনুধাবনের জন্যে।

যন্ত্র বেঁধে প্রমথনাথ সেটি হাতে নিয়ে সুরের গুঞ্জন ধ্বনিত করলেন। আরম্ভ হল তাঁর সকালবেলার প্রিয় রাগ দরবারী তোড়ির আলাপ।

গান্ধীজী বাহ্যত নিবিষ্ট মনে চরকায় সুতো কাটতে লাগলেন এবং তন্ময় প্রমথনাথ সুর সৃষ্টি করে চললেন নিপুণ অঙ্গুলি-চালনায়। আসরে তিনি যত বিলম্বিত লয়ে বাজান এখানে তা বাজালেন না। ২০ মিনিটের মধ্যে দরবারী তোড়ির রাগালাপ শেষ করলেন বিশিষ্ট শ্রোতার ধৈর্যের কথা বিবেচনা করে। তারপর ধরলেন একটি অপ্রচলিত রাগ—মঙ্গল। মঙ্গলের সুরের আলাপও সংক্ষেপে শেষ করে তিনি সুরশৃঙ্গার নামিয়ে রাখলেন এবং ঝঙ্কার তুললেন তাঁর নিজস্ব যন্ত্র সুর আয়নায়। এবার ভৈরবী সুরের নক্শা ফোটাতে লাগলেন। সেই শান্ত সকালবেলায়, গান্ধীজীর উপস্থিতির প্রশান্ত পরিবেশে প্রমথনাথ সৃষ্টি করলেন ভৈরবীর উদাস-করা আবহ।

তারপর একসময় তাঁর বাজনা শেষ হল। দেশবন্ধু মাঝে মাঝে গান্ধীজীর মুখের দিকে লক্ষ্য করছিলেন বাজনা তাঁর কেমন লাগছে বোঝবার জন্যে। প্রমথনাথ থামতে গান্ধীজীও চরকা বন্ধ করলেন এবং একটুকরো কাগজে কি লিখে মহাদেব দেশাইকে দিলেন। মহাদেববাবু কাগজটির ওপর চোখ বুলিয়ে সেটি হস্তান্তরিত করলেন দেশবন্ধুকে।

দেশবন্ধু হাতে নিয়ে পড়লেন মহাত্মাজীর লেখা মন্তব্য: "আধ ঘণ্টার মধ্যে আজ আমার সাতবার সুতো ছিঁড়ে গেছে। এমন আর আগে কোনদিন হয় নি।"

দেশবন্ধু স্মিতমুখে কাগজখানি প্রমথনাথকে দেখালেন। তাঁর সুরসৃষ্টিই গান্ধীজীর এতবার ছিন্ন-সূত্রের অঘটনের জন্যে দায়ী।

শ্রোতাকে পরিতৃপ্ত করবার শিল্পীজনোচিত তৃপ্তি লাভ করলেন বাদ্যকর।

পুরস্কার

আজ থেকে প্রায় ৮০ বছর আগেকার কথা। কলকাতার দক্ষিণ উপকণ্ঠ মেটিয়াবুরুজ তখন এমন শ্রীভ্রষ্ট ছিল না। কারণ লক্ষ্ণৌর শেষ ও নির্বাসিত নবাব ওয়াজেদ আলী শা তখনো মেটিয়াবুরুজে বিদ্যমান। তাঁর পরিকল্পনায় গড়া কয়েকটি নতুন প্রাসাদ আর বাগ-বাগিচায় তখন মেটিয়াবুরুজ ছিল লক্ষ্ণৌর এক ক্ষুদ্র সংস্করণ। আর সে মেটিয়াবুরুজের কোহিনুর ছিল সেখানকার দরবার, সঙ্গীতের দরবার।

মেটিয়াবুরুজ দরবারের মতন অর্থাৎ নবাব ওয়াজিদ আলীর সঙ্গীত-সভার মতন এমন দরবার সারা ভারতবর্ষে তখন অন্তত আর ছিল কি না সন্দেহ। একত্র এত প্রথম শ্রেণীর সঙ্গীত-শিল্পীর সমাবেশ, একসঙ্গে এমন ধ্রুপদ খেয়াল ঠুংরী রীতির গায়ক ও গায়িকা এবং সেতার সরদ সুরবাহার শানাই পাখোয়াজ তবলার এত গুণীর একত্র সমাবেশ সেকালে আর কোথাও ছিল বলে জানা যায় না। প্রায় ১৫০ জন গায়ক গায়িকা যন্ত্রী ইত্যাদি নবাব দরবারের সঙ্গে এক এক সময় যুক্ত থাকতেন। আর তাঁদের প্রায় সকলেরই বাস ছিল মেটিয়াবুরুজে। তাই সেখানকার সঙ্গীতচর্চার মান ছিল অতি উচ্চ গ্রামে বাঁধা এবং দরবার ও তার বাইরেকার সঙ্গীত সমাজ নিয়ে মেটিয়াবুরুজ ছিল সেকালের এক সুবিখ্যাত সঙ্গীত-কেন্দ্র।

সঙ্গীতক্ষেত্রে বাংলার যে-সব স্মরণীয় সন্তান মেটিয়াবুরুজে সঙ্গীতশিক্ষা করেন, গুণী খেয়াল-গায়ক বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট একজন। প্রথম যৌবনে সঙ্গীতশিক্ষার প্রবল আগ্রহে সহায়হীন সম্বলহীন তিনি সাহসে ভর করে সেই সুরতীর্থে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং বহু বাধা-বিপত্তির মধ্যে দিয়ে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে সেখান থেকে সঙ্গীত-বিদ্যা অর্জন করেন। সেই বামাচরণবাবুরই একটি আসরের ঘটনা পরে বলা হবে এখানে।

তাঁর পিতা ভারত সরকারের সমর বিভাগে চাকুরি সূত্রে পশ্চিমাঞ্চলে থাকার জন্যে বামাচরণের বাল্যজীবনও পশ্চিমে কাটে। তাঁর জন্মও হয় পশ্চিম পাঞ্জাবের রাওয়ালপিণ্ডিতে। ফলে তাঁর বেশভূষা চালচলন উচ্চারণ আর কথাবর্তার ধরন হয়ে যায় পশ্চিমাদের মতন। তাই ১৬।১৭ বছর বয়সে যখন

তিনি নিজেদের বেহালার বাড়িতে এসে বাস করতে লাগলেন, তখনও তাঁর সেই পশ্চিমী ধরন-ধারণ রয়ে গেল।

পরনে ঢিলে পাজামা পাঞ্জাবি, দীর্ঘ কেশ আর বলিষ্ঠ শরীরে তাঁকে হঠাৎ চেনা যেত না বাঙ্গালী বলে। সেজন্যে কলকাতায় এসে রীতিমত সঙ্গীতশিক্ষার আকুল ইচ্ছায়—যে ইচ্ছা তাঁর কম বয়স থেকেই ছিল—যখন তিনি প্রথম গেলেন লক্ষ্মীনারায়ণ বাবাজীর কাছে, তাঁর কেমন বিরক্তি আসে বামাচরণের ওই পশ্চিমী পোশাক-আশাক আর হিন্দুস্থানী-সুলভ উচ্চারণ শুনে। লক্ষ্মীনারায়ণ বাবাজী হলেন সে যুগের বাংলার এক বহুমুখী সঙ্গীতজ্ঞ এবং তাঁর সঙ্গীতকৃতির পরিচয় অন্যত্র দেওয়া হয়েছে। তাঁর নাম থেকেই যেমন বোঝা যায়—তিনি ছিলেন প্রায় সন্ন্যাসীর মতন, ধর্ম এবং আচারনিষ্ঠ ও সাত্বিক প্রকৃতির মানুষ। সঙ্গীত-শিক্ষার্থী বামাচরণ তাঁর সঙ্গীত-খ্যাতি শুনে যখন শিষ্য হবার জন্যে তাঁর কাছে গেলেন, লক্ষ্মীনারায়ণ তাঁর বেশভূষা আর চাল-চলন দেখে বিরূপ হলেন। বামাচরণকে বিদ্রূপ করে বলে উঠলেন, "তা তুমি আমার কাছে এসেছ কেন? তোমার জায়গা মেটেবুরুজে।"

মর্মাহত বামাচরণ তাঁর সেই ঠাট্টাকেই সত্যি করে নিয়ে একদিন খোঁজখবর নিতে হাজির হলেন মেটেবুরুজে। অপরিচিত জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে সেখানকার ওস্তাদদের সন্ধান করতে লাগলেন। কে কে আছেন সেখানে, কে কেমন দরের ওস্তাদ ইত্যাদি। খোঁজ নিতে নিতে শুনলেন, সেখানকার ওস্তাদদের মধ্যে তখন আলী বখ্‌সের খুব নাম-ডাক, ধ্রুপদ গায়ক মুরাদ আলী খাঁ নবাবের দরবার ছেড়ে যাবার পর থেকে। গোয়ালিয়রের ধ্রুপদ ও খেয়াল গায়ক, মেটেবুরুজ দরবারে নিযুক্ত আলী বখ্‌সের ডেরার খোঁজখবর নিয়ে বুক ঠুকে তাঁর সঙ্গে বামাচরণ দেখা করতে গেলেন। আলী বখ্‌সের কাছ থেকে তাঁকে ফিরে আসতেই হত ব্যর্থ মন নিয়ে, কিন্তু ঘটনাচক্রে বামাচরণের ভাগ্য প্রসন্ন হল ওস্তাদের এক বিশেষ আলাপী বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহায়তায়। সেসব কথা সবিস্তারে বলবার এখানে দরকার নেই। তবে ভদ্রলোকের কথায় আলী বখ্‌স বামাচরণকে শিক্ষা দিতে রাজী হলেন শেষ পর্যন্ত।

কিন্তু সে যে শুধু মৌখিক সম্মতি তা বামাচরণ দিনকয়েকের মধ্যেই বুঝতে পারলেন। দেখলেন, শেখাবার চেয়ে না শেখাবার ইচ্ছাটাই ওস্তাদজীর বেশি। স্পষ্ট 'না' বলা ছাড়া আর সব রকম কায়দাই দেখা যেত তাঁর। শেখাবার দিনে নানা ওজর-অজুহাত আর বায়নার অভাব হত না। বামাচরণ কিন্তু অটল ধৈর্যে বেহালা থেকে মেটিয়াবুরুজে যাতায়াত করতে লাগলেন (হেঁটেই

তখন যেতেন সেখানে)। নাছোড়বান্দা হয়ে ওস্তাদকে আঁকড়ে ধরে রইলেন কোন কষ্টকেই মেনে নিলেন না কষ্ট বলে।

একবার বেহাগ শেখাবার প্রার্থনা জানালেন আলী বখ্‌সের কাছে। তিনি কাটাবার জন্যে হুকুম জারি করলেন, "বেহাগ নিতে গেলে রাত বারোটায় এখানে আসতে হবে। তার আগে এলে পাবে না।" শিষ্য তাইতেই রাজী। বেহালা থেকে শীতের রাতে হাঁটতে হাঁটতে মেটিয়াবুরুজে পৌছলেন বারোটা নাগাদ, তারপর তালিম নিয়ে বাড়ি ফিরলেন শেষ রাতে। এমনি সব অসুবিধার মধ্যে দিয়ে শিখতে হয়েছে তাঁকে। আর সেই সঙ্গে ওস্তাদের ঘন ঘন তামাক সাজা ইত্যাদি ব্যাপার তো ছিলই। দক্ষিণার কথা এখানে উল্লেখ না করে উহ্য রাখা হল। অনেক দিন এইরকম চলবার পর তবে প্রসন্ন হয়েছিল ওস্তাদের মন।

উত্তরকালে বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় তাই বলতেন, "বড় কষ্ট করে আমরা সে যুগে গান শিখেছিলুম।"

সঙ্গীতের জন্যে এই দুরূহ সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ অবশ্যই করেছিলেন, খেয়াল গানের এক অসামান্য গুণী হয়ে। তবে সে পরবর্তীকালের কথা।

মেটিয়াবুরুজে তিনি আলী বখ্‌স ভিন্ন আর এক বড় ওস্তাদের তালিমও পান। তাঁর নাম হল (লক্ষ্ণৌর) আহম্মদ খাঁ। আহম্মদ খাঁও ছিলেন খেয়ালের কলাবত।

যে ঘটনাটির উল্লেখ এখানে করা হবে, তার সঙ্গে অবশ্য আহম্মদ খাঁর কোন সম্পর্ক নেই। আলী বখ্‌সের কাছে বামাচরণ যখন বছর তিনেক তালিম পেয়েছেন, এটি সে সময়ের ঘটনা।

বামাচরণ তখন নবীন যুবক। ওস্তাদের উপেক্ষা সত্ত্বেও অদম্য অধ্যবসায়ে কণ্ঠসাধনা করছেন, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আদায় করে নিচ্ছেন যতটুকু সার সংগ্রহ করা যায়, ওস্তাদের কণ্ঠে গান শোনবার সুযোগের সদ্ব্যবহার করে নিচ্ছেন নিজের মনোবীণার তারগুলি তেমনি সুরে বেঁধে নিয়ে। সেবায় আর নিষ্ঠায় আলী বখ্‌সের মন ঈষৎ আকর্ষণ করতে পেরেছেন। ওস্তাদের সঙ্গে আসরে যেতে আরম্ভ করেছেন তাঁর অনুচর হয়ে।

এমন সময়কার বিবরণ এটি। ঘটনাস্থল—নবাব ওয়াজিদ আলীর দরবার। সেদিন দরবারে নবাব একটি বিশেষ জলসার আয়োজন করেছেন তাঁর এক নতুন বেগমের গান (অবশ্যই পর্দানশীনা হয়ে) শোনাবার উপলক্ষ্যে।

নবাবের সেই ডিম্বাকৃতি এবং নিয়ত সুরগুঞ্জনে মুখরিত দরবারে আসর

বসেছে। বৃদ্ধ ওয়াজিদ আলীর সামনে রয়েছেন দরবারের ওস্তাদবর্গ—ধামারী তাজ খাঁ, খেয়াল-গায়ক আহম্মদ খাঁ, ধ্রুপদী-খেয়ালী আলী বখ্‌স এবং আরো অনেকে। তরুণ বামাচরণও সেখানে ওস্তাদের সঙ্গে উপস্থিত হয়ে বসেছেন তাঁর পেছনে।

যথাসময়ে নবাবের হুকুমে জলসা আরম্ভ হল। দরবারের একদিকে চিকের অন্তরালে বসে গান আরম্ভ করলেন বেগম সাহেবা। তিনি গাইলেন একটি ভারী রাগ—হিন্দোল। একটি গান হিন্দোলে গেয়েই বেগম সাহেবা তাঁর অনুষ্ঠান শেষ করলেন।

তাঁর গান কিন্তু আদৌ ভাল হল না। সম্ভবত বেশিদিন বা ভালভাবে তিনি তালিম পান নি। তার ওপর নবীনা নারীর কণ্ঠে যথাযথ হল না গাম্ভীর্যপূর্ণ হিন্দোলের রূপ প্রকাশ ও বিস্তার। অন্তত সে গানে ওস্তাদরা কেউই সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। বামাচরণের মনোভাবও তাই। সে গান শেষ হতে দরবার নিস্তব্ধ হয়ে রইল অনেকক্ষণ। সুরের আসর জমাট না হয়ে, হিন্দোলের সুরে ভরপুর না হয়ে, বরং যেন তরল হয়ে রইল।

এমন সময় নবাব হঠাৎ ওস্তাদ আলী বখ্‌স্‌কে গানের ফরমায়েশ করলেন। একেই তো আসরটি অর্বাচীনা বেগমের, তার ওপর প্রতিকূল আবহাওয়ায় আলী বখ্‌সের মেজাজ তখন একেবারে নষ্ট। সুতরাং এ আসরে গাইতে তাঁর একান্তই অনিচ্ছা হল। অথচ স্বয়ং নবাবের ফরমায়েশ হয়েছে। দ্বিধাগ্রস্ত ওস্তাদ ইতস্ততঃ করতে লাগলেন, হঠাৎ স্থির করতে পারলেন না রুচি ও রুজির মধ্যে তিনি বেছে নেবেন কোন্‌টি!

নবাবের ফরমায়েশ হওয়া থেকেই শিষ্য ওস্তাদের দিকে লক্ষ্য করছিলেন। ওস্তাদকে তিনি তিন বছর ধরে দেখছেন। তাঁর মনের অনেক খবর, বিশেষ গানের বা মেজাজ বিষয়ে, তাঁর অজানা নয়। তিনি ওস্তাদের মানসিক দ্বন্দ্বটি অনুভব করে স্থির করলেন একটি উপায়।

আলী বখ্‌স্‌কে তিনি বললেন, "ওস্তাদজী, নবাব বাহাদুরকে বলে আমায় আসরে গাইবার অনুমতি করিয়ে দিন, আমি গাইব।"

বামাচরণ এমনভাবে কথা ক'টি বলেছিলেন যাতে তা নবাবের কানে যায়। নবাব আলী বখ্‌স্‌কে প্রশ্ন করে জেনে নিলেন বামাচরণের অভিপ্রায় কি, কারণ সব কথা স্পষ্টভাবে শুনতে পান নি।

আলী বখ্‌স্‌ তখন অকূলে কূল দেখতে পেয়েছেন, বামাচরণের প্রস্তাবে। তিনি নবাবের কাছে সাগরেদের হয়ে আর্জি পেশ করলেন, যদি হুজুর মেহেরবানি

করে এই ছেলেটিকে গাইতে অনুমতি দেন তা হলে বেচারি ধন্য বোধ করবে।

খেয়ালী নবাব নিজের আগেকার ফরমায়েশের কথা ভুলে গিয়ে হৃষ্টচিত্তে এই গৌরবর্ণ দীর্ঘকায় নবীন গায়ককে গাইবার সম্মতি জানালেন।

বামাচরণ অবশ্যই দরবারে গাইবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আসেন নি। এখানে গাইবার কথা তাঁর মনেও কখনো ছিল না তার আগে। শুধু ওস্তাদকে সেই অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে নিস্তার দেবার জন্যেই এত বড় দরবারে গাইতে হঠাৎ স্থির করে ফেলেন। কিন্তু তিনি ভয় পেলেন না। সাহসের সঙ্গে এগিয়ে এসে বসলেন গানের জায়গায়। তার পর তানপুরা নতুন করে বেঁধে নিয়ে, তবলচির সঙ্গে সুর ঠিকঠাক করে তিনি গান আরম্ভ করে দিলেন—তৈরী গলায় এবং গলা ছেড়ে। তিনি ধরলেন আলী বখ্‌সেরই কাছে পাওয়া একটি ভূপালী ঃ

সুঘর বনায়ে গায়ে বাজায়ে
রিঝয়ে সবন কো
মত গত সোঁ।

বেশ খানিকক্ষণ ধরে যথারীতি কর্তব্যের সঙ্গে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তিনি গানখানি গাইলেন।

গান শেষ হতে নবাব থেকে আরম্ভ করে সব শ্রোতাই বামাচরণের গানের তারিফ করলেন। বিশেষ আলী বখ্‌স। কারণ সাগরেদ তাঁর মান রক্ষা করেছে, মুখ রক্ষা করেছে। তার জন্যেই তিনি এক বিসদৃশ পরিস্থিতি থেকে পেয়েছেন পরিত্রাণ—তাঁকে গান ফরমায়েশ করবার কথা আর নবাবের মনে নেই!

বিখ্যাত গায়ক তাজ খাঁ বামাচরণের গানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে তাঁর পরিচয় জানতে চাইলেন—"এ কে?"

এই তরুণ খেয়ালী বাঙ্গালী শুনে তাজ খাঁ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তিনি সাবাস দিলেন বামাচরণের পিঠ চাপড়ে।

আর এক অদ্ভুত পুরস্কার বামাচরণ লাভ করলেন অপরিচিত একজন শ্রোতার কাছ থেকে। তিনি বামাচরণের অজস্র সুখ্যাতি করবার পর নিজের কুর্তার পকেট উজাড় করে তাঁর গানের মুজরো স্বরূপ সানন্দে এবং সাদরে দান করলেন—"নাও বেটা নাও, আমি তোমায় বড় খুশী হয়ে দিচ্ছি।"

বামাচরণ হাত পেতে নিয়ে দেখেন—কয়েকটা তামার পয়সা। তিনি বিস্মিত, লজ্জিত হয়ে একটু পরে তাঁর ওস্তাদকে পুরস্কারের বহরটা দেখালেন। মন তাঁর বাস্তবিক বড় ছোট হয়ে গিয়েছিল এই ব্যাপারে।

কিন্তু আলী বখ্‌স্‌ তাঁকে চুপি চুপি বুঝিয়ে বললেন, "যে তোমায় এই পয়সা ক'টা দিয়েছে, এক কালে সে একজন আমীর ছিল। কিন্তু আজ ও ফকীর। এই ক'টি পয়সাই ওর আজকের সম্বল জানবে। তোমাকে মুজরো দেওয়ার ফলে ওকে হয়তো আজ অনাহারে থাকতে হবে, তবুও তোমার গানের জন্যে ওর শেষ সম্বল দিয়ে দিলে। এই পয়সার দাম লাখ টাকা জেনো!"

বামাচরণ ওস্তাদের কথার তাৎপর্য বুঝে সত্যই নিজেকে পুরস্কৃত বোধ করলেন!

রাগাধ্যায়ে রাধিকাসাপ্রদ

বিগত যুগের বাংলার এক সঙ্গীত-প্রতিভা ছিলেন রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী। শুধু বাংলায় কেন, বাংলার বাইরে পশ্চিমাঞ্চলেও তাঁর সঙ্গীত-কৃতি স্বীকৃতি পেয়েছিল। তাঁর জীবনের শেষ বছরে (১৯২৪ খ্রীঃ), লক্ষ্ণৌ সঙ্গীত সম্মেলনে পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে, ঠাকুর নবাব আলী প্রমুখ শ্রেষ্ঠ বোদ্ধাদের কণ্ঠসঙ্গীতে মুগ্ধ করেছিলেন রাধিকাপ্রসাদ।

ধ্রুপদ ও খেয়াল দু অঙ্গেই তিনি গুণপনার পরিচয় দিতেন। তবে বিশেষ করে তিনি ছিলেন ধ্রুপদী। রাগবিদ্যায় যেমন প্রগাঢ় জ্ঞান, তেমনি প্রচুর ছিল তাঁর গানের সংগ্রহ। বড় বড় আসরে এত বিভিন্ন প্রকার, অপ্রচলিত এবং দুরূহ রাগের গান তিনি সাবলীল ভাবে গাইতেন, যা বিস্ময়কর ছিল। এত বেশি রাগে প্রথম শ্রেণীর গান করবার মতন প্রস্তুতি খুব বেশি ওস্তাদের মধ্যে দেখা যেত না। রাগ বিস্তারে ও রাগরূপের চিত্র রচনায়, তাল ও লয়কারীতে নিপুণ নিখুঁত ছিলেন তিনি।

আকারে ক্ষীণকায় এবং স্বভাবে নিরীহ রাধিকাপ্রসাদ সঙ্গীত-জগতে এক বিরাট পুরুষ ছিলেন। এবং এক লব্ধকীর্তি আচার্য। তিনি যাঁদের সঙ্গীত শিক্ষা দিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁরা দেশের এক-এক শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতশিল্পীরূপে পরিগণিত হন। যেমন—গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, মহীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, (ভ্রাতুষ্পুত্র) জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী। তা ছাড়া, ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ললিতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (মহীন্দ্র-পুত্র), ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রভৃতি যাঁরা প্রথমে মহীন্দ্রনাথের ছাত্র ছিলেন, মহীন্দ্রনাথের অকাল মৃত্যুতে তাঁরা রাধিকাপ্রসাদের শিষ্য হয়েছিলেন। দিলীপকুমার রায়ও প্রথম

জীবনে সঙ্গীতশিক্ষা করেছিলেন তাঁর কাছে। সঙ্গীততত্ত্বে সুপণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে তাঁর শিষ্য হতে চেয়েছিলেন ধ্রুপদ গান সংগ্রহের আশায়। কিন্তু গোস্বামী মহাশয়ের আকস্মিক মৃত্যুর জন্যে তা ঘটে ওঠে নি। এই সমস্ত বিষয় থেকে ধারণা করা যাবে, ভারতীয় সঙ্গীতক্ষেত্রে তাঁর কি সম্মানের আসন ছিল।

সঙ্গীত-জীবনের নানা সময়ে ভারত সঙ্গীত সমাজে, আদি ব্রাহ্ম সমাজে, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে এবং দীর্ঘকাল (মহারাজা মণীন্দ্র নন্দী স্থাপিত) বহরমপুর সঙ্গীত বিদ্যালয়ে নিযুক্ত ছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গীত বিষয়ে সহযোগিতাও তাঁর জীবনের এক উল্লেখ্য অধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ও আস্থাবান্ ছিলেন এবং যে-সমস্ত হিন্দী রাগসঙ্গীত ভেঙে বাংলা গান রচনা করেন, তার মধ্যে কতকগুলি পেয়েছিলেন রাধিকা-প্রসাদের কাছে। আরো একটি স্মরণীয় কথা এই, যে ছয়খানি গান রাধিকা-প্রসাদ রেকর্ড করেছিলেন, তার মধ্যে তিনটি রবীন্দ্রনাথের—'স্বপন যদি ভাঙ্গিলে', 'বিমল আনন্দে জাগো রে' এবং 'মোরে বারে বারে ফিরালে'। এই তিনটি গানই হিন্দী গানের অনুসরণে ও আদর্শে রচিত। শান্তিনিকেতনে ভীমরাও শাস্ত্রী যোগদানের আগে রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে রাধিকাপ্রসাদ কিছুদিন সেখানে ছিলেনও।

যদু ভট্টের পরে সঙ্গীতজগতে বিষ্ণুপুরের শ্রেষ্ঠ দান—রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী। কিন্তু রাধিকাপ্রসাদের রীতিমত সঙ্গীত শিক্ষা হয় কলকাতায়। ১৫ বছর বয়সে তিনি ওস্তাদদের কাছে গান শেখবার আশায় বিষ্ণুপুর থেকে কলকাতায় চলে আসেন। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বিখ্যাত সভাগায়ক গোপালচন্দ্র চক্রবর্তীর (প্রাকৃত জনের কথায় 'নুলো গোপাল') কাছে প্রথমে তিনি সঙ্গীতশিক্ষার ইচ্ছায় যান। কিন্তু সে সুযোগ তিনি বেশিদিন পান নি। তার পর সে যুগের প্রসিদ্ধ গায়ক-ভ্রাতৃদ্বয় শিবনারায়ণ মিশ্র ও গুরুপ্রসাদ মিশ্রের অধীনে গান শেখবার ব্যবস্থা হয় রাধিকাপ্রসাদের। নিমতলা স্ট্রীটের ননীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আনুকূল্যে এবং রাধিকাপ্রসাদের পিতৃবন্ধু (শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের অন্যতম সঙ্গীত-গুরু) ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর মধ্যস্থতায় এটি ঘটে। ধ্রুপদী শিবনারায়ণ এবং ধ্রুপদ খেয়াল গায়ক গুরুপ্রসাদ মিশ্র ছিলেন বেতিয়া ঘরানাদার এবং রাধিকাপ্রসাদ তাঁদের কাছে একাদিক্রমে দশ বছরেরও বেশি তালিম পান। তাঁর বিপুল সঙ্গীত-ভাণ্ডারের মূল উৎস এইখানে।

রাধিকাপ্রসাদ যদু ভট্টের কাছেও কিছু কিছু শিখেছিলেন, একথা রবীন্দ্রনাথ

বলতেন এবং রাধিকাপ্রসাদের শিষ্যরাও জানতেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের মাঝে মাঝে যদু ভট্টের কথা বলতেন, যদু ভট্টের গানের কায়দা কি রকম ছিল তারও পরিচয় দিতেন। বলতেন, 'ভট্জী (যদুকে তিনি ওই নামে অভিহিত করতেন) এই রকম করে আলাপ করতেন, ভট্জী এই রকম করে গমক দিতেন।' আর গলায় সেই সব কাজ করে দেখাতেন।

রাধিকাপ্রসাদ সঙ্গীত-জগতে সুপরিচিত ছিলেন 'গোসাঁইজী' নামে এবং রবীন্দ্রনাথও তাঁকে ওই বলেই উল্লেখ করতেন। এবারে গোঁসাইজীর ক'টি আসরের কথা বলা যাক।

তাঁর নিজের যেমন ওস্তাদসুলভ হাঁকডাক ছিল না, তিনি তেমনি দাপটওলা কলাবতদেরও যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতেন। অন্য কোন কারণে নয়, অশান্তির ভয়ে। শান্তিপ্রিয় মানুষদের যেমন স্বভাব হয়ে থাকে। তাঁর শিষ্য ও ঘনিষ্ঠ অনুরাগীরা গোসাঁইজীর মনের এই দুর্বলতার কথা জানতেন।

তাই সেবার হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল মহাশয়ের বাড়িতে জলসার আয়োজনের কথা শুনে তাঁরা একটু ভাবিত হলেন। সেই জলসায় ওস্তাদ কৌকভ খাঁর বাজনা হবার কথা। আর গোসাঁইজীর কোন কোন শিষ্য-সেবক অনুরাগীদের বড় ইচ্ছে যে, তাঁর গানও সে আসরে যেন হয়। বাংলাদেশে কি দরের গুণী আছেন, তার পরিচয় যেন পান খাঁ সাহেব।

ওস্তাদ আসাদুল্লা খাঁ কৌকভ ছিলেন সেকালের সুপ্রসিদ্ধ সরোদী (ব্যাঞ্জো, সেতারবাদকও)। তিনি এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ করামতুল্লা খাঁ হলেন, নবাব ওয়াজিদ আলী শার মেটিয়াবুরুজ দরবারের গুণী বাদক নিয়ামতুল্লা খাঁর দুই সুযোগ্য পুত্র। তাঁরা তাঁদের পিতার খ্যাতিকেও অতিক্রম করেছিলেন। তাঁরা বাংলাদেশে অনেককাল বাস করেন এবং একটি কৃতী বাঙ্গালী শিষ্যমণ্ডলীও গঠন করেন, যাঁরা পরে সুপরিচিত হয়েছিলেন সঙ্গীত-জগতে নানা যন্ত্রের যন্ত্রীরূপে। যেমন, ধীরেন্দ্রনাথ বসু (সরোদী), হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল (সুরবাহার বাদক), কালিদাস পাল (এস্রাজী), ননী মতিলাল (সেতারী) প্রভৃতি। এসব অবশ্য ওই জলসার অনেককাল পরের কথা এবং করামতুল্লা কলকাতায় আসেন কৌকভ খাঁর অকাল মৃত্যুর পরে।

কথিত জলসার সময়ে কৌকভ খাঁ কলকাতায় কিছুদিন মাত্র এসেছেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গীত-প্রতিভার কথা কলকাতার সমঝদারদের মধ্যে জেনেছেন অনেকেই। তিনি খুবই উঁচুদরের বাজিয়ে। তবে সেজন্যে বেশ খানিক অহমিকা ছিল তাঁর মনে এবং বাংলাদেশে তাঁর তুল্য কলাবত আর কজন

আছেন—এমন দম্ভও নাকি তাঁর ছিল। অন্তত গোসাঁইজীর কোন কোন শিষ্য ও অনুরাগী কৌকভ খাঁর সম্বন্ধে এমন কথা শুনেছিলেন। তাই তাঁদের ইচ্ছে হয়েছিল, খাঁ সাহেবকে সেই জলসায় গোসাঁইজীর গান শোনাবার। খাঁ সাহেব কি বলেন তাঁর গান শুনে!

কিন্তু তাঁরা ভাবিত হলেন যে, গোসাঁইজীকে জলসায় আনা হবে কি ভাবে? প্রথমত, তিনি তখন কলকাতায় নেই, বিষ্ণুপুরে আছেন। দ্বিতীয়ত, কৌকভ খাঁর জলসায় গাইবার জন্যে তাঁকে আসতে লেখা হলে, খুব সম্ভব আসবেন না গোসাঁইজী। ভাববেন, হোমরা চোমরা পাগড়ি-ধারীর সঙ্গে আসরে হয়তো একটা লড়ালড়ি হবে, কি দরকার ঝামেলার মধ্যে যাবার।

এইসব সাতপাঁচ ভেবে, গোসাঁইজীকে যাঁরা সেই জলসায় আনতে চান, তাঁরা একটি বক্র উপায় স্থির করলেন। অব্যর্থ অস্ত্র হিসাবে একটি টেলিগ্রাম নিক্ষেপ করলেন গোসাঁইজীর বিষ্ণুপুরের ঠিকানায়—'মহীন্দ্রনাথের কলেরা হয়েছে।'

পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী মহীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় হলেন গোসাঁইজীর প্রিয়তম শিষ্য। এমন অনুপম মাধুর্যময় কণ্ঠ তখন খুব কম ধ্রুপদীরই ছিল। ১৫।১৬ বছর বয়স থেকে গোসাঁইজীর কাছে তিনি গান শিখতে আরম্ভ করেন এবং দ্বিতীয় কোন সঙ্গীতগুরু তাঁর ছিল না। এমন কি, তাঁর অতি সুমিষ্ট গলা শুনে এক আসরে স্বনামধন্য মৌজুদ্দিন তাঁকে ঠুংরী গান শেখাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও মহীন্দ্রনাথ সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এ জীবনে গোসাঁইজী ভিন্ন দ্বিতীয় কাউকে গুরু বলে পায়ে হাত দেব না—এই ধরনের কথা তিনি বলেছিলেন মৌজুদ্দিনকে।

তাঁর প্রতি মহীন্দ্রের ভক্তি শ্রদ্ধার কথা গোসাঁইজীর বিলক্ষণ জানা ছিল, যেমন তিনি জানতেন শিষ্যের অপূর্ব কণ্ঠ এবং একনিষ্ঠ সাধনার কথা। তাই মহীন্দ্রনাথকে তিনি শিষ্যদের মধ্যে প্রাণতুল্য ভালবাসতেন।

সুতরাং টেলিগ্রাম পাঠাবার ফল, প্রেরকরা যেমন আশা করেছিলেন, ঠিক তেমনি ফলল।

গোসাঁইজী কলকাতায় এসে উপস্থিত। সজল চোখ, ক্লিষ্ট শুষ্ক মুখ। অঙ্গে ফতুয়া। জামা চাদর ইত্যাদি পরবার কথা মনেও আসে নি। বিষ্ণুপুর থেকে প্রথম ট্রেন ধরেছেন কলকাতার।

কলকাতায় এসেই সোজা জোড়াসাঁকো অঞ্চলে লালমাধব মুখার্জী লেনের বাড়িতে "মহীন, মহীন"—বলতে বলতে ঢুকলেন। মহীন্দ্রনাথের জ্ঞাতিভাই

গোপালচন্দ্র এবং আরো দু-একজন (তাঁরা প্রস্তুত হয়েই ছিলেন) গোসাঁইজীর গলা শুনে এসে তাঁকে প্রথমে যত্ন করে বসালেন। বললেন, "আপনি একটু স্থির হোন, একটু বিশ্রাম করুন। মহীন আজ অনেকটা ভাল।"

গোসাঁইজী বললেন, "না, আমি এখানে বসব না। মহীনের ঘরে আমায় নিয়ে চল। আমি তাকে দেখে আসি।"

মহীন্দ্রনাথের ঘরে, তাঁর বিছানার পাশে গোসাঁইজীকে এনে বসানো হল। (মহীন্দ্র যথানির্দিষ্ট আপাদকণ্ঠ চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন, গোসাঁইজীর আওয়াজ পেয়ে।) তার পর শিষ্য একটুখানি উঠে গুরুর পায়ের ধুলো নিয়ে বললেন, "আজ ভাল আছি।"

সরলমতি গোসাঁইজী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তারপর তাঁর যথারীতি পরিচর্যার ব্যবস্থা হল বাড়িতে।

পরে একথা সেকথা আলোচনার মধ্যে একজন তাঁকে বললেন, "প্রভু, হরেন শীলের বাড়িতে কাল একটা বড় জলসা আছে। সকলের বড় ইচ্ছে, আপনি সেখানে গান করেন।"

মহীন্দ্রের কলেরা এত তাড়াতাড়ি সেরে যাওয়ায় গোসাঁইজীর মন তখন বড়ই প্রফুল্ল। এক কথায় রাজী হয়ে গেলেন, "বেশ তো, যাব। গাইব সেখানে। তোরা সব যাবি আমার সঙ্গে। মহীন যেতে পারবে তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, পারবে বোধ হয়। এই তো কাছেই।"

তারপর তাঁকে মেজাজ বুঝে বলা হল (এটাও আগে জানিয়ে রাখা দরকার), "আসরে আর কে একজন নাকি বাজিয়ে আসবে।"

গোসাঁইজীর তখন ভারি খুশী মন। বললেন, "আসুক কেনে। ওসব কিছু লয়। আমি গাইব, ওখানে জানিয়ে দে তোরা।"

যথারীতি আসরের পক্ষ থেকে তাঁর আমন্ত্রণের ব্যবস্থা হল।

রাজা দুনিয়াচাঁদ শীলের উত্তরাধিকারী হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীলের সেই প্রাসাদভবন বর্তমানে (জোড়াসাঁকোর) লোহিয়া মাতৃ সেবা সদন। সেখানকার সেদিনের জলসাঘরে আসর বসেছে। কৌকভ খাঁ এসেছেন। আরও অনেক সঙ্গীতজ্ঞ উপস্থিত। গোসাঁইজী শিষ্য-পরিবৃত হয়ে বসেছেন। তাঁর গান এবার আরম্ভ হবে।

কৌকভ খাঁ তখন বাংলায় বেশীদিন আসেন নি বলে এখানকার সঙ্গীত-সমাজের সকলকে চিনতেন না। গোসাঁইজীকে তিনি এক নজরে দেখে নিলেন আড়চোখে। গাইয়ের আকার-প্রকার মোটেই ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক নয়। ঈষৎ

খর্বকায়, একহারা শরীর। শান্ত, নিরীহ প্রকৃতির মানুষ তা মুখ-চোখে সুপ্রকাশ। দেখে তেমন ছাপ পড়ল না খাঁ সাহেবের মনে। ভাবলেন, কে তো কে! মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে বসে রইলেন।

গোসাঁইজী আরম্ভ করলেন গান—দরবারী কানাড়া। মিঞা তানসেন গঠিত এই রাগে গোসাঁইজী সিদ্ধ ছিলেন। আলাপচারীর প্রারম্ভেই তাই আভাস দিলেন অপূর্ব রাগরূপের।

কৌকভ খাঁ অন্যমনস্কের ভান আর করতে পারলেন না। উৎকর্ণ, সচকিত হয়ে শুনতে লাগলেন, গোসাঁইজীর দিকে মুখ ফিরিয়ে।

গোসাঁইজী (উদারাগ্রামে) খাদের কাজ করতে করতে মোচড দিয়ে মুদারায় গলা চড়ালেন। তার পর একটি মনোজ্ঞ মিড়ে সা থেকে রে-তে উঠতেই শিহরিত হলেন খাঁ সাহেব। নির্লিপ্ত থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হল, তিনি সাবাস দিয়ে উঠলেন। তার পর সবিস্ময়ে আদ্যোপান্ত শুনতে লাগলেন রাধিকাপ্রসাদের দরবারী কানাড়া।

গান শেষ হতে গায়ককে অভিনন্দিত করে বললেন, "বাংলায় যে এমন গাওয়াইয়া আছেন, আমার ধারণা ছিল না।"

শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা করে কিংবা বিসদৃশ অবস্থা এড়াবার জন্যে রাধিকাপ্রসাদ হোমরা চোমরা বা তেমন তেমন পাগড়ি ধারীদের এড়িয়ে চলতেন বটে। কিন্তু তাঁর নিজের (সঙ্গীত) বিদ্যা কিংবা আত্মশক্তির ওপর বিশ্বাসের অভাব ছিল না। সেখানে যদি কেউ আক্রমণ হানতেন, তিনি যত বড় পাগড়িই ধারণ করুন, গোসাঁইজী রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করতেন না বা শান্তির প্রলেপ দিয়ে অন্যায় অপমান বরদাস্ত করতেন না কখনও।

তা হলে ভবানীপুরের নাটোর-ভবনের সেই আসরের কথা এখানে বলতে হয়।

নাটোরের বর্তমান মহারাজা যোগীন্দ্রনাথ রায় তখন 'কুমার', অর্থাৎ তাঁর পিতা মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় তখন জীবিত। এটি সেই সময়কার কথা।

যোগীন্দ্রনাথ যৌবনকালে সঙ্গীত-চর্চা ভাল ভাবেই করেছিলেন। কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর ওস্তাদের কাছে রীতিমত শিক্ষা করেন কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত। তা ছাড়া, বাড়ির উচ্চাঙ্গের জলসায় নানা গুণীর মাঝে মাঝে যোগদান তো ছিলই। তিনি যে ওস্তাদদের কাছে তালিম পান, তাঁদের মধ্যে উক্ত করামতুল্লা খাঁ, বিশ্বনাথ রাও এবং রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর

নাম বিশেষ করে বলা যায়। প্রথম ব্যক্তির কাছে তিনি সরোদ, দ্বিতীয়ের কাছে ধ্রুপদ ধামার গান এবং গোসাঁইজীর কাছে ধ্রুপদের শিক্ষা পান।

যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, তখন যোগীন্দ্রনাথ একযোগে করামতুল্লার কাছে সরোদ এবং গোসাঁইজীর কাছে ধ্রুপদের পাঠ নিচ্ছেন। তাঁকে তালিম দিতে একদিন আসেন করামতুল্লা, অন্য একদিন আসেন রাধিকাপ্রসাদ।

একদিন যোগীন্দ্রনাথকে গোসাঁইজী নট কামোদের একটি গান দিয়েছেন। যোগীন্দ্রনাথ সেটি গলায় তোলবার পর, সেদিন কি ভেবে, করামতুল্লাকে শোনালেন গানটি আর জিজ্ঞেস করলেন, "দেখুন তো এই নট কামোদ ঠিক আছে কি না?"

হয়তো কিছু মনে না করেই প্রশ্নটা করে থাকবেন। কিংবা হয়তো নট কামোদ সুরের ঠিক বেঠিক নিয়ে দুই ওস্তাদের মধ্যে একটু বাধিয়ে দিয়ে কৌতুক দেখাও তাঁর উদ্দেশ্য হতে পারে, বলা যায় না। একটি রাগের রূপ নিয়ে দুজন আলাদা চালের সঙ্গীতজ্ঞ খুব কম ক্ষেত্রেই তো পুরোপুরি একমত হয়ে থাকেন ভারতীয় সঙ্গীতক্ষেত্রে! তাই কোন একটি নির্দিষ্ট রাগের রূপায়ন নিয়ে একের মত সম্পর্কে অন্যের মন্তব্য শুনতে চাইলে প্রায়ই তর্কাতর্কি বেধে যায়।

তা ছাড়া, করামতুল্লা দাম্ভিকও ছিলেন। অন্য ওস্তাদেরও যে গুণপনা থাকতে পারে তা অনেক সময় ভাবতেই পারতেন না। নট কামোদটি শুনেই তিনি ফতোয়া দিলেন, "ইয়ে গলদ্ হায়।"

তার পর রাধিকাপ্রসাদ আবার যেদিন এলেন, খাঁ সাহেবের মন্তব্যটি তাঁকে ফিরিয়ে শোনালেন যোগীন্দ্রনাথ, "আপনি যে নট কামোদ দিয়েছেন, করামতুল্লা বলছেন ও-তে ভুল আছে।"

গোসাঁইজী বললেন, "তাই নাকি? ওই নট কামোদ ঠিক নেই বলেছে?" তার পর বললেন একটু চুপ করে থেকে, "আচ্ছা, এক কাজ কর। মহারাজাকে ব্যাপারটা বলে একটা আসর বসাও। যে যে ওস্তাদ আর সমঝদারদের পারো খবর দিয়ে আনাও। আমি সকলের সামনে ওই নট কামোদ গাইব, দেখি বাইরের পাঁচজন শুনে কি বলে। করামতুল্লাকেও ওই আসরে আসতে বলবে। তবে আমি যে ওখানে গাইব কিংবা নট কামোদ নিয়ে কথা উঠবে—এসব ওকে বলো না। তা হলে ও আসবে না।"

যোগীন্দ্রনাথ গোসাঁইজীর কথা মতন জগদিন্দ্রনাথকে বলে একটি আসরের আয়োজন করলেন। এবং জগদিন্দ্রনাথও বুঝলেন গোসাঁইজীর ইঙ্গিত।

অনেককেই আমন্ত্রণ জানানো হল। করামতুল্লাকেও।

যথাসময়ে আয়োজিত সেই আসরে যাঁরা এলেন, তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত ধ্রুপদী গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপেশ্বরবাবু, করামতুল্লা খাঁ প্রভৃতি ছিলেন। রাধিকাপ্রসাদ উপস্থিত হলেন জলসা আরম্ভ হয়ে যাবার খানিক পরে, সকলের শেষে।

জগদিন্দ্রনাথ তাঁকে দেখে অভ্যর্থনা করলেন, "এই যে গোসাঁইজী, আসুন।" তার পর তাঁর গানের সময় এলে, বললেন, "গোসাঁইজী, আজ নটের ঘর হোক।"

রাধিকাপ্রসাদ সম্মতিতে একবার মাথা হেলিয়ে গান ধরলেন। আরম্ভ করলেন নটের ঘর। অর্থাৎ নব নট—শুদ্ধ নট, ছায়ানট, হাম্বীর নট, নট বেহাগ, নট ভৈরব, নট নারায়ণ, নট কেদার, নট কামোদ এবং নট মল্লার।

এই ন'টি নটের রাগ গোসাঁইজী একে একে গাইতে লাগলেন তাদের পার্থক্য প্রদর্শন করে। প্রত্যেকটিতে রাগ রূপ দেখিয়ে এবং স্থায়ী কলি গেয়ে তিনি নটের ঘরের পরিচয় পরিপাটীভাবে দিতে লাগলেন। প্রথমে শুদ্ধ নট ধরে শেষে গাইলেন নট কামোদ। তার মধ্যে নট কামোদের রূপটি সবচেয়ে বিস্তৃতভাবে দেখালেন।

গান শেষ হতে সভায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাধিকাপ্রসাদের তারিফ শোনা গেল।

তার পর জগদিন্দ্রনাথ উপস্থিত ব্যক্তিদের উদ্দেশ করে বললেন, "গোসাঁইজী এই যে সব গান গাইলেন, এই যে নট কামোদ শোনালেন—এসব কি আপনারা ঠিক মনে করেন? নাকি এ বিষয়ে আপনাদের অন্য মত আছে?"

এই বলে তিনি এক-একজনকে সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, "আপনি কি বলেন গোপালবাবু? গোসাঁইজীর নট সব ঠিক আছে?"

গোপালচন্দ্র বললেন, "না, না, এর মধ্যে কোন ভুল নেই।"

জগদিন্দ্রনাথ সমবেত গুণীদের একে একে প্রশ্ন করতে সকলেই জানালেন যে, গোঁসাইজীর গানে রাগরূপ ঠিক ঠিক আছে।

শেষে তিনি করামতুল্লা খাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "খাঁ সাহেব কি বলেন? নট কামোদ কিছু বেঠিক আছে?"

তিনিও বললেন, "না, এতে কোন গোলমাল নেই।"

তখন যোগীন্দ্রনাথ বলে উঠলেন (যেমন তাঁর বলবার ধরন মাঝে মাঝে হয়)—"খ্ খ্ খ্ খ্ খাঁ সায়েব, সেদিন যে বলেছিলেন গলদ আছে।"

খাঁ সাহেব মাথা নেড়ে দরাজ গলায় বললেন, "আরে নেহি নেহি। অ্যায়সা তো বোলা নেহি।"

আর একটি আসরের স্মৃতিকথা আছে। তবে এটি শান্তিপ্রিয় গোসাঁইজীর গান না গাওয়ার গল্প। এই ঘটনাটি থেকে সে যুগের সঙ্গীত সমাজের একটি অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায়।

এই আসর বসেছিল মতিলাল শীলের কলুটোলার বাড়ির কাছাকাছি একটি বাড়িতে, সান্‌কিভাঙ্গায়। অতীত কলকাতায় এই অঞ্চলটির নাম ছিল সান্‌কিভাঙ্গা, যা এখন অধিকার করে আছে মেডিক্যাল কলেজের বিস্তীর্ণ চত্বর এবং তার পর ট্রামলাইনের পূবদিকের কিছু অংশ। সেজন্যে প্রতাপ চাটুজ্যে লেন নিবাসী বঙ্কিমচন্দ্র সান্‌কিভাঙ্গার অধিবাসী ছিলেন। সান্‌কিভাঙার সেই বাড়ির আসরের আয়োজন করেছিলেন এমন কয়েকজন সঙ্গীতজ্ঞ যাঁরা গোসাঁইজীর প্রতি মনঃক্ষুন্ন ছিলেন সে সময়। কারণ—তখন একটি কথা রটেছিল—রাধিকাপ্রসাদ নাকি কোথায় মন্তব্য করেছেন যে, লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্র শুধু টপ্পা গাইয়ে আর বিশ্বনাথ রাও ধামার গাইয়ে, ধ্রুপদের কারবারী তাঁরা নন এই ধরনের কথা।

কথাটি ওই দলের কানে উড়ে আসে এবং তাঁদের পক্ষে আসরটির প্রধান উদ্‌যোক্তা হন মহীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। মহীন্দ্রনাথ তখনকার নামকরা হার্মোনিয়াম বাদক ছিলেন। তিনি যেমন মজলিসী তেমনি শৌখিন ব্যক্তি, গোলাপ জলে স্নান করতেন ইত্যাদি। পরে তিনি আরো নাম-করা হয়েছিলেন নোট জালের অভিযোগে আন্দামানে দ্বীপান্তর বাস করে। সেখানে নাকি জেলারের পরিবারে সঙ্গীত-শিক্ষা দিয়ে আবার ওরই মধ্যে কিছু কিছু সুখ-সুবিধা আদায় করে নিতেন। যা হোক, মহীন্দ্রনাথ এই আসরটির আয়োজন করে-ছিলেন বিশ্বনাথ রাও এবং লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্রের ধ্রুপদ গুণপনা রাধিকাপ্রসাদকে দেখাবার জন্যে।

লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্র অবশ্যই মাত্র টপ্পা গায়ক ছিলেন না। তাঁর তুল্য সর্বতোমুখী সঙ্গীতজ্ঞ পশ্চিমাঞ্চল থেকে খুব কমই আসেন বাংলায়। তিনি একাধারে বীণ্‌কার, সেতারী ও তবলাবাদক এবং ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা গায়ক। আর বিশ্বনাথ রাও আসলে ধ্রুপদীই ছিলেন, কিন্তু বাংলাদেশে তাঁর অভিনব তারানা এবং সার্গম ও বাঁট-যুক্ত ধামার গান অসাধারণ জনপ্রিয় হওয়ায় তিনি অনেক সময় তারানা, ধামার গাইতেই অনুরুদ্ধ হতেন এবং বিশ্বনাথ ধামারীরূপেই

সাধারণের পরিচিত হয়ে ওঠেন। তাঁর পরিচয় রমজান খাঁর প্রসঙ্গে আগেই দেওয়া হয়েছে।

সেই আসরে আমন্ত্রিত হয়ে রাধিকাপ্রসাদ উপস্থিত হয়েছেন, উদ্‌যোক্তাদের উদ্দেশ্যের কথা কিছুই না জেনে। বিশ্বনাথ রাও এবং লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্রও (তাঁর পুত্র হরিদাস এবং ভ্রাতা কেশবকে নিয়ে) সেই বাড়িতে এসেছেন। কিন্তু পূর্ব-ব্যবস্থা মতন আসরে আসীন না হয়ে অন্য ঘরে বসেছেন, খানিকক্ষণ আত্মগোপন করে থাকবার জন্যে।

এদিকে আসর আরম্ভ হতে বড দেরি হয়ে যাচ্ছে—কারণ কোন সঙ্গতকার পাখোয়াজী তখনো এসে পৌছন নি—এবং শ্রোতারা অধৈর্য হয়ে পড়েছেন দেখে মহীন্দ্রনাথের অনুরোধে রাধিকাপ্রসাদ প্রথমে তবলার গান অর্থাৎ খেয়াল গাইলেন। বিশ্বনাথ রাও, লক্ষ্মীপ্রসাদ প্রভৃতি তখনো বসে আছেন অন্যত্র, আসরে উপস্থিত হন নি।

তার পর মৃদঙ্গী দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং দেবেন্দ্রনাথ দে উপস্থিত হওয়াতে ধ্রুপদের আসর আরম্ভ হবার সময় বিশ্বনাথ রাও, লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্র প্রভৃতি সদলে আত্মপ্রকাশ করলেন। কিন্তু আসরের মধ্যে স্থান না নিয়ে বসলেন একটু দূরে, সাধারণ শ্রোতাদের সঙ্গে।

গোসাঁইজী এসব ব্যাপার লক্ষ্য করেন নি। তিনি নতুন করে তানপুরা বেঁধে ধ্রুপদ ধরবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছেন। এমন সময় মহীন্দ্রবাবু, যেন হঠাৎ শ্রোতাদের দিকে দৃষ্টি পডায় আশ্চর্য হয়ে বলে উঠলেন, "এ কি মিশ্রজী, বিশ্বনাথজী! আপনারা ওখানে রয়েছেন কি? এখানে এসে বসুন। এঁর পরে যে আপনাদের গাইতে হবে।"

লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্র সেখান থেকেই কেমন এক গলায় জবাব দিলেন, "আমি ওখানে বসে কি গাইব? ও তো ধ্রুপদের আসর। আমি ধ্রুপদের কি জানি? আমি তো টপ্পা গাই।"

গোসাঁইজী হাতের তানপুরার গুঞ্জন থামিয়ে কথাটা শুনলেন। মনে খট্‌কা লাগল।

তার পর অনুরুদ্ধ হয়ে বিশ্বনাথজীও যখন বাঁকাভাবে বললেন, "আমি কি আলাপ করব, ধ্রুপদ গাইব! তারানা আর ধামার ছাড়া আমি কি জানি?"

রাধিকাপ্রসাদ তখন স্পষ্টই বুঝলেন, হাওয়া বেতালা বইছে। এঁদের ধরন-ধারণ সব বেসুরো ঠেকছে তাঁর।

মহীন্দ্রবাবু ইঙ্গিতপূর্ব ভাবে ওস্তাদদের দিকে চেয়ে আবার আহ্বান

জানালেন, "সে কি কথা? তাও কি হয়? আপনারা এখানে আসুন। ছেড়ে দিন ওসব কথা!"

গোসাঁইজী তাঁর দিকে ফিরে বললেন, "এসব কি কথা শুনছি? আমি তো কখনও এমন কথা বলি নি!"

"যেতে দিন গোসাঁইজী, যেতে দিন। আড়ালে অমন কত কথা হয়ে থাকে। সামনে কেউ কিছু বলে না। ওসব কথা বাদ দিয়ে এখন গান আরম্ভ করুন।"

গান আরম্ভ করবার মুখেই এই ধরনের বাদ-বিসম্বাদে গোসাঁইজীর গানের মেজাজটি একেবারে নষ্ট হল। মনের সূক্ষ্ম তারটি ছিঁড়ে গেল তাঁর।

তিনি বললেন, "না, এ আসরে আমি গাইব না।"

মহীন্দ্রবাবু তাঁকে আটকে রাখবার জন্যে বললেন, "কিন্তু আপনি গান না গেয়ে এখান থেকে এভাবে চলে গেলে আপনার নাম খারাপ হবে।"

রাধিকাপ্রসাদ ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। জবাব দিলেন, "হোক নাম খারাপ। আমি চললাম।"

তাঁকে সত্যিই সে আসরে আর রাখা গেল না। সাঙ্গীতিক পরিবেশের মধ্যে অশান্তির ইঙ্গিত পেয়ে সে আসর ত্যাগ করে গেলেন তিনি। অবশ্য সে গানের আসর তার পর আবার বসেছিল।

তিনি চলে যাবার পর বিশ্বনাথ রাও এবং লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্র দুজনেই ধ্রুপদ গেয়েছিলেন সে আসরে।

গোসাঁইজীর আর একটি আসরের গল্প বলে তাঁর প্রসঙ্গ শেষ করা হবে। এই ঘটনাটি থেকে তাঁর যেমন প্রগাঢ় রাগ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি প্রভূত আত্মবিশ্বাসেরও। রাগের গঠন ও রূপ অবিকৃত রাখার বিষয়ে আগেকার আমলের ধ্রুপদীরা যে কতখানি নিষ্ঠাবান ছিলেন, এই আসরের বৃত্তান্তটি তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

এ আসরের সূত্রপাত হয় রামপুর ঘরানার বিখ্যাত খেয়াল ও তারানা গায়ক মুস্তাক হোসেন খাঁর মালকোষ গাইবার উপলক্ষ্যে। মনোমোহন থিয়েটার তখনো সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের উত্তরমুখী অভিযানে নিশ্চিহ্ন হয় নি। সেই মনোমোহন মঞ্চে সেবার মুস্তাক হোসেনের গান হল—মালকোষ। ওস্তাদজীর অসাধারণ রেওয়াজী গলা এবং মালকোষ রাগে তিনি সিদ্ধ ছিলেন। (সম্প্রতি তিনি পরলোক গমন করেছেন ৮৫ বছর উত্তীর্ণ হয়ে।) অপূর্ব তান কর্তবে সমুজ্জ্বল

খাঁ সাহেবের সেই গান শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে। সেখানে গোসাঁইজীর কয়েকজন শিষ্য উপস্থিত ছিলেন—ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ললিতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। তাঁদের মনেও গভীরভাবে ছাপ দেয় খাঁ সাহেবের গান।

তাঁরা ফিরে গিয়ে গোসাঁইজীর কাছে মুস্তাক হোসেনের সেই অসাধারণ গানের বিবরণ দিলেন এবং তাঁর মনে একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যে টীকা টিপ্পনী জুড়ে দিলেন, "প্রভু, মালকোষে এভ রকমের কাজ আমরা কখনো শুনি নি। আপনিও তো আমাদের মালকোষ দিয়েছেন কিন্তু এত ভ্যারাইটির কাজ আমরা পাই নি।"

তাঁদের বাক্যবাণ লক্ষ্যস্থল অর্থাৎ গোসাঁইজীর মর্ম ঠিক বিদ্ধ করলে। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, "বলিস কি রে? এমন গাইলে? তা হলে তো আমাকেও একদিন শুনতে হচ্ছে। খাঁ সাহেবের একটা আসরের ব্যবস্থা কর।"

তখন তাঁরা ৺লালচাঁদ বড়ালের পুত্রদের বলে তাঁদের বাড়িতে একদিন মুস্তাক হোসেনের গান শোনবার ব্যবস্থা করলেন। সেখানে খাঁ সাহেবের গানের দিন গোসাঁইজীও শুনতে এলেন শিষ্যদের সঙ্গে। আরো কয়েকজন সঙ্গীতজ্ঞ, সমঝ্‌দারও সভায় এলেন এবং খাঁ সাহেবকে মালকোষ গাইতে অনুরোধ করা হল।

ওস্তাদ মুস্তাক হোসেন মালকোষ গান আরম্ভ করলেন এবং চমৎকার গাইতে লাগলেন। সত্যিই অশ্রুতপূর্ব কারুকর্ম তিনি দেখাতে লাগলেন রাগের অলঙ্করণে।

খানিক শোনবার পর গোসাঁইজী তাঁকে গানের মধ্যেই জিজ্ঞেস করলেন, "খাঁ সাহেব, এটা কি রকম হল? এই যে তানটা করলেন, এখানে মালকোষ বজায় রইল কি?"

মুস্তাক হোসেন গান থামিয়ে রাধিকাপ্রসাদের মুখের দিকে একটুখানি চেয়ে বললেন, "তা বটে। মালকোষের একটু ফারাক হল।" বলে, গাইতে আরম্ভ করলেন।

তার পর গোটাকয়েক পাল্‌টি দিতেই আবার গোসাঁইজী বললেন, "খাঁ সাহেব, এখানে কি ভীমপলাশী এসে গেল না?"

মুস্তাক হোসেন গান থামিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, কথাটা ঠিকই বলেছেন।" বলে আবার গাইতে লাগলেন।

খানিক পরে গোসাঁইজী আবার ধরলেন, "এখানটা কিরকম হল? এই কি মালকোষ?"

এইভাবে তিন-চার বার গোসাঁইজী প্রশ্ন করবার পর মুস্তাক হোসেন গান থামিয়ে দিলেন। এ রকম করে তো গান গাওয়া চলে না। খাঁ সাহেবের মুখে চোখে উষ্মার ভাব ফুটে উঠল। কিন্তু কি আর বলেন—গোসাঁইজীর point of order যে অকাট্য। আসরে আরও সমঝদার রয়েছেন, তাঁদের সকলেরই সায় দেখা যাচ্ছে গোসাঁইজীর কথায়। মুস্তাক হোসেন অস্বীকার করতে পারলেন না যে, মালকোষের রাগরূপ বিকৃত হয়েছে। রাধিকাপ্রসাদ নিছক তাত্ত্বিক তর্কের মধ্যে গেলেন না। তাঁর সাঙ্গীতিক ব্যক্তিত্ব তখন দৃঢ়ভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠ! তিনি খাঁ সাহেবকে এবং সভার সকলকে গেয়ে শুনিয়ে দিলেন শুদ্ধ মালকোষের রূপ—অবিকৃত, অকৃত্রিম।

সমস্ত সভার সমর্থন রাধিকাপ্রসাদ নিজের মতের দিকে আকর্ষণ করে নিলেন। মুস্তাক হোসেন গোসাঁইজীর কৃত মালকোষের রাগরূপের কোন ত্রুটি দেখাতে পারলেন না এবং স্বীকার করলেন তাঁর গুণপনা।

গোসাঁইজী শেষে গান থামিয়ে তাঁকে বললেন, "আমরা তো ওই ফিকিরেই পড়ে গেছি, খাঁ সাহেব। বিস্তারের কাজ আমরাও কিছু কিছু জানি। কিন্তু রাগটাও আবার ঠিক ঠিক জেনেছি বলে সব মেশামিশি করতে পারি না। জেনে শুনে রাগ নষ্ট করে, গান চটক্‌দার করে শ্রোতাদের বাহবা নিতে কেমন বাধে।"

মোগলাই কীর্তন

বিগত যুগের একজন গুণী গায়ক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। তিনি বাঙ্গালী হলেও বাংলা নিবাসী ছিলেন না। অবশ্য তাঁর জন্মস্থান যে প্রদেশে তার সঙ্গে বাংলার যোগাযোগ অন্তত সেকালে ছিল প্রায় অচ্ছেদ্য। এমন কি তার চেয়ে অনেক দূরের প্রদেশের সঙ্গেও বাংলার আত্মিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগ জীবন্ত ছিল। সেসব দিনে বর্ধিষ্ণু বাঙ্গালী জাতি নব জাগৃতির ভাবধারায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে প্রদেশে প্রদেশে অভিযান করেছিল সংস্কৃতির নানা অঙ্গে নতুন সৃষ্টির প্রেরণা নিয়ে। তাই সেযুগে বাংলার মানচিত্র, রাষ্ট্রনীতিক ভাবে নয়, সাংস্কৃতিক দিক থেকে বহু-বিস্তৃত ছিল, বলা যায়।

সেই সূত্রে, আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কথিত 'বৃহত্তর বঙ্গ' কথাটি ভারতীয় সঙ্গীতক্ষেত্রে প্রয়োগ করে হয়তো বলা চলে যে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

ছিলেন বৃহত্তর বঙ্গ নিবাসী। কারণ মজুমদার মহাশয়ের পৈতৃক বাস ছিল বিহারের ভাগলপুর শহরে। তাঁরা সেখানকার কয়েক পুরুষের প্রাচীন বাসিন্দা ছিলেন, যখন বিহার আর বাংলার প্রাদেশিক অস্তিত্ব এমন গণ্ডিবদ্ধ ছিল না, তখন থেকে।

শতাব্দের পর শতাব্দ বাংলা বিহার ঘনিষ্ঠ থাকবার পর বৃটিশ কূটনীতিতে ১৯১১ সালে বিচ্ছিন্ন হয়। কিন্তু তার আগে সুদীর্ঘকাল ধরে সাংস্কৃতিক জগতে বর্ধিষ্ণু বাঙ্গালী তার আপন ভাষাভাষী অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে প্রসারিত হয়েছিল। তারও বহু আগে, পাল রাজাদের সুদীর্ঘ আমলে পশ্চিম-উত্তর বাংলা আর বিহারের মধ্যে কোন বিভাগের রেখাও ছিল না, একথা বলা বাহুল্য। অত দূরের কথায় কিংবা ইতিহাসের আলোচনায় আমাদের প্রয়োজন নেই। এখানে আলোচ্য প্রসঙ্গ হল, বাংলার বাইরে যে বাঙ্গালীরা সঙ্গীতচর্চা করেছিলেন তাঁদের কথা। যেমন, ভাগলপুরের সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, বিহার, উড়িষ্যা, এমন কি যুক্তপ্রদেশেও সঙ্গীতচর্চার ক্ষেত্রে বহুদিন থেকে বাঙ্গালীর রীতিমত অবদান আছে। উড়িষ্যার কথাই যদি ধরা যায়, তার সঙ্গে তো বাংলার সাঙ্গীতিক সংযোগ ঘটেছে অন্তত আটশ বছর আগে। সঙ্গীতজ্ঞ কবি নৃত্যবিদ জয়দেবের গীতগোবিন্দ প্রচলনের সময় থেকে। তাঁর তিনশ বছর পরে প্রেমের অবতার শ্রীচৈতন্য উড়িষ্যায় আমৃত্যু অবস্থান করতে গেলেন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হল বাংলার এক নিজস্ব সঙ্গীত-সম্পদ—কীর্তন। তার পর উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে অন্য এক গীতি রীতি বাঙ্গালী সেখানে নিয়ে গেল—হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ। ধ্রুপদগুণী মুরাদ আলী খাঁর শ্রেষ্ঠ শিষ্য যদুনাথ রায় ময়ূরভঞ্জ রাজাদের তিন পুরুষ ধরে দরবারী গায়ক থেকে তাঁর সমগ্র সঙ্গীত-জীবন সেখানে প্রবাসী বাঙ্গালী হয়ে উদ্‌যাপন করলেন।

যুক্তপ্রদেশের কাশী, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ প্রভৃতি সব জায়গার বিবরণ দিতে গেলে তালিকা দীর্ঘ হয়ে যাবে। শুধু কাশীর উল্লেখ করা যাক। গত শতকে সেখানকার বীণ্‌কার মহেশচন্দ্র সরকার, ধ্রুপদী রামদাস গোস্বামী (জীবনের শেষ ২০ বছর), ধ্রুপদী উপেন্দ্রনাথ রায়, ধ্রুপদী হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি চিহ্ন রেখে গেছেন বারাণসীর সঙ্গীত-জীবনে।

বিহারের মধ্যে সঙ্গীতকেন্দ্র ছাপরা জেলার নাম আগে মনে আসে। কারণ এখানে প্রায় দুশ' বছর আগে বাংলার সর্বজ্যেষ্ঠ টপ্পাচার্য নিধুবাবু প্রায় আঠারো বছর বাস ও সঙ্গীতচর্চা করেছিলেন। ছাপরায় তিনি অবশ্য কোন অবদান

রেখে আসেন নি, কিন্তু এখানেই তাঁর বাংলা টপ্পা রচনা ও গান করা আরম্ভ হয়েছিল, এটি লক্ষণীয়। উনিশ শতকের মজঃফরপুরের বিখ্যাত পাখোয়াজী ('গীতবাদ্য সারসংগ্রহ' পুস্তকের লেখক) চারুচরণ মুখোপাধ্যায় সেখানকার সঙ্গীতক্ষেত্রে একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। তেমনি গয়ার এস্রাজ-গুণী যোগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (ভেলুবাবু)-কে কেন্দ্র করে একটি সঙ্গীত-সমাজ গঠিত হয় সেখানে। সঙ্গীতকেন্দ্র পাটনায়ও বাঙ্গালী সঙ্গীতজ্ঞদের অপ্রতুল হয় নি। তেমনিভাবে উল্লেখযোগ্য ভাগলপুরে বৃহত্তর বাংলার সঙ্গীতগোষ্ঠী, সেখানকার মজুমদার পরিবার প্রভৃতি, বিশেষ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

ভাগলপুরের অন্যান্য বাঙ্গালী সঙ্গীতজ্ঞ কিংবা আদমপুর ক্লাবের সঙ্গীতচর্চা ইত্যাদির কথা এখানে বলবার অবকাশ নেই। কিন্তু, প্রথম জীবনে ভাগলপুর নিবাসী স্বনামধন্য কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের নাম উল্লেখ করতেই হয় এই কারণে যে, তাঁর সঙ্গীত-জীবনে ভাগলপুরের সাঙ্গীতিক পরিবেশ বিশেষ আদমপুর ক্লাব ও মজুমদার পরিবারের গভীর প্রভাব ছিল।

আদমপুর অঞ্চলে যে মজুমদার বংশে সুরেন্দ্রনাথের জন্ম তা সেখানে সঙ্গীত-চর্চার জন্যে সুপরিচিত হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথেরা ছিলেন ছ ভাই এবং সকলেই অল্পবিস্তর সঙ্গীতজ্ঞ। তাঁদের মধ্যে তিনি জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ। কনিষ্ঠ দুজন মণীন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন, কিন্তু বিশেষ করে তৃতীয় ভ্রাতা রাজেন্দ্র-নাথের মধ্যে যে প্রতিভা ছিল তা রীতিমত সাধনায় হয়তো সার্থক হয়ে উঠতে পারত। রাজেন্দ্রনাথ ছিলেন সুমিষ্ট বেহালাবাদক, কিন্তু দুরন্ত স্বভাবের বশে ভাগ্যের বিচিত্র গতিতে তিনি প্রথম যৌবনে নিরুদ্দেশ হয়ে যান এবং তাঁর সঙ্গীত-জীবনও থেকে যায় অপূর্ণ। রাজেন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও তাঁকে শরৎচন্দ্র ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখেছিলেন মজুমদার বাড়িতে, আদমপুর ক্লাবে, খেলার মাঠে, ভাগলপুরের গঙ্গার চরে, গঙ্গায় ডিঙ্গীতে। কিশোর কালের সেই অতিশয় সজীব চরিত্র রাজেন্দ্রনাথকে পরবর্তীকালে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র নিজের অপূর্ব রোমান্টিক কল্পনায় রঞ্জিত ও চিত্রিত করে শ্রীকান্ত প্রথম পর্বের ইন্দ্রনাথ নামে অমরত্ব দিয়েছেন। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, ভাগলপুরের জীবনে শরৎচন্দ্রের যে সঙ্গীতচর্চার সূত্রপাত হয় তা উত্তরকালে তাঁর রেঙ্গুন প্রবাসেও বর্তমান ছিল এবং ভাগলপুরের মতন রেঙ্গুনের বাঙ্গালী সমাজের অনেকের কাছে তিনি পরিচিত ছিলেন সুকণ্ঠ গায়করূপে। রেঙ্গুনে নবীন সেনের সংবর্ধনা সভায় শরৎচন্দ্রের উদ্‌বোধন গীতি গান করা ও সেই উপলক্ষে নবীনচন্দ্র কর্তৃক তাঁর 'রেঙ্গুন রত্ন' আখ্যা লাভ ইত্যাদি কথা পাঠক-পাঠিকাদের জানা আছে, আশা করি।

এখন সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গীতপ্রসঙ্গ। পরবর্তী জীবনে তাঁর সঙ্গীত খ্যাতি ভাগলপুরে সীমাবদ্ধ ছিল না এবং তিনি সমসাময়িক কালের বাঙ্গালী গুণীদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপে গণ্য হতেন। কলকাতার সঙ্গীতজ্ঞ সমাজেও তিনি গায়করূপে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং গ্রামোফোন রেকর্ডে দুখানি গানের জন্যে সঙ্গীতপ্রিয় জনসাধারণের মধ্যেও সুপরিচিত হয়েছিলেন।

ভাগলপুরে অল্পবয়স থেকে সুরেন্দ্রনাথ সঙ্গীতে আসক্ত হন বটে, তবে তাঁর রীতিমত সঙ্গীতশিক্ষা ঘটে কলকাতায়। তাঁর কলেজের ছাত্রজীবন কলকাতায় অতিবাহিত হয়েছিল এবং তাঁর মূল সঙ্গীতশিক্ষাও হয় সেই সময়। তখনকার কালের ভারতবর্ষের একজন শ্রেষ্ঠ কলাবত এবং বারাণসীর বিখ্যাত প্রসদ্দু মনোহর ঘরানার এক রত্ন রামকুমার মিশ্রকে তিনি কলকাতায় পেয়ে তাঁর কাছে কয়েক বছর শিখেছিলেন। উত্তরকালের সুপরিচিত কলাবত লছমীপ্রসাদ বা লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্রের পিতা ছিলেন রামকুমার মিশ্র।

মনোহর মিশ্রের পুত্র রামকুমার তাঁর সঙ্গীত-জীবনের অধিকাংশ বাংলাদেশে বাস করে বাংলায় রাগসঙ্গীতের শ্রীবৃদ্ধিতে খুবই সহায়তা করেছিলেন। তাঁর শিষ্য হয়ে সুরেন্দ্রনাথ ভিন্ন আরো কয়েকজন বাঙ্গালী কৃতবিদ্য হয়েছিলেন কণ্ঠ-সঙ্গীতে, বিশেষ টপ্পা অঙ্গে। বারাণসীর এই মিশ্র ঘরানার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, ধ্রুপদ ধামার খেয়াল টপ্পা ইত্যাদি রীতির কণ্ঠসঙ্গীতের সঙ্গে ঘরানাদাররা বীণা, সেতার এবং পাখোয়াজ তবলা ইত্যাদি যন্ত্রেরও চর্চা করতেন। এই ঘরানায় টপ্পার উৎস সম্পর্কে জানা যায় যে, প্রসদ্দু (হরিপ্রসাদ) মিশ্র প্রথম টপ্পা সম্পদ লাভ করেন স্বনামধন্য টপ্পা সঙ্গীত রচয়িতা গোলাম নবীর (শোরী মিয়াঁ) শিষ্য গামুর পুত্র সাদি খাঁর কাছে। রামকুমার মিশ্র তাঁর পিতৃব্য প্রসদ্দু মিশ্রের কাছে সেই টপ্পা-সম্পদের ধারা লাভ করেন এবং তিনি টপ্পা অঙ্গের চর্চায় বেশি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাই দেখা যায়, তাঁর শিষ্যদের মধ্যে প্রায় সকলেই বিশেষভাবে টপ্পা-সঙ্গীতে কৃতী হয়েছিলেন। রামকুমারের সেই শিষ্যবৃন্দের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ ভিন্ন উল্লেখযোগ্য ছিলেন মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রবালা ও কিরণবালা (সুরেন ও কিরণ বাঈজী নামে প্রসিদ্ধা এবং বাংলার এক সুপণ্ডিত ব্যক্তির সমাজ বহির্ভূতা কন্যাদ্বয়) প্রভৃতি। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ টপ্পা সঙ্গীতে নেতৃস্থানীয় হয়ে কৃতী শিষ্যধারা প্রবর্তন করেছিলেন। যেমন, মহেশ ওস্তাদ নামে সুপরিচিত মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। রামকুমারের শিক্ষাপ্রাপ্ত তাঁর দ্বিতীয় পুত্র লছমীপ্রসাদ মিশ্র ছিলেন বহুমুখী সঙ্গীতপ্রতিভা এবং বাংলাদেশে আমৃত্যু অবস্থান করে অনেক শিষ্য গঠন

করেছিলেন। তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে রাধিকাপ্রসাদের প্রসঙ্গে।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার যে টপ্পা ও টপ্ খেয়াল রীতির গায়করূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন, তা প্রধানত রামকুমার মিশ্রের কাছে শিক্ষা ও সঞ্চয়ের ফলে। গায়ক তসদ্দুক হোসেনের কাছেও সুরেন্দ্রনাথ কিছু শিখেছিলেন, শোনা যায়। তা ছাড়া, তিনি ধ্রুপদী মুরাদ আলীর অন্যতম শিষ্য কিশোরীলাল মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষাও লাভ করেছিলেন, একথা জানিয়েছেন কিশোরীলালের পুত্র, অগ্নিযুগের অন্যতম নেতা যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর "বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি" গ্রন্থে (১৫৫ পৃষ্ঠা): "সুবিখ্যাত গায়ক ভাগলপুরের বাবু সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি তমলুক এবং মেদিনীপুরে বাবার কাছে গান শিখতেন। অবশ্য তাঁর ওস্তাদ অন্য লোক ছিলেন।"

কর্মজীবনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রূপে সুরেন্দ্রনাথকে বিভিন্ন জায়গায় স্থানান্তরিত হতে হত, সেজন্যে কলকাতায় তিনি বিশেষ অবস্থান করতে পারেন নি। চাকুরি সূত্রে মফস্বলে ও নানা স্থানের প্রশাসনিক কেন্দ্রে জীবনের অধিকাংশ সময় বাস করার জন্যে তাঁর গুণের যোগ্য খ্যাতিমান তিনি হন নি সাধারণের মধ্যে। তাঁর সব কর্মস্থলে সঙ্গীতজ্ঞ সমাজ ও সঙ্গীতের উপযুক্ত পরিবেশও ছিল না। অবশ্য যেথানেই থাকুন, সঙ্গীতচর্চা তিনি বরাবরই করেছিলেন অন্তরের প্রেরণায়, তবে বৃহত্তর সঙ্গীতপ্রিয় সমাজ অনেক সময় বঞ্চিত থাকত তাঁর সুরসুধার আস্বাদন থেকে।

সুরেন্দ্রনাথের গলায় আওয়াজ একটু 'ঝিম্' ছিল। কিন্তু সেজন্যে তাঁর সঙ্গীত-কৃতির মূল্য কিছু কমে না। কণ্ঠস্বর উদাত্ত হওয়া না হওয়ায় গায়কের নিজের কোন হাত নেই, তা তাঁর সাধনার গুণাগুণের ওপরেও নির্ভরশীল নয়। কণ্ঠস্বর অনেকখানিই গায়কের সহজাত, স্বভাবজ। বিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কলাবত ও সঙ্গীতসাধক আব্‌দুল করিম খাঁর সঙ্গীতকণ্ঠ যে ঝিম্ ছিল, তা কি তাঁর অবগুণ বলে মনে রাখা হয়? বিগত যুগের বাংলার এক অতি সুললিত টপ্পা গায়ক রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কৃতী শিষ্য) গলাও ঝিম্ ছিল। এমন আরো কোন কোন গুণী গায়কের ঝিম্ গলার কথা শোনা যায়। সে যা হোক, সুরেন্দ্রনাথের গলা ঝিম্ হলেও অতি সুরেলা ছিল। গানের জমিতে টপ্পার লালিত্যময় দানার নক্‌শা তিনি এমন মনোমুগ্ধকর ভাবে ফুটিয়ে তুলতেন যে, সুরের কুহক সৃষ্টি হত আসরে। বাংলা ও হিন্দী দু ভাষার টপ্পাই অন্তরের দরদের সঙ্গে গেয়ে শ্রোতাদের মোহিত করতেন।

তাঁর সঙ্গীতকৃতির এই এক বৈশিষ্ট্য ছিল যে, বাংলা ও হিন্দী দুই টপ্পাতেই

তাঁর গুণপনা প্রকাশ পেত। হিন্দুস্থানী ওস্তাদের অধীনে রীতিমতভাবে হিন্দুস্থানী টপ্পার চর্চা করলেও বাংলা গানের প্রতি কম আকর্ষণ বোধ করতেন না তিনি এবং বাংলা গানও মর্মস্পর্শী ভাবে গেয়ে মাতিয়ে তুলতেন শ্রোতাদের। টপ্পা অঙ্গে বাংলা গান গেয়েও তাঁর সঙ্গীতপ্রাণ স্ফূর্তিলাভ করত। তা ছাড়া কীর্তন গানও তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল এবং কীর্তন গাইতেন প্রাণের আবেগে। তাঁর কীর্তন গানের প্রসঙ্গ পরে আসবে। তার আগে তাঁর টপ্পার কথা।

কীর্তন প্রভৃতি বাংলা গান তিনি পছন্দ করতেন এবং গাইতে ভালবাসতেন বটে, কিন্তু প্রধানত তিনি হিন্দুস্থানী টপ্পা ও টপ্‌খেয়াল গায়কই ছিলেন। টপ্পা ও টপ্‌খেয়াল অঙ্গে বাংলা গানও তিনি প্রায়শ গাইতেন। কীর্তন ভিন্ন তাঁর অন্য বাংলা গান প্রায় সবই হত টপ্পার ধরনে। তাঁর সঙ্গীতকৃতির উৎসমূলে ছিল টপ্পারীতি। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের আসরে তিনি টপ্পা ও টপ্‌খেয়াল গানের জন্যেই সুপরিচিত ছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথের প্রিয় রাগ ছিল দেশ, মল্লার, রামকেলি, ইমন, ভৈরবী, বেহাগ প্রভৃতি। সম্পূর্ণ রাগই তিনি পছন্দ করতেন বেশি এবং মধ্যমান ও আড়া ঠেকাতে গাইতেন।

যেসব হিন্দী গানে তিনি শ্রোতাদের চিত্তজয় করতেন, তাদের মধ্যে এই ক'টির কথা জানা যায়। যথা, দেশমল্লারে—

এরি মেহারওয়া বরখে
বহুকি নাদ ঘন গরজে।
দেশ দেশকে বাদর ছায়ে
কাঁহা চোর ঘন ঘোর মোর
সোর করত অব নিশিদিন।...

পিয়ালা ভর্ দে রে (রামকেলি), দেখ্‌না দীদার (বেহাগ), (তাঁর রেকর্ড-করা) বাল্‌মা প্রহরওয়া জাগি রে (আশাবরী) ইত্যাদি।

তাঁর প্রিয় বাংলা (টপ্পা অঙ্গের) গানের মধ্যে দুটি এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়া হল—

(বেহাগ)

এ সুখ বসন্ত সই কেন গো আপনহারা,
বিবশা আহা মরি।
কুন্তল আলুথালু এলায়ে
কপোল 'পরি॥

হাসে চন্দ্র ঘুমন্ত জোছনা হাসি,
ঢালে ধারা মল্লিকা সুরভি রাশি
গাহে পাপিয়া পিউ পিউ পিউ
কুঞ্জে কুঞ্জে রে ॥
যদি হাসে চন্দ্র মধুর হাসি রে,
মলিন কেন হেরি ও মুখশশী রে।
যদি গায় পাখী তবে কেন সখি
নীরবে রহিবি রে ॥
আয় কুঞ্জে ফুটন্ত মালতী তুলি,
গাঁথি মালিকা দুজনে মিলি,
গানে গানে পোহাইব রজনী,
সজনি রে ॥

(ইমন)

আমার কথা কস্‌নে লো সই
দেখা হলে তারি সনে।
জিজ্ঞাসিলে বলিস না হয়
বেঁচে আছে প্রাণে প্রাণে ॥
যে দিয়েছে মর্মব্যথা,
মরমে তা আছে গাঁথা,
মনে হলে সেসব কথা
প্রাণ যে থাকে না প্রাণে ॥

সুরেন্দ্রনাথ সঙ্গীতে এমন তদ্‌গত-চিত্ত ছিলেন যে বলা যায়, সঙ্গীত তাঁর দ্বিতীয় সত্তা হয়ে তাঁর মন অধিকার করে রেখেছিল। কিন্তু সেকালের অনেক বাঙ্গালী গুণীর মতন শৌখিন অর্থাৎ অপেশাদার ছিলেন বলে এবং কর্মসূত্রে দিনের অধিকাংশ সময় নিযুক্ত থাকা, স্থানান্তর ইত্যাদি কারণে সঙ্গীতচর্চার অবকাশ অন্যান্য কলাবতদের মতন পেতেন না তিনি। তাই অনেকের মতন শিষ্য গঠন করবারও তাঁর সুযোগ হয় নি। নচেৎ তাঁর সঙ্গীত-সম্পদের উত্তরাধিকারীরা তাঁর সঙ্গীতজীবনকে আর একদিক থেকে সার্থক ও স্মরণীয় রাখতে পারত সেই সুরধারার ধারক ও বাহক হয়ে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে যে, সুরের রাজ্যে নানা প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষাকারী এবং অনুপম মাধুর্যমণ্ডিত কণ্ঠ-সম্পদের অধিকারী দিলীপকুমার

রায় প্রথম জীবনে কিছুকাল নানা গুণীদের (রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির) কাছে রাগসঙ্গীত শিক্ষার সময়ে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের কাছেও কিছু কিছু শেখেন। শোনেন অনেক বেশি। দিলীপকুমারের সেই প্রথম জীবনের রেকর্ড করা বিখ্যাত গানটি 'মুঠো মুঠো রাঙ্গা জবা কে দিল তোর পায়' তিনি সুরেন্দ্রনাথের কাছে পেয়েছিলেন। তবে টপ্‌খেয়ালের ধরনের এই গানখানি দিলীপকুমার হয়তো সুরেন্দ্রনাথের ঢঙে পুরো গান নি, অনেকখানি নিজের মতন করে গেয়েছেন। তিনি সুরেন্দ্রনাথের আত্মীয় ও স্নেহের পাত্র থাকায় মজুমদার মহাশয়ের অনেক গান অনেকদিন ধরে শোনবার সুযোগ পান এবং সেই সব গানের স্মৃতি উচ্ছ্বাসের সঙ্গে লিখেছেন তাঁর "স্মৃতিচারণ" গ্রন্থে।

দিলীপকুমারের পিতা, কবি সুরকার ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সুরেন্দ্রনাথের প্রায় সমবয়সী (এক বছরের বয়োকনিষ্ঠ) এবং সুহৃদ ছিলেন। আত্মীয়তা সূত্রে তাঁরা পরস্পর পরিচিত হন কিশোর বয়স থেকে। দ্বিজেন্দ্রলালের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হরেন্দ্রলাল হলেন সুরেন্দ্রনাথের ভগিনীপতি। উপরন্তু দুজনেই অল্প বয়স থেকে সঙ্গীতে আকৃষ্ট থাকায় সুরেন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে অন্তরের যোগ নিবিড় হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল খুব কম বয়সেই নিজের সুরে সঙ্গীত রচনা আরম্ভ করেছিলেন স্বভাবের প্রেরণায় এবং পিতার (দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র, সেকালের খেয়াল-গায়ক, তাঁর স্বরচিত গানের সংকলন 'গীতমঞ্জরী' ১৮৭৪ খৃঃ প্রকাশিত) দৃষ্টান্তেও। দিলীপকুমারের মতে, দ্বিজেন্দ্রলালের ১২ বছর বয়সে রচিত প্রথম গান হল, 'গগন-ভূষণ তুমি জনগণ মনোহারী'। সেই থেকে যে সঙ্গীত-রচনা পর্বের সূচনা, পরবর্তী জীবনে সে সৃষ্টির ধারা তাঁর মহান স্বকীয় ঐশ্বর্যে পুষ্পিত হয়েছিল। তাঁর অনেক গান টপ্‌খেয়াল ও খেয়াল অঙ্গে গঠিত এবং সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গীতচর্চা থেকে তিনি কিছু পরিমাণে উপকৃত ছিলেন তাঁর স্বরচিত গানের সুর সংযোজনার ক্ষেত্রে। দ্বিজেন্দ্রলাল ও সুরেন্দ্রনাথ অনেক সময় একত্র সঙ্গীত প্রসঙ্গ করায় তাঁর সঙ্গীত জীবনে সুরেন্দ্রনাথের প্রভাব অসম্ভব নয়। সুরেন্দ্রনাথ রীতিমত সাধনার ফলে সঙ্গীতের পদ্ধতি বিষয়ে কৃতবিদ্য ও ব্যুৎপন্ন ছিলেন, একথা বলা বাহুল্য।

আগে উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলা গানের মধ্যে কীর্তন সুরেন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয় ছিল। কীর্তন গান তিনি অনেক সময় গাইতেন ঘরোয়া আসরে। রবীন্দ্রনাথ একবার ভাগলপুরে এলে তাঁকে সুরেন্দ্রনাথের গান শোনাবার ব্যবস্থা হয় এবং তখন রবীন্দ্রনাথকে তিনি দুখানি রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুনিয়েছিলেন :

'আমার পরাণ যাহা চায় তুমি তাই তুমি তাই গো' ও কীর্তনাঙ্গের 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই চিরদিন কেন পাই না।'

রবীন্দ্রনাথকে সুরেন্দ্রনাথের অন্য একদিন গান শোনাবার বিবরণ পাওয়া যায়, তবে এ আসরে তাঁর রাগসঙ্গীত গাইবার পরে এটি সঙ্গীতের এক কৌতুককর দৃষ্টান্ত। এ ধরনের সঙ্গীতানুষ্ঠান সচরাচর শোনা যায় না। আগাগোড়া একটি গান স্বেচ্ছায় বেসুরে গাওয়া। ব্যাপারটি যতই কৌতুকের হোক, অতিশয় কঠিন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কোন সুরলেশহীন ব্যক্তির কোন গান সুরে যথাযথ গাওয়া যত শক্ত, তার চেয়েও অনেক কঠিন ব্যাপার সুরজ্ঞ গায়কের পক্ষে একটি গান আদ্যোপান্ত বেসুরে গেয়ে শোনানো। এবং সুরেন্দ্রনাথ সেদিন তা-ই সম্ভব করেছিলেন। এই অনন্য কৌতুকসৃষ্টি হয়েছিল—ভাগলপুরে নয়—কলকাতায়। হাস্যরসিক নলিনীকান্ত সরকার তাঁর "শ্রদ্ধাস্পদেষু" পুস্তকে (১৫ পৃষ্ঠায়) সে ঘটনার মনোগ্রাহী বিবৃতি এইভাবে দিয়েছেন ঃ

"কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর আরপুলি লেনের বাড়িতে ওস্তাদী গানের আসর। গায়ক হচ্ছেন ভাগলপুর প্রবাসী সাহিত্যিক ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। সুরেনবাবু সেকালের একজন প্রথম শ্রেণীর গাইয়ে ছিলেন। খেয়াল ও টপ্‌খেয়ালে তদানীন্তন গায়ক সমাজে তাঁর একটি বিশেষ স্থান ছিল। যতীন্দ্রমোহনের বাড়ির এই আসরে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন বিশিষ্ট শ্রোতা।

সুরেন্দ্রনাথ প্রাণ খুলে গাইছেন, রবীন্দ্রনাথ শুনছেন মুগ্ধ বিষয়ে। গান শেষ হলে একজন শ্রোতা সুরেন্দ্রনাথকে বলে বসলেন—

"কেদারের গানটি একবার গাইবেন ?"

সুরেনবাবু নিতান্ত লজ্জিত হয়ে বললেন, "না, না, ওসব গান এখানে কেন ?"

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি পড়েছে সঙ্কটাপন্ন সুরেনবাবুর ওপর। তিনি প্রশ্নকারীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্যাপার কি ? কেদারা রাগিণী গাইতে বলছো নাকি ?"

"আজ্ঞে কেদারা রাগিণী নয়—কেদারের গান।"

সাগ্রহে কবি জিজ্ঞেস করলেন—"কেদার কে ?"

সুরেনবাবুর দিকে চেয়ে কবি বললেন—"কেদার কে মশায় ?"

সুরেনবাবু বিব্রত বোধ বললেন। বলছেন, "ওসব বাজে কথা কেন শুনছেন ?"

যিনি প্রশ্নটি করেছিলেন, তিনি উৎসাহভরে বলতে লাগলেন, "সুরেনবাবুর কেদারের গান এক অপূর্ব উপভোগের বস্তু। হাসতে হাসতে দম বন্ধ হয়ে যায়।"

কবিও উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, "তবে তো শুনতেই হবে।"

সুরেনবাবু কবিকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, "সেটা গানই নয়—একটা ক্যারিকেচার মাত্র। ওসব ছেলেমানুষদের আসরেই মানায়। আপনার ভালো লাগবে কেন?"

কবি কিছুতেই ছাড়লেন না, সুরেনবাবুকে শেষ পর্যন্ত গাইতেই হল কেদারের গান।

কেদারের গান সত্যই একটি বিস্ময়ের বস্তু। কেদার নামে একজন গাইয়ের গান। কেদারের কণ্ঠে সুর বলে কিছু নেই। এ-হেন কেদারের আস্থায়ী অন্তরা সমন্বিত পুরো একটা গানের অনুকরণ করলেন সুরেনবাবু। অমন সুরেলা কণ্ঠ যে কি করে অমন বেসুরো হয়ে পড়ল—ভাবতে পারা যায় না। সমস্ত গানেরই প্রত্যেকটি পর্দা বেসুরো।

রবীন্দ্রনাথের এরূপ উচ্ছ্বসিত হাসি আর কখনো দেখি নি।"

মজুমদার মহাশয়ের আর একটি আসরের ঘটনা উল্লেখ করে তাঁর গানের প্রসঙ্গ শেষ করা হবে। এটি অবশ্যই কোন কৌতুকাবহ সঙ্গীত নয়। কীর্তন গান। করুণ ভাবাত্মক কীর্তন। কিন্তু সে গানের সমাপ্তিতে একটি কৌতুকের আবহ সৃষ্টি হয়েছিল। গায়কের গানের জন্য নয়, এক স্মরণীয় শ্রোতার মন্তব্যের ফলে। সেই শ্রোতা হলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস।

চিত্তরঞ্জন তখনো প্রথিতযশা ব্যারিস্টার রূপে সুপরিচিত, জাতীয় আন্দোলনে সাক্ষাৎভাবে যোগ দেন নি। 'গান্ধীজীর অপূর্ব অভিজ্ঞাতা'য় প্রমথনাথের সঙ্গীতজীবনের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, চিত্তরঞ্জন সেযুগে জাতীয় সাংস্কৃতির সব বিভাগে কেমন অনুরক্ত ছিলেন। ভারতীয় সঙ্গীতও ছিল তাঁর অতি প্রিয়। তেমনি বাংলার কীর্তন ছিল তাঁর প্রাণের আরাম। কারণ কবি চিত্তরঞ্জনের ভাবপ্রবণ মন ছিল বৈষ্ণবীয় ভাবধারায় নিষিক্ত। বহিরঙ্গে রাজসিক ও ভোগবিলাসী হলেও অন্তরে তিনি সাত্বিক প্রকৃতির ছিলেন। সমস্ত ঐশ্বর্যের আড়ম্বরের অন্তরালে তাঁর প্রাণের নিভৃতে বাজত এক বৈরাগীর একতারা। নচেৎ উত্তর জীবনে অমন সর্বস্ব ত্যাগ করে কখনোই দেশবন্ধু হতে পারতেন না।

এ প্রসঙ্গ অবশ্য তাঁর দেশবন্ধু হবার আগেকার কথা। কিন্তু কীর্তন গান যে তাঁর প্রাণের জিনিস একথা তখনো তাঁর পরিচিত লোকের অজানা ছিল না।

তাই সেবার লছমীপুর মামলা উপলক্ষে তিনি যখন ভাগলপুরে এলেন, তাঁকে কীর্তন শোনাবার কথা হল, আপ্যায়ন করবার জন্যে। সুরেন্দ্রনাথ তখন ভাগলপুরে ছিলেন, তাঁকে গাইবার জন্যে অনুরোধ জানালেন চিত্তরঞ্জনের কয়েকজন অনুরাগী। সুরেন্দ্রনাথ নিজেও কীর্তন গান গাইতে ভালবাসতেন, তাই সে আসরে শুধু তাঁর কীর্তনই হল।

আসর অবশ্য ঘরোয়া, সাধারণের জন্যে নয়। কয়েকজন মাত্র বিশেষ পরিচিত ও বন্ধুবান্ধব সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্রের সম্পর্কে মাতুল এবং উত্তরজীবনে খ্যাতিমান সাহিত্যিক, বিখ্যাত 'বিচিত্রা' মাসিকপত্রের সম্পাদক। এই ঘটনার সময়ে সাহিত্যিকরূপে তিনি সুপরিচিত হন নি, যদিও সাহিত্যচর্চা আরম্ভ করেছিলেন প্রায় কিশোর বয়স থেকে, শরৎচন্দ্রের আদর্শে এবং ভাগলপুরে আরো কয়েকজন সমবয়সী আত্মীয় ও বন্ধুদের সঙ্গে। তাঁর তখনকার সাহিত্যচর্চা শখের অবসর যাপন। তখন তাঁর পরিচয় ভাগলপুর আদালতের উকিলরূপে। চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগও উকিল হিসেবে ঘটে। যে লছমীপুর মোকদ্দমার দুর্ধর্ষ ব্যারিস্টাররূপে চিত্তরঞ্জন ভাগলপুরে এসেছিলেন, সেই মামলায় উপেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর জুনিয়র।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, উপেন্দ্রনাথ একজন সঙ্গীতজ্ঞও ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গান এবং বাংলা অন্যান্য গান বেশ গাইতেন, নিজে কয়েকটি গান রচনাও করেছিলেন নানা রাগে। রাগসঙ্গীতে তাঁর জ্ঞান ছিল, স্বরচিত নানা বাংলা গান বৃদ্ধ বয়সেও গেয়ে শোনাতে পারতেন। পিয়ানোতেও তাঁর হাত ছিল।

সেদিনকার সুরেন্দ্রনাথের আসরের উপেন্দ্রনাথও ছিলেন একজন উদ্‌যোক্তা।

যা হোক, চিত্তরঞ্জনের অভ্যর্থনার জন্যে আয়োজিত সেই আসরে সুরেন্দ্রনাথ সুরেলা কণ্ঠে কীর্তন গাইলেন। চিত্তরঞ্জন একাগ্রচিত্তে তাঁর গান শুনছিলেন। গান শেষ হতে সুরেন্দ্রনাথের দিকে চেয়ে চিত্তরঞ্জন বলে উঠলেন, এ যে মোগলাই কেত্তন।'

তাঁর এই অনন্য মন্তব্যের টীকা উপেন্দ্রনাথ এইভাবে করেন: সেদিন সুরেন্দ্রনাথের কেত্তন, গান হিসেবে খুবই ভাল হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি তো আসলে টপ্পা ধরনের গাইয়ে ছিলেন, তাই টপ্পা দানায় কিংবা টপ্‌খেয়ালের মতন তানে তাঁর গান ভরে থাকত। তিনি সেদিন যে কীর্তন গাইলেন তার মধ্যেও মাঝে মাঝে টপ্পার দানা আর টানটোন্ ফুটে

উঠতে লাগল। আর সি. আর. দাস ছিলেন খাঁটি কীর্তনের ভক্ত। তাই তিনি ওইরকম মন্তব্য করেন, যেন সাত্ত্বিক আহারের সঙ্গে মোগলাই খানা, খাঁটি বাংলার জিনিসের সঙ্গে পশ্চিমী ঢঙ্ মিশে গেছে। 'মোগলাই কেত্তন' এই রসিকতার কথাটি বলে তিনি বোধ হয় তাই বোঝাতে চেয়েছিলেন।

তাল লয়ের গোলক ধাঁধাঁয়

পটলডাঙার নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় একজন জনপ্রিয় পাখোয়াজী ছিলেন। বনেদী ঘরের গৌরবর্ণ, সুপুরুষ বনেদী চেহারা। সুশ্রী মুখচোখ, হাসিখুশিতে উজ্জ্বল। নগেন্দ্রনাথ যে আসরে উপস্থিত হতেন, তা তাঁর সুরসিক ও মধুর স্বভাবের জন্যে জীবন্ত, দীপ্ত হয়ে থাকত। এবং তিনি হয়ে উঠতেন সেখানকার প্রধান আকর্ষণের বস্তু। যেমন সদানন্দ, তেমনি রসোচ্ছল, হাস্যপ্রিয় মজলিসী মানুষ ছিলেন! যেমন রসালাপে সকলকে আমোদ দিতে পারতেন, তেমনি মজা করে জমিয়ে সঙ্গত করতেন আর মাতিয়ে দিতেন আসর। হাতটি বড় মিষ্টি ছিল আর ধা মারতেন অতি চমৎকার। খুব কম পাখোয়াজীই এমন সরস সঙ্গতে সঙ্গীতকে প্রাণবন্ত করে তুলতে পারতেন। গানকে কি করে জমাটি করতে আর আসর মাৎ করতে হয়, সেই কলানিপুণতা তাঁর সহজাত ছিল।

নগেন্দ্রনাথ সঙ্গত-যন্ত্র বাজাতেন নিতান্ত বালক বয়স থেকে। তবে আগে বাজাতেন ঢোল, পাখোয়াজ নয়। প্রায় শুনে শুনেই বাজাতে শেখেন, বলা যায়। তখন তাঁর ওস্তাদ কেউ ছিলেন না (বড় হয়েও যে ওস্তাদের কাছে খুব শিখেছিলেন, তাও নয়)। সেই কম বয়সেই বাড়ির কাছাকাছি এখানে সেখানে বাজাতেন আর তখন থেকেই ঢোল বাজনায় তাঁর নামও হয়েছিল বেশ। এতটুকু একটি ছেলে এমন চমৎকার বাজাচ্ছে দেখে শ্রোতারা অবাক্ হয়ে যেত। এমন সুন্দর মিলিয়ে সঙ্গত, এমন ছন্দের কাজ এই ছেলেবয়সে বাস্তবিক দেখা যায় না। তাই যারা শুনত, তারাই বাহবা দিত।

একদিন তো এক আসরে খুবই হৈ চৈ পড়ে যায়। নগেন্দ্রনাথের তখন আট-ন বছর বয়স। হাফ আখড়াই-এর এক বড় আসর বসেছিল। সেই জমজমাট হাফ আখড়াই গানের সঙ্গে সঙ্গত করলে অতটুকু ছেলে। আর তাও কি অদ্ভুত বাজনা! বালকের ঢোলের তালে তালে গান আরও জমে উঠল। সঙ্গীতে এমন একটা উন্মাদনার সৃষ্টি হল যে, শ্রোতাদের মধ্যে ধন্য ধন্য রব পড়ে

গেল। ক্ষুদে বাজিয়েটির গলায় অনেকে ফুলের মালা পরিয়ে দিতে লাগল এসে। দেখতে দেখতে তাকে এত মালা পরানো হল যে, মাথাটি ছাড়া তার শরীরের আর কিছু দেখা গেল না। মালায় ঢেকে গিয়ে বসে বাজাতে লাগল সেই বালক-প্রতিভা।

বড় হয়ে নগেন্দ্রনাথ ঢোল ছেড়ে পাখোয়াজ ধরলেন। পাখোয়াজেও তেমনি মিষ্টি হাত, তেমনি সঙ্গতের মাধুর্য দেখা যেতে লাগল ক্রমে ক্রমে। পাখোয়াজ-বাজিয়ে বলে ধ্রুপদের আসরে তাঁর নাম হতে খুব বেশি সময় লাগল না। তাঁর সেই মিষ্টি হাতের বোলে আর অপূর্ব ধা মেরে কতদিন কত আসর যে মাৎ করেছেন তিনি। ছন্দ-জ্ঞান তাঁর বড স্নুন্দর ছিল। গানের ছন্দকে নিজের সহজ সঙ্গত-বুদ্ধির প্রেরণায় মনোমুগ্ধকর করে ফুটিয়ে তুলতেন আর সঙ্গীতে সত্যিকার রসসঞ্চার হত। সঙ্গতকার হিসেবে তিনি ছিলেন স্বভাবশিল্পী।

কারণ তাঁর নৈপুণ্যের প্রায় সবটাই ছিল অশিক্ষিত-পটুত্ব। দিল্ খোলা ঢিলে ঢালা মানুষ তিনি। কঠিন সাধনায় অজস্র বোল তেহাই আয়ত্ত করা, লয়কারীর অতি জটিল, কুটিল কৌশল আর নানা প্যাঁচের অন্ধি-সন্ধির সন্ধান রাখা তাঁর ধাতে ছিল না। তালের অতিরিক্ত কচ্ কচির সঙ্গে তিনি খাপ খাওয়াতে পারতেন না নিজেকে। তাঁর নিজের স্বভাব যেমন সরল, প্রাণঢালা আর ঈষৎ রঙিন, সঙ্গীতকেও তিনি সেই চোখে দেখতে ভালবাসতেন এবং সেইভাবে অনুষ্ঠিত হলেই নিজের শ্রেষ্ঠ জিনিস দিতে পারতেন। পরম উপভোগ্য করে তুলতেন আসর।

নগেন্দ্রনাথের সঙ্গতের বিষয়ে এক কথায় বলতে গেলে বলা যায়, গানটা যদি অতিরিক্ত রকমের কুট লয়কারীর ব্যাপার না হয়ে একটু সাদামাটা হত, বেশি ঢিমে লয়ের কিংবা প্যাঁচের না হত, তা হলে তিনি পাখোয়াজের সঙ্গতে ফুল ফোটাতে পারতেন। আসরে সুরধুনী বইয়ে দিতেন ছন্দের নির্ঝরে। অশিক্ষিত-পটু হলেও তিনি ছিলেন যথার্থ সঙ্গত-শিল্পী।

বছরের পর বছর পদ্ধতিগত ভাবে নিয়মনিষ্ঠ শিক্ষা করার স্বভাব তাঁর ছিল না। তেমনভাবে কোন ওস্তাদের অধীনে দীর্ঘকাল ধরে তালিমও নেন নি তিনি। প্রথম যৌবনে দেশের এক শ্রেষ্ঠ পাখোয়াজ-গুণী কেশবচন্দ্র মিত্রের কাছে প্রায় বছরখানেক মাত্র যা শিখেছিলেন। কিন্তু ওই পর্যন্ত। অত খেটেখুটে অজস্র বোল রপ্ত করা তাঁর আর বেশিদিন পোষাল না। নিজের সহজ শিল্প-বুদ্ধি ও ছন্দজ্ঞান দিয়ে গানকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে দিতেন। তাঁর চেয়ে কম-

বয়সী গাইয়েদের বলতেন (আর লক্ষ্মীনারায়ণ বাবাজী বা রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর মতন কয়েকজন মাত্র ছাড়া আর সব বাঙ্গালী ধ্রুপদীরাই ছিলেন তাঁর বয়োকনিষ্ঠ। সুতরাং আন্তরিক স্নেহের অধিকারে প্রথম পুরুষে সম্বোধনের পাত্র)—'ওরে, বেশি প্যাঁচ কষিস নি বাবা, সুরের কাজ কর্। দেখ্ না, তোর গানে ফুল ফুটিয়ে দিচ্ছি।' এ তাঁর অহঙ্কারের কথা নয়—সরল শিল্পী-মনের প্রকাশ। সত্যিই তাঁর মিষ্টি হাতে ছন্দের ফুল ফুটত। পাখোয়াজ যেন মুখ ফুটে কথা কইত।

কিন্তু মসৃণ পথে সুরসৃষ্টি সব সময়ে সব আসরে হত না। সঙ্গীত পরিবেশন করবে তো মানুষ, মানুষের মন, যার মতিগতি জটিল কুটিল হয়ে পড়ে অনেক সময় অনেক কারণে। কোন্ গায়ক মেজাজ বিগড়ে ফেলে, কেউ ইচ্ছে করেই কালোয়াতী ফলাবার জন্যে, কেউ বা ক্রুদ্ধ হয়ে তাল লয়ের অতি কূট গ্রন্থিতে সঙ্গতকারের হাত বেঁধে ফেলবার চেষ্টা করেন। ধ্রুপদ সঙ্গীতে তালের ব্যাকরণ এত জটিল, তার লয়কারীতে এমন ঘনঘটা সৃজন করা যায় যে, তালাধ্যায়ে অতিশয় বিচক্ষণ না হলে বিভ্রম তাঁর ঘটবেই। বিশেষ নগেন্দ্রনাথের মতন পাখোয়াজীর, যিনি তালের আঙ্কিক প্রক্রিয়াকে অতি ভীতির চক্ষে দেখতেন। তাই সুরের আসরে তাঁকে কয়েকবার পড়তে হয়েছিল তালের চক্রান্তে। তার ক'টি ঘটনা এখানে বলা হবে।

প্রথমে লক্ষ্মীনারায়ণ বাবাজীর আসরের কথা। সেকালে লক্ষ্মীনারায়ণ ছিলেন বাংলার এক প্রবীণ গুণী, নগেন্দ্রনাথের চেয়ে প্রায় ত্রিশ বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ। লক্ষ্মীনারায়ণের বহুমুখী সঙ্গীতপ্রতিভার কথা; তাঁর একাধারে ধ্রুপদ, খেয়াল ও ঠুংরি গান গাওয়া এবং পাখোয়াজ, তবলা বাজাবার কথা; তা ছাড়া সেতার, বীণা ও এস্‌রাজ যন্ত্রেও তাঁর হাত থাকা ইত্যাদি প্রসঙ্গ 'গুনের গুণ সবাই গায় না' অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে একথাও বলা হয়েছিল যে, সাধারণত আসরে তিনি সুপরিচিত ছিলেন গায়করূপে, বিশেষ ধ্রুপদী বলে। পাখোয়াজী এবং তবলাবাদক হওয়ায় তিনি অসাধারণ লয়দার ছিলেন। তিনি প্রায় সন্ন্যাসীর মত জীবনযাপন করতেন, সঙ্গীতকে একান্ত সাধনার বস্তু করে। পোশাকও ছিল কাপড়ের ওপর একটি আলখাল্লা আর কাঁধে ঝোলা। তাই 'বাবাজী' উপাধিতেই তিনি আসরে সুপরিচিত ছিলেন।

তাঁর এই পরিচয় নিয়ে পরিহাস করতে গিয়েই একদিন নগেন্দ্রনাথ বিভ্রাট বাধিয়েছিলেন আসরে।

সেদিন বিশেষ করে লক্ষ্মীনারায়ণেরই গানের এক আসর বসেছে। নগেন্দ্র-

নাথ পাখোয়াজ বাজাতে এসেছেন তাঁর সঙ্গে। বাবাজী তানপুরা বেঁধেছেন, মুখুজ্যে মশায়ও পাখোয়াজ মিলিয়ে নিয়েছেন। গান আরম্ভ হতে আর দেরি নেই। এমন সময় নগেন্দ্রনাথ লক্ষ্মীনারায়ণের উদ্দেশে বললেন—যেমন মজা করে তাঁর কথা বলার ধরন ছিল—'বাবাজী, ঝুলি থেকে ধামার-টামার এবার বার করুন।'

তাঁর কথার ভঙ্গিতে শ্রোতাদের মধ্যে অনেকে হেসে ফেললেন। কিন্তু লক্ষ্মীনারায়ণ গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং চটলেন মনে মনে। নগেন্দ্রনাথ কিন্তু কিছু ভেবে ও-কথা বলেন নি। ফস্ করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। মুখের তেমন আক্ঢাক ছিল না, যখন-তখন ফুটে বেরুত তাঁর নিজস্ব ধাঁচের রসিকতা। এখানেও তেমনি করে ফেললেন।

লক্ষ্মীনারায়ণ কিন্তু মুখের কথায় বিরক্তি বা বিরূপতা আদৌ প্রকাশ করলেন না। নগেন্দ্রনাথের দিকে ফিরে শুধু বললেন, 'আগে চৌতাল বাজাও একটু।'

বলে তানপুরার গুঞ্জনের সঙ্গে গান আরম্ভ করলেন, এবং ধরলেন একটি অত্যন্ত কড়া চালের চৌতাল, আড়ানা রাগে। গানের প্রথম কথা হল : 'কুণ্ডল ডালন…'

গানখানি তিনি এমন ঠাস লয়ে গাইতে লাগলেন যে, নগেন্দ্রনাথ একেবারেই সুবিধে করে উঠতে পারলেন না। এমন চালে লক্ষ্মীনারায়ণ গেয়ে চললেন যে, নগেন্দ্রনাথ একেবারেই হাত খুলে বাজাতে পারলেন না। একটি ধা-ও তিনি যুৎসই করে মারতে পারলেন না খানিকক্ষণের মধ্যেও।

এই আসরের কথা নগেন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে নিজেই হাসতে হাসতে গল্প করতেন। সেদিন লক্ষ্মীনারায়ণের লয়কারী আর নিজের দিগদারীর কথা এইভাবে বলতেন, 'উঃ, সে কি বিপদেই পড়েছিলুম রে। বাবাজী এক-এক বার 'কুণ্ডল ডালন' বলে আস্থায়ীটি গেয়ে চলেছেন, আর আমার মাথার ভেতরে সব কুণ্ডলী পাকিয়ে যাচ্ছে। কোথায় সম্ কোথায় ফাঁক কিছুই ধরতে পারছি না। বাজাব কি? সাধারণ লোককে দেখাবার জন্যে কোনরকম করে শুধু হাত নেড়ে যাচ্ছি। সম্ ফাঁক সব কুণ্ডলী পাকিয়ে গেছে। শেষে বাবাজী নিজে থেকেই দেখিয়ে দিলেন, তখন বাজিয়ে বাঁচি।'

আর একদিন নগেন্দ্রনাথ নাকাল হয়েছিলেন রাধিকাপ্রসাদের হাতে। সেটি ইউনিভারসিটি ইন্স্টিটিউটের একটি জলসা। সেখানে বাজাবার কয়েকদিন আগে তিনি গোসাঁইজীর সম্পর্কে একটা বেফাঁস কথা বলে ফেলেছিলেন, আর কথাটি একজন আবার গিয়ে লাগিয়েছিল গোসাঁইজীর কানে। নগেন্দ্রনাথের

কিন্তু সেকথা আর মনে ছিল না। কখন কি কথা রসিকতা করে বলে ফেলেন, সে-সব অতশত তাঁর মনে থাকত না। তাই যথারীতি খোলা মন নিয়ে সেদিন গোসাঁইজীর গানের সঙ্গে সঙ্গত করতে এসেছিলেন ইন্স্টিটিউটে। কিন্তু রাধিকাপ্রসাদের কথাটি মনে ছিল, কারণ তাঁর অভিমানী মন ক্ষুণ্ণ হয়েছিল কথাটি শুনে। তাই তিনি মনের ক্ষোভ সাঙ্গীতিক পদ্ধতিতে মেটাতে চাইলেন। শান্তিপ্রিয় ধাতের মানুষ হলেও অপমানিত বোধ করলে ভুলতে পারতেন না তিনি।

নগেন্দ্রনাথের দুর্বলতার স্থান তিনি জানতেন। সুতরাং সেই পথ নিলেন। গান এমন চালে কষে ধরলেন যে, পাখোয়াজী পড়লেন বেকায়দায়। হাত খুলে বাজাবার কোন রাস্তা নগেন্দ্রনাথ পেলেন না। কি যেন এক দুর্বোধ্য আঙ্কিক হিসেবে তাঁর সব গোলমাল হয়ে যেতে লাগল। এমন করে বাজনা হবে কি করে? বুঝলেন, গোসাঁইজী বড়ই চটেছেন, তাঁর দিকে একবারও মুখ ফেরাচ্ছেন না। তাঁকে অপ্রস্তুত করাই ইচ্ছে।

আসরে নগেন্দ্রনাথের কাছেই আরও কয়েকজন ধ্রুপদী বসে ছিলেন—রাধিকাপ্রসাদেরই শিষ্য তাঁরা, ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ললিতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

নগেন্দ্রনাথ পাখোয়াজ বাজাতে বাজাতেই চট্ করে তাঁদের এক একজনকে জিজ্ঞেস করে নিলেন, 'ওরে, বুঝছিস্ কিছু? বলে দে না রে।'

কিন্তু তাঁরাও কেউই তাঁকে সাহায্য করতে পারলেন না।

অগত্যা তিনি নিরুপায় হয়ে স্বয়ং গোসাঁইজীকেই সম্বোধন করলেন (বাজাতে বাজাতেই), 'প্রভু, মুখ একবার এদিকে ফেরান।'

গোসাঁইজী নিরুত্তর এবং মুখও যথাপূর্বম্ অন্যদিকেই ঘুরিয়ে রইলেন।

নগেন্দ্রনাথ আবার অনুনয় জানালেন, 'প্রভু, শুনছেন?'

এবার রাগতভাবে জবাব এল, 'কি?'

নগেন্দ্রনাথ তেমনি সুরে বললেন, 'একটু দেখিয়ে দিন প্রভু। এ বয়েসে আর সভার মধ্যে বেইজ্জত করবেন না। দোহাই আপনার।'

গানের এক ফাঁকে গোসাঁইজী এবার জানালেন, 'আমি কি জানি যে বলব? আমি তো বিষ্টুপুরী লুচিভাজা বামুন।'

এতক্ষণে নগেন্দ্রনাথ বুঝতে পারলেন গোসাঁইজীর রাগের কারণটা। তাঁকে কি তিনি এই কথা বলেছিলেন কোনদিন? হতেও পারে হয়তো, এখন মনে পড়ছে না।

'আর কখনো এমন কথা হবে না, প্রভু। এ যাত্রা বাঁচান।'

শেষ পর্যন্ত গোসাঁইজীর রাগ ঠাণ্ডা হল এবং তিনি কুজ্ঝটিকা জাল মুক্ত করে নগেন্দ্রনাথকে স্বচ্ছন্দে বাজাতে দিলেন।

আর একটি আসর হয়েছিল গড়পারে। ওখানকার নিবারণচন্দ্র দত্তের পুত্র সুশীলচন্দ্র দত্ত (ইনি শৌখিন পাখোয়াজী) এই আসরের একজন প্রধান উদ্‌যোক্তা ছিলেন। সুকণ্ঠ ধ্রুপদী ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানের সঙ্গে নগেন্দ্রনাথের সঙ্গত হয় আসরে। এই জলসার কোন কোন উদ্‌যোক্তা নাকি নগেন্দ্রনাথের ওপরে তখন বিরূপ হয়েছিলেন এবং তাঁকে একটু অপদস্থ করতে চান। ভূতনাথবাবুকে নাকি তাঁরা রাজী করিয়েছিলেন অনুরোধ-উপরোধ করে। সে আসরে ধ্রুপদী গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পাখোয়াজী দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ উপস্থিত ছিলেন।

ভূতনাথবাবু গান ধরলেন আড়া চৌতালে, অত্যন্ত ঢিমা লয়ে। আড়া চৌতাল একটু লয় বাড়িয়ে না ধরলে পাখোয়াজীর পক্ষে ভাল করে হাত খুলে বাজানো বড়ই কঠিন হয়। এত ঢিমা লয়ে আড়া চৌতাল আরম্ভ হতে দেখে নগেন্দ্রনাথ প্রমাদ গণলেন। এই লয়ে হাতের সুখ করে বাজানো দূরের কথা, ঠেকা দিয়ে যাওয়াও দুর্ঘট হবে তাঁর পক্ষে। চট্ করে ব্যাপারটি হৃদয়ঙ্গম করে নিয়ে এই নিছক কালোয়াতী প্রচেষ্টাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে চাইলেন, ঠাট্টা তামাশা দিয়ে।

পাখোয়াজ থেকে দু'হাত নাটকীয় ভাবে ওপর দিকে তুলে গানরত ভূতনাথবাবুকে (নগেন্দ্রনাথের চেয়ে প্রায় ২৫ বছরের ছোট) বলে উঠলেন, 'ওরে ভূতো, তুই ডাক্তার। আমায় এমন করে সভার মধ্যে মারিস নি।'

তাঁর কথা শুনে ভূতনাথবাবু হেসে ফেললেন, শ্রোতারাও হেসে উঠলেন। আসরের গুরুগম্ভীর, অ-সরস আবহ নগেন্দ্রনাথের এই কথায় তরল হয়ে গেল।

তখন ভূতনাথবাবু হাসিমুখে লয় একটু বাড়িয়ে নিয়ে গানখানি নতুন করে ধরলেন আর নগেন্দ্রনাথ প্রেমের সঙ্গে বাজাতে লাগলেন। আসর সঞ্জীবিত হয়ে উঠল এবার।

বাঁশীর সুরে পাখীর ঝাঁক

সুরশিল্পী আফ্‌তাবুদ্দিনের নাম এখন হয়তো অনেকে জানেন না। তাঁকে পরিচিত করতে হবে ওস্তাদ আলাউদ্দিনের অগ্রজ বলে। কিন্তু এমন একদিন ছিল, যখন কলকাতার সঙ্গীত-সমাজে দুজনের মধ্যে আফ্‌তাবুদ্দিনের নামই ছিল বেশি। কারণ, আলাউদ্দিন বাংলাদেশে বা কলকাতায় বিশেষ থাকতেন না। কলকাতায় প্রথম যৌবনে গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী, অমৃতলাল দত্ত (হাবু দত্ত) প্রভৃতির কাছে সঙ্গীতশিক্ষার জন্যে কিছুকাল থাকবার পর প্রথমে সঙ্গীত-শিক্ষার জন্যে রামপুরে, তার পর মাইহার দরবারে নিযুক্ত হয়ে সেখানে থাকেন— এইভাবে পশ্চিমাঞ্চলেই আলাউদ্দিন খাঁর অবস্থান ঘটত। কলকাতায় সেকালে অনেক সময় তাঁর পরিচয় ছিল আফ্‌তাবুদ্দিনের কনিষ্ঠ বলে। পরে অবশ্য তিনি স্বনামধন্য হয়েছিলেন।

আফ্‌তাবুদ্দিন ছিলেন বাংলার এক আপনভোলা জাত সঙ্গীতশিল্পী। সঙ্গীত বিষয়ে অনেক গুণ ছিল তাঁর। আর একটি পরিচয় ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলে—অনেক হিন্দু সংস্কারের সঙ্গে তিনি কালীভক্তও ছিলেন। সঙ্গীতের সেবক, অ-সাংসারিক মন-বুদ্ধি নিয়ে সরল ও খেয়ালী আফ্‌তাবুদ্দিন সংসারী হয়েও সাধুর মতনই বাস করে গেছেন সংসারে। তাই পরিচিত গোষ্ঠীতে তাঁর নাম ছিল—আফ্‌তাবুদ্দিন সাধু। সঙ্গীত জগতের চেয়ে অধ্যাত্ম জগতে তাঁর বিচরণ ছিল বেশি। নচেৎ সঙ্গীতকে যদি তিনি একান্তভাবে অবলম্বন করতেন, সঙ্গীত যদি হত তাঁর পেশা, তা হলে সঙ্গীতজ্ঞরূপে তাঁর পরিচয় আর নতুন করে দিতে হত না।

বাংলার এক প্রতিভাধর সঙ্গীত-গুণী ছিলেন তিনি, যদিও তাঁর নৈপুণ্যের অনেকখানি ছিল অশিক্ষিতপটুত্ব। সঙ্গীতের প্রতিভা তিনি জন্মসূত্রে লাভ করেছিলেন। পিতা সদু খাঁ ছিলেন সেতারবাদক, সংসারে উদাসী, সঙ্গীতসাধক। সেনী ঘরের বিখ্যাত রবাবী কাসিম আলী খাঁর কিছুদিনের ছাত্র সদু খাঁ। কাসিম আলী খাঁ ভাওয়াল দরবারে শেষ-জীবন যাপন করবার আগে যখন ত্রিপুরা দরবারে ছিলেন, তখন সদু খাঁ তাঁর কাছে কয়েকদিন শেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। তবে তা কাসিম আলীর বিদ্যার তুলনায় বিশেষ ধর্তব্য নয়। ওস্তাদ আলাউদ্দিন বলেন যে, তাঁর পিতা সদু খাঁর

কাছে দুটি মাত্র গৎ পেয়েছিলেন—ইমন ও ছায়ানট ; এবং আলাপচারী কিছু পান নি। সে যা হোক, সদু খাঁর বাড়ি ছিল ত্রিপুরা জেলার শিবপুর গ্রামে। সদু খাঁর সঙ্গীত-সাধনা তাঁর সন্তানদের মধ্যে বর্তেছিল। দ্বিতীয় আফ্তাবেরও সঙ্গীতে আসক্তি বালক বয়স থেকেই প্রকাশ পায়। পিতা তাই দেখে তার সঙ্গীত-শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন কুমিল্লা অঞ্চলের দুজন বাঙ্গালী ওস্তাদের কাছে, একসঙ্গে। রামধন শীল এবং রামকানাই শীলের কাছে আফ্তাব তখন বেহালা আর তবলা শিখতে আরম্ভ করেন। পরে সুরের নানা যন্ত্রে তাঁর ক্ষমতা প্রকাশ পায়। অনেক সময় তিনি দোতারা বাজাতেন। তাঁর সঙ্গীতজ্ঞ মহলে কদর ছিল বাঁশী ও ন্যাসতরঙ্গ বাদকরূপে। বিশেষ বাঁশীতে তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর শিল্পী ছিলেন, যদিও বাঁশীতে তিনি কোন তালিম পান নি। অতি কঠিন ন্যাসতরঙ্গ যন্ত্রেও তিনি ছিলেন পারদর্শী। একবার মিনার্ভা থিয়েটারের একটি জলসায় ন্যাসতরঙ্গ বাজিয়ে শ্রোতাদের তিনি চমৎকৃত করেছিলেন। গত শতকে কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টান্তের পরে আফ্তাবুদ্দিন ন্যাসতরঙ্গ বাদনে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এই যন্ত্রে সেযুগে আর একজন বাঙ্গালী গুণীর নাম ছিল, তিনি হলেন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সভায় নিযুক্ত গোপাল সিংহরায়।

আফ্তাবুদ্দিনের সঙ্গীতজীবনে সবচেয়ে প্রসিদ্ধি ছিল বাঁশীর জন্যে। বাঁশীতে তাঁর ফুঁ ছিল সুমিষ্ট। সেই মিষ্টি বাঁশীর সুরে শ্রোতাদের তিনি মনোহরণ করতেন। কথায় বলে, তেমন সুরে বাঁশী বাজাতে পারলে পশুপক্ষীও বশ হয়, মানুষ দূরের কথা। আফ্তাবুদ্দিন তার এক জাজ্বল্যমান নিদর্শন ছিলেন।

এখানে তাঁর একটি সেইরকম বাঁশী শোনাবার ঘটনা উল্লেখ করা হবে। তবে তা কোন সাজান আসরের রীতিমত সঙ্গীতানুষ্ঠান নয়। তেমনভাবে আগে থেকে বন্দোবস্ত করে আসর সাজিয়ে তাঁকে বেশি নিয়ে যাওয়া যেত না। কারণ নিয়মনিষ্ঠ শহুরে মানুষ ছিলেন না তিনি। খামখেয়ালী আর আত্মভোলা আফ্তাবুদ্দিন সাধু কখন কোথায় থাকেন, কখন কোথায় যান তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই—তাঁকে যাঁরা চিনতেন একথা তাঁদের ভালরকম জানা ছিল। তাই তাঁকে নিয়ে খুব বেশি জলসার আয়োজন করা যেত না। হাতের কাছে পাওয়া গেলেই তবে তাঁকে আসরে বসানো বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারতেন তাঁর অনুরাগীরা। ভবিষ্যতের জন্যে আসরের ব্যবস্থা করতে গেলেই তিনি অনিশ্চিত হয়ে পড়তেন। আর এইভাবে হঠাৎ-পাওয়া অবস্থাতেই তাঁর অনেক আসর হয়ে গেছে কলকাতায়।

এই ঘটনাটির জন্যেও কোন আসর বসাবার সুযোগ ঘটে নি। স্থান—ভবানীপুরের নাটোর-ভবন। মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের আমল। তিনি ছিলেন আফ্‌তাবুদ্দিনের একজন গুণগ্রাহী ও অনুরাগী। তাঁর সঙ্গীত-প্রেমের বাঁধনে আফ্‌তাবুদ্দিন মাঝে মাঝে বাঁধা পড়তেন। এখানকার জলসাঘরে তাই খাঁ সাহেবের অনেক আসর হয়ে গেছে। কলকাতার আর কোন আসরে তাঁকে এত বেশি দেখা গেছে কি না সন্দেহ।

সেদিন সকালবেলা। জগদিন্দ্রনাথ বাড়িতে ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ এসে পড়লেন আফ্‌তাবুদ্দিন। জগদিন্দ্রনাথ আনন্দিত হলেন তাঁকে পেয়ে। কিন্তু সুরশিল্পীকে কাছে পেয়ে কিছু না শুনে তো লাভ নেই। আফ্‌তাবুদ্দিনের আল্‌খাল্লার ঝোলায় দেখা গেল, বাঁশের বাঁশী।

'আজ তা হলে একটু বাঁশীই হোক খাঁ সাহেব। অন্য কিছুর তো এখন সুবিধে হবে না। একটু বাঁশী শোনান।'

খাঁ সাহেব ঝোলা থেকে বাঁশীটি বার করে ফুঁ দিলেন। আরম্ভ হল সুরের তরঙ্গ। স্বচ্ছন্দ সুমিষ্ট সুরবিহার। পাখীর মতন অনায়াসে সুরের লহরী ফুটতে লাগল বাঁশীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে। সেই সামান্য বাঁশের বাঁশী থেকে শিল্পী সুরের মায়াজাল রচনা করতে লাগলেন।

আবিষ্ট হয়ে শুনতে শুনতে আর একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখলেন জগদিন্দ্রনাথ।

বাঁশীর সেই অপরূপ সুরে আকৃষ্ট হয়ে ঘরের মধ্যে একটির পর একটি পাখী উড়ে আসতে লাগল। বাড়ির বাগানের গাছে গাছে আনাচ-কানাচে যে-সব পাখী ছিল, তারা।

শান্ত সকালে আফ্‌তাবুদ্দিনের সুরেলা বংশীধ্বনি ঘর ছাপিয়ে বাগানের হাওয়ায় ভাসতে থাকে। আর সেখানকার পাখীদের সবুজ রাজ্যে সাড়া পড়ে যায়। তারা টিক্ টিক্ করে মাথা দোলায়, এদিক-ওদিক অবাক্ হয়ে চায়। মুখ তুলে উৎকর্ণ হয়ে শোনে—বাঃ, বেশ তো, সুরটা যে চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। সুন্দর লাগছে। এ কোন্ পাখীর গান? কোন্ দিক থেকে আসছে? ওই বড় ঘরটার মধ্যে থেকে, না? দেখি ওখানে কে গান গাইছে।

সুরের হাওয়ায় উড়ে উড়ে এসে পাখীরা সেই ঘরের জানলা দিয়ে ভেতরে এসে বসতে লাগল জানলা-দরজার মাথায় মাথায়। আর এদিক্-ওদিক্ উঁচু জায়গায়, যে যেখানে পারলে। তার পর ঘাড় কাৎ করে মাথা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে

দেখতে লাগল, শুনতে লাগল আফ্‌তাবুদ্দিনের মুখের বাঁশীর দিকে চেয়ে।

ঝাঁকে ঝাঁকে ঘরে পাখী এসে বসে আফ্‌তাবুদ্দিনের বাঁশী শুনছে—এই দৃশ্যে জগদিন্দ্রনাথ চমৎকৃত হলেন। অদ্ভুত ব্যাপার বটে। পাখীর ঝাঁক একমনে বসে বসে বাঁশী শুনছে।

তার পর বাঁশী বাজানোও শেষ হল আর পাখীরাও এদিক্-ওদিক্ দেখে সব উড়ে গেল ফুর্ ফুর্ করে।

বসন্তের সেই গানটি

কোন কোন গুণীর বেশি প্রিয় থাকে একটি বা কয়েকটি রাগ। সেই সব রাগ তাঁরা গভীরভাবে সাধনা করেন, তাদের প্রগাঢ় রহস্য আর সৌন্দর্যের সন্ধান ও আস্বাদন করেন নিত্য নতুন করে। অন্তরঙ্গ অনুশীলনের ফলে রাগগুলির রূপ-বিস্তারে তাঁরা অনন্য অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হন। তখন বলা যায়, তিনি সেই রাগে সিদ্ধ। তাঁর মতন করে সেই রাগ যেন অনেকেই ফোটাতে পারেন না। সেই রাগ আর কারও গলায় বা বাজনায় বুঝি তেমনটি আর শোনা যায় না।

এমনিভাবে অনেক গুণীর একটি-দুটি রাগে সিদ্ধিলাভের কথা জানা যায়। সেই সব রাগের সঙ্গে তাদের সাধকদের নামের স্মৃতিও অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে আছে। যথা, ধ্রুপদী মুরাদ আলী খাঁর মালকোষ ও ইমন। বীণ্‌কার-রবাবী সাদিক আলী খাঁর শুদ্ধ কল্যাণ, ইমন কল্যাণ ও দরবারী কানাড়া। ধ্রুপদী যদু ভট্টের দরবারী কানাড়া। সুরবাহার-সেতারী ইম্‌দাদ খাঁর পুরিয়া। ধ্রুপদী গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের ভৈরব। অঘোরনাথ চক্রবর্তীর ভৈরবী। সুরশৃঙ্গারবাদক প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাগীশ্বরী ও দরবারী কানাড়া। খেয়াল-গায়ক বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কামোদ। রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর দরবারী কানাড়া। ধ্রুপদী মহীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কেদারা। ধ্রুপদী ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরট ও ধূরিয়া মল্লার। ধ্রুপদী গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছায়ানট, ইত্যাদি।

তেমনি ধ্রুপদী হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বসন্ত। এণ্টালির মধুকণ্ঠ গায়ক হরিনাথের বসন্ত রাগের গান একটি শোনবার বস্তু ছিল। একে তো তাঁর কণ্ঠে হৃদয়স্পর্শী জোয়ারি—অমন জোয়ারিদার গলা খুব কম গায়কদেরই শোনা গেছে—তার ওপর তাঁর সাধা বসন্ত রাগের হিল্লোল। 'মাধব মাধব মাধব' উত্তরাঙ্গ

প্রধান বসন্তের এই গানখানি যখন তিনি অপরূপ সুরেলা কণ্ঠে তদ্‌গত চিত্তে গাইতেন, আসরে উদ্দীপনার সঞ্চার হত। এমন কোন আসর নেই যা তিনি এই গানে মাতিয়ে দিতেন না। 'শঙ্কর উৎসব'-এর মতন বড় প্রকাশ্য জলসা থেকে আরম্ভ করে অনেক ঘরোয়া আসরে পর্যন্ত বসন্ত গাইতে তিনি অনুরুদ্ধ হতেন আর মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন শ্রোতাদের।

এই গানটির প্রসঙ্গে নাটোর মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের কথা এসে পড়ে। তাঁর কথা আগের অধ্যায়ে এবং রাধিকাপ্রসাদের প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে আরো কিছু বলবার আছে, কিন্তু তাঁর কথার আগে হরিনাথের সঙ্গীত-জীবনের কিছু পরিচয় জেনে রাখা যায়।

বাংলার যে গুণীদের নাম কণ্ঠমাধুর্যের জন্যে অমর হয়ে থাকবার যোগ্য, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট একজন। কিন্তু আত্মপ্রচারে একান্ত বিমুখতার জন্যে তাঁর গুণের উপযুক্ত খ্যাতি হয় নি, যদিও তিনি অতি নিষ্ঠাবান সঙ্গীতসাধক ছিলেন। গ্রামোফোন কোম্পানী থেকে একাধিকবার আমন্ত্রিত হয়েও সম্মত হন নি রেকর্ড করতে। নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনের এলাহাবাদ অধিবেশনে যোগ দিতে অনুরুদ্ধ হয়েও যান নি, দলাদলি এড়াবার জন্যে। অতি নির্বিরোধী, শান্তিপ্রিয় মানুষ। তাঁর স্বভাবে এমন প্রশান্ত সৌজন্য ছিল যে, পরনিন্দা কোথাও হতে আরম্ভ হলে সেখান থেকে উঠে যেতেন। এমন চরিত্র বাংলাদেশে দুর্লভ।

শঙ্কর উৎসব প্রভৃতি অপেশাদার বার্ষিক জলসা ছাড়া কয়েকটি মাত্র ঘনিষ্ঠ বাড়ির ঘরোয়া আসরেই বেশি গাইতেন তিনি। কলকাতার অন্য অনেক আসরেও কখনও কখনও গেয়েছেন এবং তখনকার সঙ্গীতরসিক ও গুণীরা তাঁর গুণপনার পরিচয় পেয়েছেন। স্বনামধন্য অঘোরনাথ চক্রবর্তী তাঁকে কৌতুক করে এক একদিন বলতেন, 'তোর গলাটা আমায় দিতে পারিস্?' কিংবা 'তোর মতন গলা যদি পেতুম!' সরদী হাফিজ আলী খাঁ তাঁর গান শুনে বলেন, 'এমন সুরেলা গলা সারা ভারতে খুব কম শুনেছি।'

যেসব ঘরোয়া আসরে তাঁর গান বেশি হত, তাদের মধ্যে উল্লেখ্য হল—এল্‌গিন রোডের নাটোর ভবন, লালচাঁদ বড়ালের বাড়ি, এণ্টালির দেব লেনের দেব-গৃহ প্রভৃতি। এণ্টালির এই দেব-পরিবারের গৃহ ছিল এ অঞ্চলে উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীতচর্চার প্রধান কেন্দ্র। এ বংশের ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেব বিখ্যাত গায়ক গোপালচন্দ্র চক্রবর্তীর শিষ্য ছিলেন এবং রীতিমত সঙ্গীতচর্চা করতেন। এ পরিবারের আর এক ব্যক্তি, উপেন্দ্রনারায়ণ দেব এমন সঙ্গীতপ্রেমী ও সঙ্গীতের

পৃষ্ঠপোষক ছিলেন যে, ভারতের কোন গুণী কলকাতায় এলে তাঁর গান, বাজনার অনুষ্ঠান এ বাড়িতে করতেনই, তা যত ব্যয়সাধ্যই হোক। এখানে আগমন ঘটে নি, এমন ওস্তাদ কমই ছিলেন। যাঁরা এ বাড়ির আসরে বেশিবার যোগ দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে নাম করা যায় রম্‌জান খাঁ, বিশ্বনাথ রাও, অঘোরনাথ চক্রবর্তী, আলাউদ্দিন ও হাফিজ আলী খাঁ, লালচাঁদ বড়াল প্রভৃতির। গ্রামোফোন রেকর্ড তৈরির আগেকার যুগে এই পরিবারের উদ্‌যোগে গায়ক-দের মোমের চোঙায় ঘরোয়া রেকর্ড হয়েছিল। সেই সব ব্যক্তিগত রেকর্ডে লালচাঁদ বড়াল, হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির গান ধরা ছিল, কিন্তু পরে সে-সব রেকর্ড নষ্ট হয়ে যায়। সঙ্গীত ও সঙ্গীতজ্ঞদের এমনি নানা পৃষ্ঠপোষকতার জন্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন এণ্টালির এই দেব-পরিবার।

হরিনাথের সঙ্গীত শিক্ষা ও সঙ্গীতচর্চাও দেব-গৃহের জন্যে সম্ভব হয়েছিল। ছেলেবেলা থেকেই তিনি স্বভাব-সুকণ্ঠ ছিলেন এবং গান শিক্ষা করতেন শুনে শুনে। তাঁর বাড়িও দেব লেনে। নিকট প্রতিবেশী হওয়ায় স্কুল-জীবন থেকেই দেব-বাড়ির সঙ্গীতের আসরে নানা গুণীর গান শুনে সঙ্গীতে আরও আকৃষ্ট হন। এ বাড়ির ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেবের গান শুনে তিনি গাইতেন। একদিন এ বাড়ির নীচের তলায় বসে তিনি গান গাইছেন, এমন সময় ব্রজেন্দ্রনারায়ণ ওপর থেকে তা শুনে হরিনাথের প্রতিভার পরিচয় পান এবং রীতিমত শেখাতে চান তাঁকে। এইভাবে হরিনাথের গান শিক্ষা আরম্ভ হয়। নিয়মিত রেওয়াজও তিনি করতেন দেব-পরিবারেই এণ্টালির একটি বাগানবাড়িতে।

ছ-সাত বছর তাঁকে গান শেখাবার পর ব্রজেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হয়। তার পর হরিনাথ অঘোরনাথ চক্রবর্তীর কাছে ক'বছর শিক্ষার সুযোগ পান, এই পরিবারেরই আনুকূল্যে। চক্রবর্তী মশায় মাঝে মাঝে দেব-বাড়িতে গান উপলক্ষে বাস করে যেতেন। সেই সময় তাঁর কাছে শিখতেন হরিনাথ।

পরে তাঁর চাকুরিজীবন আরম্ভ হয়, কিন্তু সঙ্গীতচর্চা অব্যাহত ভাবেই চলে। সঙ্গীতকে সেকালের অনেক বাঙ্গালী সঙ্গীতসাধকের মতন তিনি জীবিকারূপে নেন নি বটে, কিন্তু সঙ্গীতে তাঁর নিষ্ঠা ও নৈপুণ্য ছিল পেশাদার ওস্তাদদেরই সগোত্র। ভুবন মিত্র নামে তাঁর একজন শিষ্য ছিলেন। দেব-বাড়ির সুরেন্দ্রনারায়ণকেও তিনি সঙ্গীত-শিক্ষা দেন। কিন্তু দক্ষিণা নেন নি কখনও। শৌখিন সঙ্গীতজ্ঞই শেষ পর্যন্ত থাকেন। এই হল তাঁর সঙ্গীতসাধনার ইতিবৃত্ত।

বসন্ত রাগে তাঁর সিদ্ধির কথা নিয়ে এ প্রসঙ্গ আরম্ভ করা হয়েছিল। তেমনি

ভৈরবীতেও সিদ্ধ ছিলেন তিনি। তবে বসন্তের জন্যেই আসরে তাঁর সমাদর ছিল বেশী।

আগেও বলা হয়েছে, তাঁর গুণগ্রাহীদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ছিলেন জগদিন্দ্রনাথ রায়। নাটোর মহারাজা অনেক গুণের আধার। একদিকে তিনি যেমন ক্রিকেট-ক্রীড়ামোদী, অন্যদিকে তেমনি সাহিত্যিক ও সাহিত্য-রসিক। আবার সেই সঙ্গে শুধু সঙ্গীতপ্রেমী বা সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক নন, নিজে সঙ্গীতজ্ঞও। সঙ্গতকার ছিলেন, পাখোয়াজ বাজাতেন। পাখোয়াজ শিখেছিলেন মৃদঙ্গী গিরীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। নিজের বাড়ির কিংবা ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবদের ঘরোয়া আসরে পাখোয়াজ বাজাতেন। সঙ্গীতের সভায় একজন রসজ্ঞ সমঝ্‌দার ছিলেন জগদিন্দ্রনাথ।

হরিবাবুর গানের একজন মুগ্ধ শ্রোতা তিনি। কতবার বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়কে নিজের বাড়ির আসরে আমন্ত্রণ করেছেন, তাঁর গান শুনেছেন। তাঁর গানের সঙ্গে বাজিয়েছেনও কোন কোন দিন। বিশেষ করে, হরিবাবুর বসন্ত রাগের ওই গানখানি শুনতে তিনি ভালবাসতেন। কতবার ফরমায়েশ করে শুনেছেন—'বসন্তের সেই গানটি।' কিংবা সেই 'মাধব মাধব' গানখানি। তাঁর আগ্রহে গানটি গেয়ে গায়কও বড় তৃপ্তি পেতেন।

ওই গানখানি জগদিন্দ্রনাথের এত প্রিয় হয়ে পড়ে যে, পরে আর তার সুরের নাম কিংবা ভাষাটাও বলবার দরকার বোধ করতেন না। শুধু বলতেন, সেই গানটি। আর হরিবাবু বসন্ত রাগে গাইতেন—মাধব মাধব মাধব।

জগদিন্দ্রনাথের যাঁরা অন্তরঙ্গ, তাঁরাও জানতেন হরিবাবুর ওই গানখানি তাঁর কত প্রিয়—এতবার তাঁর অনুরোধে গানটি গেয়েছেন হরিবাবু।

আকস্মিক দুর্ঘটনায় জগদিন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। গড়ের মাঠে সকালবেলা বেড়াবার সময় একদিন মোটরের ধাক্কায় জীবনান্ত ঘটে তাঁর। আত্মীয়স্বজন থেকে আরম্ভ করে কলকাতার সাহিত্যিক সমাজ, সঙ্গীতজ্ঞ মহলেও এই বেদনা-দায়ক ঘটনা গভীর শোকের ছায়া ফেলে।

অনেক জ্ঞানী গুণীদের যে তিনি শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, তার পরিচয় পাওয়া গেল তাঁর শ্রাদ্ধবাসরে, তাঁদের উপস্থিতিতে। তিনি তখন আর ইহলোকে নেই, কিন্তু তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর গৃহের শ্রাদ্ধ-সভায় তাঁরা সমবেত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন সঙ্গীতজ্ঞ আছেন, বিশেষ হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

খানিকক্ষণ পরে অন্দর মহল থেকে লোক মারফত হরিবাবুর কাছে অনুরোধ এল—'সেই গানটি' তিনি যেন একবার শোনান।

'সেই গানটি' যিনি শুনতে এত ভালবাসতেন, তাঁর এই শ্রাদ্ধ-বাসরের শোক-গম্ভীর পরিবেশে গানখানি গাওয়া সময়োচিত স্মৃতিতর্পণই হল।

বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় গাইতে আরম্ভ করলেন—মাধব মাধব মাধব···

সেই প্রাণস্পর্শী সুরে তেমনি গভীর দরদ দিয়ে তিনি গাইতে লাগলেন। জগদিন্দ্রনাথের আত্মা যেন সেখানে সমুপস্থিত, সভার সকলে যেন তাঁর স্নিগ্ধ-মধুর ব্যক্তিত্ব অন্তরে অনুভব করছেন, এমন আবহ সৃষ্টি হল তাঁর গানে।

সকলের মনে হল যেন কোন অদৃশ্যলোক থেকে আজও জগদিন্দ্রনাথ তাঁর সেই বসন্তের প্রিয় গানটি হরিবাবুর কণ্ঠে শুনছেন—

মাধব মাধব মাধব
মদন মথন মধুসূদন,
মনোমোহন মদন জনক
মুকুন্দ মুরলিধর মুরারে।
মায়াপতি ভক্তবৎসল হরে॥

তালাধ্যায়ে দুর্লভচন্দ্র

তেজস্বী, নির্লোভ এবং সত্যি কথার মানুষ—আজকালকার সমাজে যা দুর্লভ হয়ে এসেছে, দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য ছিলেন তেমনি একজন খাঁটি মানুষ। আর পাখোয়াজী হিসেবে ছিলেন তাল লয়ে অবিচল, গায়কের অতি কূট লয়কারীতে অটুট, অফুরন্ত বোলের অব্যর্থ প্রয়োগপটু সঙ্গতকার।

দুর্লভচন্দ্র ছিলেন বাংলা তথা ভারতের এক শ্রেষ্ঠ মৃদঙ্গী। যেমন নিষ্ঠার সঙ্গে দীর্ঘ একুশ বছর মুরারিমোহন গুপ্তের কাছে শিখেছিলেন, সঙ্গীত জীবনেও ছিলেন তেমনি একনিষ্ঠ সাধক। সঙ্গীতের আসরে তিনি মৃদঙ্গের মর্যাদা নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর নিজের শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব যেন তাঁর পাখোয়াজের মধ্যে ফুটে উঠত সঙ্গীতের আসরে। "শুধু ঠেকা" বাজাতে বলতেন যদি কোন পশ্চিমী ওস্তাদ, তিনি তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ জানাতেন। বাজাতে অস্বীকার করতেন তা হলে। শুধু ঠেকা? তবে এত কষ্ট করে এত সব শেখা কি জন্যে? হাত খুলে বাজাতে দিতে হবে। কথা রাখা হলে তবে বাজাতেন। তাঁর দৃঢ় চরিত্র ও আত্মপ্রত্যয় দেদীপ্যমান হত আসরে পাখোয়াজ নিয়ে বসলে।

জাত সঙ্গতী ছিলেন দুর্লভচন্দ্র। কিন্তু কোনদিন বাদক জীবনকে পেশা করেন নি। পাখোয়াজ ছাড়া তবলাও তিনি বাজাতেন এবং এই দুই যন্ত্রে তাঁর বিরাট শিষ্যমণ্ডলী ছড়িয়ে আছে বাংলার নানা জায়গায়। এই সব শিক্ষাও তিনি কখনও অর্থের বিনিময়ে দেন নি। কত বার এমন হয়েছে, বড় বড় জমিদারের বাড়ির আসরে মোটা মুজরো নেবার অনুরোধ এসেছে। কিন্তু কোনদিন নেন নি তিনি। অথচ ধনী ছিলেন না এবং বৃত্তি ছিল যজমানী পুরোহিতের। শুধু টাকা নয়, অন্য কোন ভাবেও সাহায্য বা দান তিনি নিতেন না। একবার কলকাতার এক সুপরিচিত সঙ্গীতপ্রেমী ধনী তাঁর বাড়ির আসরে ভট্টাচার্য মশায়কে অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে উপহার দেন একটি বহুমূল্য শাল। দুর্লভচন্দ্র সেই শালটি গৃহকর্তার পুত্রের গলায় পরিয়ে দেন, বাড়ি নিয়ে আসেন নি। প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণের মতন সামান্য ধুতি চাদরধারী হয়েও তিনি নস্যাৎ করে দিতে পারতেন অর্থের প্রলোভনকে, অন্তরের সম্পদে গরীয়ান্ হয়ে।

সঙ্গীতকে পেশা না করার জন্যে রেডিওতে তিনি বাজাতে চাইতেন না। সঙ্গীত সম্মেলন সম্পর্কেও তাই। অনেক পীড়াপীড়িতে একবার মাত্র নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনে (কাশীতে, সপ্তম বার্ষিক অধিবেশনে) আর একবার কলকাতার নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনে বাজিয়েছিলেন তিনি। তবে কলকাতার বহু আসরে বহু ভারত বিখ্যাত ওস্তাদদের সামনে গুণপনা দেখিয়েছিলেন। নিজের গুরুর স্মৃতিরক্ষার জন্যে দীর্ঘকাল ধরে প্রতি বছর যে 'মুরারি সম্মেলন' করতেন, আগেকার আমলে সেসব ছিল উঁচুদরের আসর। শুধু কলকাতার শ্রেষ্ঠ ওস্তাদরা নয়, অনেক সর্বভারতীয় গুণীও সেখানে যোগ দিয়েছেন। সে-সব আসরেও অনুরোধে পড়ে তিনি অনেক পশ্চিমী ওস্তাদদের সঙ্গেই সঙ্গত করেছিলেন। তাঁর জীবনের অবসানও হয় এক সঙ্গীতের আসরে, পাথুরেঘাটার ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের বাড়িতে। তখন তাঁর ৬৮ বছর বয়স। আসরে বাজাতে বাজাতেই তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন, সে জ্ঞান আর ফিরে আসে নি। 'সুরের আসরে দুর্ঘটনা' অধ্যায়ে সে ঘটনার বিবরণ পাওয়া যাবে।

এখন তাঁর যে আসরের গল্পটি বলা হবে, সেটি হয়েছিল—ভারত সঙ্গীত সমাজে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ স্মরণীয় ব্যক্তিদের স্থাপিত এই ভারত সঙ্গীত সমাজ প্রথম দিকে জোড়াসাঁকোর কালীপ্রসন্ন সিংহের (১৪৭, বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট) বাড়িতে থাকলেও, এই আসরের সময়ে ছিল ১৩, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের লাহা বাড়িতে। এখানে দুর্লভচন্দ্রের পাখোয়াজ সঙ্গত হয় বিখ্যাত

ধ্রুপদী ভ্রাতৃদ্বয় শিব পশুপতির সঙ্গে। তাঁরা দু-ভাই হলেন ভারত-প্রসিদ্ধ প্রসদ্দু মনোহর ঘরানার উত্তরাধিকারী। এই মিশ্র ঘরানা সঙ্গীতের বহুমুখী সাধনায় অসামান্য কৃতী এবং এই ঘরানার অনেক গুণী ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা গানের সঙ্গে একাধিক যন্ত্রেও পারদর্শী ছিলেন। আগেকার একটি অধ্যায়ে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের গান শিক্ষার কথায় এই ঘরানার আর এক গুণী রামকুমার মিশ্রের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এখন যাঁদের উল্লেখ করা হল, সেই শিবসেবক মিশ্র ও পশুপতিসেবক মিশ্র হলেন প্রসদ্দুর পুত্র রামসেবক মিশ্রের সুযোগ্য পুত্রদ্বয়। তাঁরা দুজনে অনেক আসরে জুটিতে ধ্রুপদ গাইতেন বলে তাঁদের নাম সঙ্গীত জগতে একসঙ্গে উল্লেখ করা হত। সে যুগের সঙ্গীত সমাজে সুপরিচিত শিব পশুপতির মধ্যে পশুপতিসেবক মিশ্র হলেন জ্যেষ্ঠ এবং ধ্রুপদের সঙ্গে বীণা ও সেতারেও ওস্তাদ ছিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা শিবসেবক মিশ্র ধ্রুপদী রূপেই বিখ্যাত এবং অনেক আসর তাঁরা দু-ভাই মাত করেছেন জুড়িতে ধ্রুপদ গান গেয়ে!

বারাণসীর এই মিশ্র ঘরানা তালাধ্যায়ে ভারতের প্রায় শীর্ষস্থানীয় বলা যায়। মিশ্র ঘরানার গায়ক বা বাদকদের মতন তাল ও লয়ের কাজে এমন প্রবীণ অতি অল্পই ছিলেন। শিব পশুপতিরও তাল লয়ে ছিল ভারতব্যাপী খ্যাতি এবং এ বিষয়ে তাঁরা নিজেরাও যথেষ্ট সচেতন আর গর্বিতও ছিলেন। অনেক আসরে তাঁরা তাল লয়ের কূট কৌশলে অনেক নামী সঙ্গতকারকেও করতেন ধরাশায়ী। সেদিক থেকে তাঁরা ছিলেন দুর্ধর্ষ ধ্রুপদী। তাঁদের সঙ্গে সঙ্গত করা এক মহা পরীক্ষার ব্যাপার হত সঙ্গতীদের পক্ষে।

তাই সেবার যখন ভারত সঙ্গীত সমাজে মিশ্র ভ্রাতাদের গানের কথা হল, উদ্‌যোক্তারা চিন্তিত হলেন এই ভেবে যে, তাঁদের সঙ্গে পাখোয়াজ বাজাবেন কে? শেষে সাব্যস্ত হল যে, দুর্লভচন্দ্র হলেই সবচেয়ে ভাল হয়। একেবারে শেষ দিনে, অর্থাৎ যেদিন আসর হবে সেদিনই সকালবেলা উদ্‌যোক্তারা বলতে গেলেন তাঁকে।

পথেই দেখা হল তাঁর সঙ্গে। তিনি তখন নামাবলী গায়ে, মাথায় গামছা দিয়ে চলেছেন যজমানের বাড়ি। অনুরোধ শুনে বললেন, "আমি তো এখন পুজো করতে যাচ্ছি। অনেক বেলা পর্যন্ত উপোস থাকব। আমার আজ না গেলেই ভাল হয়।"

"কিন্তু আপনি না গেলে চলবে না, ভট্‌চায্যি মশায়। এ আসর আর কে সামলাবেন?"

দুর্লভচন্দ্র শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন, যজমানের পুজো শেষে ফিরে ভারত সঙ্গীত সমাজে যাবেন।

সন্ধ্যার পর আসর আরম্ভ হল। পশুপতিসেবক এবং শিবসেবক পাগড়ি মাথায় দরবারী পোশাকে জুড়িতে গান আরম্ভ করলেন। তাঁদের সামনে চাদর মাত্র গায়ে পাখোয়াজ কোলে নিয়ে বসেছেন দুর্লভচন্দ্র। মিশ্র ভ্রাতারা আগে কখনও তাঁর সঙ্গে গান করেন নি, তবে কলকাতায় আসা যাওয়া ছিল বলে তাঁর নাম শুনেছিলেন মাত্র। চাক্ষুষ এই প্রথম। তাঁদের সঙ্গে প্রথম বাজাতে গিয়ে কত পাখোয়াজী তাল লয়ের গভীর আবর্তে পড়ে দিশাহারা হয়েছেন। দুর্লভচন্দ্রকেও সেই অবস্থায় নিক্ষেপ করবার ইচ্ছা তাঁদের মনে ছিল কি না কে জানে!

আলাপচারী শেষ করে শিব পশুপতি গান আরম্ভ করলেন। দুর্লভচন্দ্র সহজাত তালবোধ থেকে বুঝতে পারলেন—অতি কঠিন ব্যাপার। ধা মারা-ই দুর্ঘট! কারণ গায়করা সম পরিষ্কার করে দেখাচ্ছেন না। তা ছাড়া, কোথায় ছাড়ছেন, তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই!—যেখানে সেখানে তাঁরা ছেড়ে দিচ্ছেন—কখনো ৯ মাত্রায়, কখনো ১১ মাত্রায়। এটা রীতি না হলেও, হিসেবে তাঁদের ভুল ছিল না আদৌ। কারণ বেতালা তাঁরা হচ্ছিলেন না এবং লয়েও কোন গোলমাল নেই। দুর্লভচন্দ্রও অকাট্য হিসেবে ঠিক ঠিক জায়গায় ধা মারতে লাগলেন। আর গায়কদের মুখের দিকে চেয়ে প্রতিটি ধা মারবার পর জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, "কেয়া, ঠিক হুয়া?" হিন্দী শব্দ তাঁর ভাণ্ডারে বিশেষ থাকত না, সুতরাং একটি করে ধা মারেন আর ওই একই প্রশ্ন করেন। মিশ্ররাও ঘাড় নেড়ে জানান যে, ভুল হয় নি, ধা যথাস্থানেই পড়েছে।

দুর্লভচন্দ্র কিন্তু প্রশ্নটি করছিলেন ঠিক সরলভাবে নয়। তাঁর বলবার ধরনে শ্লেষ প্রচ্ছন্ন ছিল। যেন তিনি পাল্টা বলতে চাইছিলেন যে, আমাকে জব্দ করতে চাইছিলে, ভেবেছিলে আমি আশার মতন করে ঠিক ধা মারতে পারব না। এখন কি মনে হয়, ধা দিতে পেরেছি কিনা?

এমনি ভাবে তাঁদের গানের সঙ্গে দুর্লভচন্দ্রের পাখোয়াজ চলতে লাগল। তাঁরা যে কোন মাত্রায় ছাড়ুন আর তাল লয় নিয়ে সার্কাস খেলোয়াড়ের মতন যত অসম্ভব কায়দাই দেখান, তিনি সঙ্গতে টললেন না। আসর সচকিত করে সশব্দে তাঁর ধা পড়তে লাগল অব্যর্থভাবে। তার পর গান শেষ হতে গায়কদের উদ্দেশে তাঁর নিজস্ব হিন্দীতে বললেন, "অঙ্ক কষা হুয়া?"

বলে, আর একটি কথা যা বললেন, তা লেখা যাবে না, কারণ এখনকার কালের বিচারে কথাটি অশ্লীল শোনাবে। অথচ সেকালে এমন দু-চারটে কথা কেউ কেউ সরলভাবে বলতেন, তাতে দোষ হত না। কালে কালে অন্যান্য জিনিসের মতন শ্লীল-অশ্লীলের ধারণাও বদলে যায়। যেমন এখন বাঙ্গালী মহিলাদেরও অঙ্গে বডিসকে-হার-মানানো চোলি ব্লাউজ উঠেছে এবং তা শ্লীল বিবেচিত হচ্ছে। সেকালের যাঁদের রসিকতা আমাদের আজ অশ্লীল অপবাদ পাচ্ছে, তাঁরা এখনকার চোলি ব্লাউজ-ধারিণীদের চর্মচক্ষে দেখলে, কি মন্তব্য করতেন?

সে যা হোক, কোল থেকে পাখোয়াজটি ফরাশের ওপর নামিয়ে রেখে তিনি বললেন, "এই কি গান গাওয়া? এমন করলে কি বাজাব? এই রইল বাজনা।"

তখন শিব পশুপতি বললেন, "সত্যি বলতে কি, আমরা আপনাকে পরীক্ষা করছিলুম। কিন্তু আপনি তাল লয়ে নিখুঁত। আমরা এখন ভাল করে গাইছি। আপনি বাজান।"

তার পর সত্যিকার সঙ্গীত আরম্ভ হল।

কৌকভ খাঁ ও কুকুভা বা কোকভ রাগ

সরদ-গুণী কৌকভ খাঁর উল্লেখ আগেকার কোন কোন অধ্যায়ে করা হয়েছে। বিশেষ রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর আসরের প্রসঙ্গে। কিন্তু সে-সব জায়গায় তাঁর পরিচয় পরোক্ষে দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ তাঁর কোন সঙ্গীতানুষ্ঠান সেখানে বর্ণনীয় বিষয় ছিল না। এখন যে আসরের উল্লেখ করা হবে, এখানে তিনিই নায়ক এবং প্রত্যক্ষ আলোচনার বিষয়। তাঁর ভূমিকা ও প্রসঙ্গই এখানে মুখ্য বক্তব্য।

ওস্তাদ কৌকভ খাঁ তখন কিছুদিন থেকে কলকাতায় বসবাস আরম্ভ করেছেন। কিন্তু ভালভাবে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করেন নি এখানকার সঙ্গীত-সমাজে। পেশাদার তিনি, তাই প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত-ব্যবসায়ীদের প্রচ্ছন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে দিয়ে তাঁকে নিজের আসন করে নিতে হচ্ছে। জাতিতে পাঠান, স্বভাবে আফগানী ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতার অভাব নেই। নতুন ক্ষেত্র কঠোর পৌরুষে জয় করে নেবার দুর্বার মনোভাব আছে। আর সেই সঙ্গে অসাধারণ রেওয়াজী তৈরি হাত। শিশুকাল থেকে পিতা নিয়ামৎউল্লার তালিম

পেয়েছেন, জ্যেষ্ঠ করামৎউল্লার সঙ্গে রেওয়াজ করেছেন জুটিতে। শুধু তৈরির দিক থেকেই আসর মাত করতে পারেন। তার ওপর রীতিমত গুণী। তাই কলকাতার সঙ্গীত ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে স্থান করে নিচ্ছেন। এমন সময়কার এক আসরের কথা।

অবশ্য কৌকভ খাঁ প্রথম থেকেই কলকাতার সঙ্গীত-প্রেমী বাঙ্গালী ধনী সমাজের আনুকূল্য পেয়েছিলেন। তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসেন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কাশী থেকে। তখন তাঁর পশ্চিমাঞ্চলে যথেষ্ট খ্যাতি হয়েছে, উত্তর ভারতের প্রায় সব দরবারে গুণপনার পরিচয় দিয়েছেন তিনি। কিন্তু স্থায়ীভাবে কোথাও বসবাসের সুযোগ পান নি। প্রথম চাকুরি হয় তাঁর কলকাতায়, যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গীত-দরবারে।

কলকাতায় আসবার ছয়-সাত বছর আগে, বর্তমান শতকের প্রারম্ভে, কৌকভ খাঁ এক মহা গৌরব অর্জন করেছিলেন। বিশ শতকের প্রথম বছরে ফ্রান্সের রাজধানীতে যে বিশ্ববিখ্যাত প্রদর্শনী (Paris Exhibition) হয়, সেখানে পৃথিবীর জাতিদের সামনে ভারতের নানা শিল্পকৃতির পরিচয় দেন পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু। সেজন্য পণ্ডিত মোতিলাল ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিনিধিত্ব করবার যোগ্য নানা শ্রেণীর শিল্পী, কারুশিল্পী প্রভৃতি এমন কি মল্লবীর পর্যন্ত বহু ব্যয়ে সেখানে নিয়ে যান। সেই দলে সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে ছিলেন কৌকভ খাঁ ও তাঁর জ্যেষ্ঠ করামৎউল্লা খাঁ। একজন ধ্রুপদী ও সঙ্গতকারও ছিলেন তাঁদের সঙ্গে। সেই প্যারিস প্রদর্শনীর একদিনের সঙ্গীতের আসরে সরদ বাজিয়ে সমবেত ইউরোপীয় শ্রোতাদের কৌকভ খাঁ চমৎকৃত করে দেন। সকলে বিশেষ করে উদ্দীপিত হয়েছিলেন তাঁর অতি দ্রুত লয়ে বাজনার জন্যে।

সেই দ্রুততার জন্যে কলকাতার আসরেও তিনি চমক সৃষ্টি করতেন। অত দূনে বাজালেও তাঁর হাত থেকে কখনও বেসুর শোনা যেত না—তাঁর বাজনা অনেকবার শুনেছেন এমন বিচক্ষণ শ্রোতাদের এই মত। অবশ্য, শুধু দ্রুত লয়ে বাজানোই তাঁর প্রধান বা একমাত্র কৃতিত্ব ছিল না—দ্রুততা তো শুধু অভ্যাসের ব্যাপার, সঙ্গীতের রসসৃষ্টিতে তা কখনই বড় জিনিস নয়। সেই সঙ্গে তাঁর রাগবিস্তারের নৈপুণ্য, রাগরূপের শিল্পসম্মত উপস্থাপনা ইত্যাদিও ওস্তাদসুলভ ছিল। সরদ ও ব্যাঞ্জো বাদকরূপে আসরে যথার্থ গুণী ও শিল্পী সত্তারই প্রকাশ করতেন তিনি। তা ছাড়া, সঙ্গীতের ঔপপত্তিক বিষয়েও তাঁর সত্যকার পাণ্ডিত্য ছিল, সঙ্গীত-তত্ত্বের একাধিক পুস্তক রচনা করেছিলেন তিনি। কিন্তু

তাঁর সেসব পরিচয় দেবার এখানে অবকাশ নেই।

তাঁর যে আসরে সেদিন বাজনার কথা এখানে বলা হবে, তা হল ওয়েলেস্‌লি স্ট্রীটের মহিষাদল রাজপরিবারের ভবন। কৌকভ খাঁ তখন কলকাতার সঙ্গীতজগতে উদীয়মান কলাবত, তাই সে আসরের শ্রোতারা তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় পাবার জন্যে উৎসুক ছিলেন। কয়েকজন পেশাদার সঙ্গীতজ্ঞও আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন, খাঁ সাহেবের গুণপনা সাক্ষাৎ জানতে।

এই আসরের আগে কোন কোন জলসায় এমন হয়েছে যে, কৌকভ খাঁ সুযোগ পেলে এখানকার গায়ক বা বাদককে অপদস্থ করেছেন। অন্য সঙ্গীতজ্ঞের ওপর নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে আসরকে প্রভাবিত করতে চেয়েছেন বৃহত্তর সঙ্গীতক্ষেত্রে প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্যে। হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল মশায়ের সঙ্গীতসভার আসরে তাঁর সঙ্গীতগুরু নন্দ দীঘল সেতারীর সঙ্গে বচসা করেছেন তিলক কামোদ রাগের বিস্তারের পদ্ধতি নিয়ে। নন্দ দীঘল অপমানিত হয়েছেন। এ পর্যন্ত যাঁরা খাঁ সাহেবকে আসরে দেখেছেন তাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে তিনি রীতিমত দাপটওয়ালা লোক। তাঁর ধাতুতে একটা আক্রমণাত্মক ভাব আছে যা তিনি প্রয়োজন বোধ করলেই প্রকট করতে পারেন।

কিন্তু এদিনের আসরে, ওয়েলেস্‌লির মহিষাদল ভবনে, খাঁ সাহেবের যুদ্ধ-বিলাসী মনের আর একরকম প্রকাশ দেখা গেল। এখানেও তিনি সহ-সঙ্গীতজ্ঞ-দের ভীষণভাবে এক হাত নিলেন, কিন্তু সে আক্রমণের পদ্ধতি বিচিত্র। তা যেমন তির্যক, তেমনি তীব্র মর্মভেদী।

আসরে তিনি সচরাচর মাথায় পাগড়ি চড়িয়ে দরবারী পোশাকে বাজাতে বসতেন। এখানেও তেমনি মুরেঠা শোভিত হয়ে সরদ যন্ত্রটি সুর মিলিয়ে নিলেন কোলে রেখে। আসরে কলকাতার কয়েকজন নামকরা গায়ক-বাদক ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন হলেন বিখ্যাত ধ্রুপদী গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যাঁর পরিচয় পরের অধ্যায়েই বিস্তারিতভাবে পাওয়া যাবে।

কৌকভ খাঁ যন্ত্রে ঝঙ্কার তুলে আলাপচারী অ' ম্ভ করলেন। যে রাগটি তিনি বাজাতে লাগলেন, তা তেমন প্রচলিত ছিল না। (এবং এখনও প্রায় অপ্রচলিত)। রাগের নাম কোকভ বা কুকুভা। এটি বিলাবল ঠাটের অন্তর্গত, সম্পূর্ণ জাতি। বাদী মধ্যম, সম্বাদী ষড়জ। উত্তরাঙ্গ প্রধান, অর্থাৎ তারা গ্রামে সুরবিহার বেশি। দুটি নিখাদেরই ব্যবহার হয়, বাকি স্বর শুদ্ধ। ঝিঁঝিট ও আলাহিয়ার মিশ্রণে কৌকভ বা কুকুভা গঠিত। এ রাগের এই ধ্যান পাওয়া যায়—

সুপোষিতাঙ্গী রতি মণ্ডিতাঙ্গী
চন্দ্রাননা চম্পকদামযুক্তা।
কটাক্ষিণী স্যাৎ পরমা-বিচিত্রা
দানেন যুক্তা কুকুভা মনোজ্ঞা॥

খাঁ সাহেব এ রাগ কেন নির্বাচন করেছিলেন বলা যায় না। হয়তো কলকাতার আসরে অপ্রচলিত ও অপরিচিত হবে মনে করে এবং নিজের নামের সঙ্গে সাদৃশ্যের জন্যেও বোধ হয় আকর্ষণ বোধ করে। যা হোক, খানিকক্ষণ আলাপ করবার পর বাজনা থামিয়ে যেন শিষ্টাচার বশে কাছাকাছি গুণীদের উদ্দেশে নিজের ভাষায় জিজ্ঞেস করলেন—কেমন, ঠিক হচ্ছে তো?

তাঁদের প্রত্যেককে আলাদা ভাবে সবিনয়ে ওই প্রশ্ন তিনি করলেন—কেমন লাগছে আপনার? রাগ ঠিক আছে তো?

যাঁদের কাছে জানতে চাইলেন, তাঁরা সকলেই জানালেন যে, হ্যাঁ, চমৎকার হচ্ছে, সব ঠিক আছে।

তাঁরা হয়তো অতশত ভেবে বলেন নি। সভার মধ্যে যেমন ভদ্রতা, সৌজন্য দেখাতে হয় সেইভাবেও বলতে পারেন, বলা যায় না সঠিক। তবে হিন্দুর ভদ্রতার সুযোগ রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতিতে যেমন বিদেশীরা বরাবর নিয়েছে, কৌকভ খাঁ তেমনি সঙ্গীতের আসরেও নিলেন। তার পরিচয় একটু পরেই পাওয়া যাবে।

কিন্তু গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়কে যখন কৌকভ খাঁ ওইভাবে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি সম্মতি জানালেন না। গম্ভীর মুখে নিরুত্তর রইলেন। খাঁ সাহেবের কথার কোন জবাব না দেওয়ায় তাঁর আচরণ অনেকের কাছে ভাল লাগল না। অসৌজন্য প্রকাশ পেলে যেন। যাঁরা প্রশংসা করেছিলেন, তাঁদের ব্যবহার বড় ভদ্র মনে হল। কিন্তু বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়ের ওইরকম স্বভাব ছিল, কি করবেন তিনি? যা মনোমত হয় নি তাকে সুখ্যাতি জানাতে পারতেন না। এজন্যে অনেক জায়গায় অপ্রিয় হতেন, জনপ্রিয় হতে পারতেন না কখনও। পছন্দ-অপছন্দ, সাদা-কালো, সত্য-মিথ্যা তাঁর কাছে সুস্পষ্ট ছিল, কখনও মিলেমিশে একাকার হয়ে যেত না। বিবেক বিসর্জন দিয়ে সকলের প্রিয় হবার দিকে লক্ষ্য ছিল না তাঁর। যেমন খাড়া বসে থাকতেন, এখানেও তেমনি রইলেন।

বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়ের উত্তরের আশায় খানিক অপেক্ষা করে খাঁ সাহেব তাঁর বোমা বিস্ফোরণ করলেন। মারাত্মক শ্লেষের সঙ্গে বললেন—উও তো

'হুম্' হায়। (ও তো লেজ!)

অর্থাৎ তিনি এতক্ষণ রাগের লেজ বা শেষাংশটি বাজিয়েছেন। ওটি আসলে উপসংহার মাত্র। রাগের আদ্য ও মধ্য পর্যায় বাজানোই হয় নি। কুকুভা বা কৌকভ রাগের পদ্ধতিগত সম্পূর্ণ রূপ এমন নয়।

সুতরাং প্রমাণ হয়ে গেল যে, যাঁরা সুখ্যাতি করেছেন, তাঁরা এই রাগের বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ। নির্বোধ প্রতিপন্ন করেছেন তাঁরা নিজেদের।

যাঁরা তাঁর বাজনার সুখ্যাতি করে সৌজন্য প্রদর্শন করেছিলেন, এখন কৌকভ খাঁর কথায় তাঁদের মাথা হেঁট হয়ে গেল। উঁচু মাথা রইল শুধু গোপালবাবুর।

মুচকি হেসে তার পর খাঁ সাহেব জানালেন যে, এইবার তিনি যথার্থ রীতি-সম্মত রাগালাপ করবেন, সকলে শুনুন।

এই বলে বাজনা আরম্ভ করলেন।

কিন্তু এই বিসদৃশ ব্যাপারের পর আসরের অনেক শ্রোতারই সুরের মেজাজ আর রইল কি?

ধ্রুপদ পিতার খেয়াল সন্তান

ওজস্বী কণ্ঠে বিশুদ্ধ স্বর, সুর ও তাল-লয়ে অসাধারণ অধিকার ও রাগবিদ্যায় সুগভীর পাণ্ডিত্য—এই হল ধ্রুপদী গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। সঙ্গীত জগতে তিনি একজন আচার্য-স্থানীয় ছিলেন এবং শুধু বাংলা-দেশে নয়, পশ্চিমাঞ্চলেও ধ্রুপদীরূপে তাঁর অতি সম্মানের আসন ছিল। তিনিও ছিলেন বিগত যুগের এক আদর্শবাদী সঙ্গীতজ্ঞ, কোন ফাঁকি ছিল না তাঁর সঙ্গীত-শিক্ষায় বা সঙ্গীতচর্চায়। সঙ্গীত তাঁর জীবিকার উপায় না হলেও, এমন নিষ্ঠার সঙ্গে সুদৃঢ় ভিত্তিতে তিনি এই বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন, যা অনেক পেশাদার ওস্তাদের মধ্যেও সুলভ নয়।

আসরে ধ্রুপদাচার্যরূপে সুপরিচিত হলেও বিভিন্ন রীতির সঙ্গীতে তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন, কারণ সুদীর্ঘকাল ধরে নানা রীতির সঙ্গীত সাধনা তিনি করেছিলেন কয়েকজন দিক্‌পাল ওস্তাদের শিক্ষাধীনে। তাঁর জন্ম এবং সঙ্গীত-শিক্ষা কাশীতে হওয়ায় শিক্ষালাভের এক অপূর্ব সুযোগ তিনি পান। তাঁর প্রায় সব সঙ্গীতগুরুই ছিলেন কাশীনিবাসী। যথা—বিখ্যাত বীণ্‌কার মিঠাইলাল (বীণ্‌কার ও রবাবী সাদিক আলী খাঁর শিষ্য এবং বড় ও ছোট রামদাসের

গুরু), স্বনামধন্য টপ্পাগায়ক বাখর আলী (টপ্পারীতির এক প্রচলনকর্তা শোরী মিয়াঁর শিষ্যধারায় শিক্ষাপ্রাপ্ত), সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়ক অঘোরনাথ চক্রবর্তী (শেষ বয়সে কাশীবাসী) প্রভৃতি। মিঠাইলালের কাছে খেয়াল ও কিছু ধ্রুপদ, বাখর আলীর কাছে টপ্পা ও ধামার এবং অঘোর-নাথের কাছে ধ্রুপদ ও ভজন—এই হল গোপালচন্দ্রের প্রধান কণ্ঠসঙ্গীত শিক্ষা। তা ছাড়া, তৎকালীন অপ্রতিদ্বন্দ্বী খেয়াল গায়ক সুবিখ্যাত হদ্দু খাঁর পুত্র গোয়ালিয়রের রহমৎ খাঁ একবার কাশীতে কিছুকাল অবস্থান করায় তিনি খাঁ সাহেবের কাছে কিছু খেয়ালের শিক্ষা লাভ করেছিলেন। সেই সঙ্গে ধ্রুপদগুণী রামদাস গোস্বামীর প্রসিদ্ধ শিষ্য হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও উপেন্দ্রনাথ রায়ের (দুজনেই কাশীনিবাসী) কাছে ধ্রুপদ এবং লক্ষ্ণৌর যশস্বী গায়ক নখে খাঁর শিষ্য লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্যের কাছে খেয়াল ও টপ্পাও সংগ্রহ করেন গোপালচন্দ্র। তাঁর কণ্ঠসঙ্গীতচর্চা বা রাগবিদ্যা শিক্ষার কথা এই পর্যন্ত।

কিন্তু সঙ্গতকার হিসাবেও তিনি পারদর্শী ছিলেন এবং একাধিক সঙ্গীতযন্ত্রে তাঁর দস্তুরমত রেওয়াজ ছিল। বিশেষ, তবলায় তিনি একজন গুণী বাদক ছিলেন, যদিও তাঁর পরিণত বয়সে আসরে আর সঙ্গত না করায় শ্রোতা-সাধারণ সেকথা বিস্মৃত হয়ে যায়। তিনি তবলা, পাখোয়াজ ও ঢোল বাদন ভালভাবে শিখেছিলেন। কয়েক বছর তিনি বেতিয়ায় ছিলেন লয়কারীর শিক্ষানবীশ হয়ে। সেখানে ভারতবিখ্যাত পাখোয়াজী কদৌ সিং-এর শিষ্য যোধ সিং-এর কাছে তিনি তবলায় তালিম নেন। কাশীর নামী তবলাবাদক বিনায়ক মিশ্রও তাঁর আর-এক গুরু ছিলেন।

তা ছাড়াও তাঁর সেতার বাজনার কথা আছে। তবে সেতার তিনি অমন রীতিমত রেওয়াজ করেন নি এবং আসরেও বাজান নি। ঘরে বাজাতেন মাঝে মাঝে। বোধ হয় বীণ্‌কার মিঠাইলালের কাছে সেতারের কিছু পাঠ নিয়েছিলেন।

তাঁর বিচিত্র ও বহুমুখী সঙ্গীতশিক্ষার এই হল পটভূমি। তবে আসরে তাঁর পরিচিতি ও স্বীকৃতি ছিল ধ্রুপদীরূপে। কারণ, আসরে তিনি খেয়াল বা টপ্পা গাইতেন না। গাইতেন ধ্রুপদ এবং কখনো কখনো ভজন, ধ্রুপদাঙ্গের। এমন নানামুখী শিক্ষা লাভ করায় তাঁর সঙ্গীত-ভাণ্ডার যে কি পরিমাণ সমৃদ্ধ হয়েছিল, তা ধারণা করা যায়।

প্রথম জীবনে তিনি সঙ্গতযন্ত্রে সাধনা বেশি করেছিলেন আর সে-সময় আসরে তাঁর পরিচয় ছিল সঙ্গতকার বলে। জীবনের প্রথম অর্ধাংশ তাঁর কাটে

বারাণসীতে এবং সেখান থেকে তিনি ব্যবসায় সূত্রে প্রতি বছর কয়েকবার কলকাতায় আসতেন। তখন তিনি কলকাতার সঙ্গীতাসরে তবলা বাজাতেন, তাই তবলাবাদক বলে অনেকেই চিনতেন তাঁকে। ধ্রুপদী বলে বাংলাদেশে সুপরিচিত হন তার অনেক পরে। তাই ওস্তাদ রমজান খাঁ প্রথম যখন তাঁকে গান গাইতে শোনেন, বড়ই আশ্চর্য হয়ে যান। কারণ, তার আগে এক আসরে গোপালচন্দ্র খাঁ সাহেবেরই গানের সঙ্গে তবলা সঙ্গত করেছিলেন। মধুকণ্ঠ টপ্পাশিল্পী রমজান খাঁর অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, তাঁর এক যোগ্য শিষ্য হলেন—তেলিনীপাড়ার জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (কালোবাবু)। একদিন কালোবাবুর বাড়ির আসরে গোপালচন্দ্রকে প্রথম ধ্রুপদ গাইতে শোনেন খাঁ সাহেব আর অবাক হয়ে বলে ওঠেন, 'আরে, এত বড় গুণী গাওয়াইয়া, আমার সঙ্গে আগে তবলা বাজিয়েছেন?' তাঁর ধ্রুপদ গান শুনে সেদিন রমজান খাঁ যেমন মুগ্ধ তেমন বিস্মিত হয়েছিলেন। শুধু খাঁ সাহেব নন, সে আসরের অনেকেই। কারণ, বাংলাদেশে তার আগে গোপালবাবুর গান তেমন কেউ শোনে নি। সকলেই তাঁকে দেখেছে তবলা বাজাতে।

উত্তর জীবনে তিনি বহুকাল কলকাতায় বাস করেছিলেন এবং সসম্মানে বিদ্যমান ছিলেন সঙ্গীতের আসরে। তিনি যে আসরের অনুষ্ঠানে অংশ নিতেন, তার মান সঙ্গীত সমাজে স্বীকৃত হত। ধ্রুপদাচার্য রূপে বাংলায় তাঁর গৌরবের আসন ছিল। বলা যায়, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর মৃত্যুর পর বাংলার সঙ্গীতক্ষেত্রে গোপালচন্দ্র অধিষ্ঠান করেন সেই মর্যাদায়।

সঙ্গীত-চর্চাকে তিনি এমন শ্রদ্ধা ও সাধনার সামগ্রী মনে করতেন যে, সঙ্গীতকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করতে তিনি প্রাণে আঘাত পেতেন। দৈনন্দিন জীবিকা-রূপে সঙ্গীতকে অবলম্বন না করায় পরিণত বয়সে তাঁকে যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল। কিন্তু নিজের আদর্শ ত্যাগ করেন নি। সঙ্গীত বিষয়ে তিনি ছিলেন যেমন পরম আদর্শবাদী, সঙ্গীত পরিবেশনের রীতিতেও তেমনি নিষ্ঠাবান।

জনপ্রিয়তার অভিলাষী হয়ে কখনও তিনি রাগপদ্ধতি থেকে বিচ্যুত হতেন না এবং সঙ্গীতের উপযুক্ত আবহ যেখানে নেই, সেখানে গান করতে অসম্মত হতেন। ধ্রুপদ সঙ্গীতের মান (standard), তা পরিবেশনের যথাযথ পরিবেশ ইত্যাদির বিষয়ে তিনি ছিলেন অতি সচেতন। বেতার অনুষ্ঠানে তিনি একবারের পর আর দ্বিতীয় বার গাইতে সম্মত হন নি, কারণ ধ্রুপদ গানের আগে বা পরে এমন শ্রেণীর গান হয় যা তিনি সমর্থন করতে পারতেন না।

তাই এমন শক্তিশালী প্রচার-যন্ত্রকেও অম্লান বদনে পরিত্যাগ করেছিলেন। গ্রামোফোন রেকর্ডের প্রতিও তাঁর অনাস্থা ছিল তার অতি স্বল্প সময়ের জন্যে। তিন মিনিটে আবার গান কি হবে? (তখন তো আর **Long playing rocord** সৃষ্টি হয় নি)। অতএব গ্রামোফোন বর্জন! এই রকম ছিল তাঁর মনোভাব।

আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেও এমনি ভাবে তিনি আদর্শকে আঁকড়ে থাকতেন। কি সঙ্গীত-জীবনে, কি ব্যক্তি-জীবনে নিজস্ব রুচি ও ধ্যান-ধারণাকে তিনি বিশ্বস্তভাবে মেনে চলতেন। তাঁর অটল নীতিপরায়ণতার মধ্যেও ছিল এই আদর্শ-প্রীতি। এবং বাইরে থেকে তাঁকে যে কোপন স্বভাবের মনে হত, তারও কারণ এই আদর্শবাদ। কোন প্রয়োজনেই তিনি আদর্শকে খাটো করতে পারতেন না এবং কোন রকমের অন্যায় বা কপটাচার বা বেচাল তাঁর সহ্য হত না। বেঠিক কিছু দেখলেই তাঁর চড়া স্বরে বাঁধা মনোবীণার তার ঝঙ্কার দিয়ে উঠত। এবং তাঁর ক্রোধ প্রকাশ হয়ে পড়ত সরল পথে, ঘুঘু লোকের মতন বিষকুম্ভ পয়োমুখ হয়ে জনপ্রিয় সাজতেন না।

সঙ্গীত শিক্ষাদানের ব্যাপারে তিনি পরম উদার ছিলেন, যথার্থ শিক্ষার্থীকে দান করতেন অকৃপণ ভাবে। কিন্তু সেখানেও ছিল এক উচ্চ মানের আদর্শ। শিষ্যের কাছে তিনি আশা করতেন ঐকান্তিক নিষ্ঠা, সাধনা, শ্রম ও সঙ্গীতের প্রতি প্রীতি, শ্রদ্ধার ভাব। সেই সঙ্গে যোগ্যতার কথাও অবশ্য ছিল। কিন্তু তেমন শিষ্য এ যুগে ক'জন মেলে? ধ্রুপদ শিখতে তেমন আগ্রহে এগিয়ে আসে ক'জন শিক্ষার্থী? তাই মাঝে মাঝে আক্ষেপ করে তিনি বলতেন, "আমার দুঃখ এই, কলকাতায় কেউ আমার কাছে তেমন করে নিতে এল না! কারুর খেটে শেখবার আগ্রহ নেই। না হলে আমার অনেক কিছু দেবার ছিল!"

আসরে গান গাইবার সময়েও তিনি তেমনি শ্রোতাদের কাছে আশা করতেন আন্তরিকতা এবং সঙ্গীতের প্রতি অনুকূল মনোভাব। সঙ্গীতপ্রেমী শ্রোতাদের আসর পেলে তিনি সানন্দে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান শোনাতে প্রস্তুত ছিলেন, শ্রোতা যতক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে শুনতে পারে। অপাত্রে পরিবেশনে তাঁর ছিল একান্ত বিরাগ। তাঁর এমনি ধরনের সব মনোভাব অনেকের কাছে মনে হত উন্নাসিকতা বা অহমিকা। কিন্তু তাঁর মতন সঙ্গীতাচার্যের পক্ষে সাঙ্গীতিক ধ্যান-ধারণা খাটো করা সম্ভব ছিল না।

বলিষ্ঠ, দীর্ঘকায় এবং সুপুরুষ গোপালচন্দ্র আসরে অবস্থান করলে তাঁর ব্যক্তিত্ব সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। যেমন নির্ভীক তেমনি স্পষ্টবাদী।

তিনি যে আসরে উপস্থিত থাকতেন সেখানে হোমরা-চোমরা আত্মম্ভরী ওস্তাদদের সমঝে চলতে হত। তাঁর সাহসিকতার ভিত্তি ছিল আত্মবিশ্বাস এবং আত্মবিশ্বাসের ভিত্তি ছিল সঙ্গীতে সুদৃঢ় অধিকার। প্রয়োজন হলে প্রতিদ্বন্দ্বীর সামনে প্রচণ্ড বিক্রম প্রকাশ করতে পারতেন। কিন্তু সেই কাঠিন্যই তাঁর চরিত্রের সমগ্র রূপ নয়। যথার্থ সঙ্গীত-সাধক কখনো একান্তভাবে কঠোর প্রকৃতির হতে পারেন না, তিনিও তা ছিলেন না। উপযুক্ত ক্ষেত্রে এবং সত্যিকার সঙ্গীত রসিকের সামনে তিনি বিনীত হতেও জানতেন। তার অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে একটি এখানে উল্লেখ করা যায়।

সেটি নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের একটি আসর। যতদূর মনে হয়, ১৯৩৬ সালের কথা। তখনকার হ্যারিসন রোডের আলফ্রেড থিয়েটারের মঞ্চে আসর বসেছিল। বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় শুদ্ধ কল্যাণ রাগের ধ্রুপদ গেয়েছিলেন। তাঁর গানের সময়ে আসরে উপস্থিত ছিলেন বোম্বাইয়ের স্বনামধন্য ওস্তাদ আল্লাদিয়া খাঁ (শ্রীমতী কেশরবাঈ কেরকরের গুরু)। খাঁ সাহেবের অত্যন্ত ভাল লেগেছিল গোপালচন্দ্রের গান, তাঁর কল্যাণ রাগের সুপরিকল্পিত রূপায়ন। গান শেষ হতে খাঁ সাহেব তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ওঠেন, 'এমন শুদ্ধ সুর বহুদিন শুনি নি।'

গোপালবাবু তখন সবিনয়ে বলেন, 'একশবার গান্ধার দিয়ে এসেছি, গেছি, কিন্তু খাঁ সাহেব, ঠিক গান্ধার একবারও লাগাতে পারি নি।'

আল্লাদিয়া খাঁ এতক্ষণ তাঁর 'কল্যাণে' মুগ্ধ হয়েছিলেন, এবার মুগ্ধ হলেন তাঁর নম্রতায়। তাঁর কথা খাঁ সাহেব নিশ্চয়ই মেনে নেন নি। গান্ধার ঠিক ঠিক না হলে কল্যাণ এমন সার্থক হল কি করে?

এত বড় সমঝদার শ্রোতা অবশ্য তাঁর হামেশা পাবার কথা নয় এবং সে আশাও তিনি করতেন না। গুণী না হলে গুণীর মর্ম কে বুঝবে? তাই মাঝে মাঝে বিরূপ পরিবেশে পড়ে বিরক্ত হতেন তিনি। কিংবা অকারণে অসম্মান পেলে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতেন। প্রতিযোগীর সামনে ফুটে উঠত তাঁর শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব। তখন দরকার হলে তিনি এগিয়ে গিয়ে আক্রমণ করে আসতেন। আক্রমণ করতেন আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় হিসাবে। পশ্চিমী ওস্তাদদের সঙ্গে অর্থাৎ যাঁরা বাঙ্গালী সঙ্গীতজ্ঞদের সম্পর্কে একটা অহেতুক হীনমন্যতার ভাব পোষণ করতেন—তিনি অকুতোভয়ে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হতেন। অবশ্যই সে সংঘর্ষ সঙ্গীত বিষয়ে, সুর বা তালের কোন কূট সমস্যা বা কৌশল নিয়ে। সে-সব জায়গায় তিনি বীরের মতন সম্মান আদায় করে নিতেন অনিচ্ছুক হাত

থেকে। তখন তিনি দুর্ধর্ষ ধ্রুপদী এবং তাঁর সেই ক্রুদ্ধ মূর্তি অনেক দর্শকের স্মৃতির পটে এখনো আঁকা আছে।

এবারে তাঁর একটি আসরের কথা উল্লেখ করা যাক। এটি পাথুরিয়াঘাটার ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের (নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক) বাড়ির একটি জলসার কথা। ঘরোয়া হলেও আসরটি উঁচুদরের ছিল। বাংলার কয়েকজন শ্রেষ্ঠ গায়ক-বাদক শুধু নন, পশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন গুণীও উপস্থিত ছিলেন সেখানে। বিশেষ একজন পশ্চিমা গায়ক ছিলেন, যিনি যেমন খ্যাতনামা তেমনি আত্মম্ভরী। অন্যান্য গায়কদের প্রতি তিনি আসরে এমন একটা হেলাফেলার ভাব দেখাতেন যা দৃষ্টিকটু লাগত অনেকের কাছেই। গোপালচন্দ্রও মনে মনে ক্ষুব্ধ ছিলেন এই গায়কের ওপর। কারণ অনেক আসরে তাঁদের পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে, কিন্তু পশ্চিমা ওস্তাদ কখনো তাঁর গান শুনতে চান নি এবং প্রচ্ছন্ন অবহেলার ভাব দেখিয়েছেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় সেটি লক্ষ্য করেছেন এবং শিল্পীসুলভ অভিমান পোষণ করেছেন মনের সঙ্গোপনে। বাইরে তার কোন প্রকাশ ছিল না এবং মৌখিক আলাপ, সম্ভাষণ ইত্যাদি যথারীতি হত।

সেদিন যেন একটা সুযোগ পেলেন, এই ঘনিষ্ঠ পরিবেশের মধ্যে—হ্যাঁ, সামনাসামনি তাঁকে আক্রমণ করবার অর্থাৎ উৎকট অহমিকার জন্যে তাঁকে অপদস্থ করে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেবার ইচ্ছা গোপালবাবুর মনে জেগেছিল।

পশ্চিমা গায়কটিকে আসরে দেখেই তিনি তাঁর প্রথম গানটি কি গাইবেন তা নির্বাচন করলেন। তাঁর প্রায় অফুরন্ত সঙ্গীত-ভাণ্ডার থেকে একটি নিতান্ত অপ্রচলিত এবং অন্যের পক্ষে অপ্রাপ্য রাগের গান স্থির করে নিলেন মনে মনে।

আসর বসেছে সন্ধ্যার পরে। গাইতে অনুরুদ্ধ হয়ে তিনি প্রথমে সেই গানটি ধরলেন। গানখানির স্থায়ীর আরম্ভ হল—'প্রথম রাগ বোলো।' তার পর স্থায়ী কলিটি গেয়ে তার বিচিত্র অন্তরা ধরলেন—পাঁচ স্বর দো গ্রাম পনরহি মূরছনা'...ইত্যাদি।

অর্থাৎ এই রাগে পাঁচটি স্বর ও পনেরটি মূর্ছনা আছে এবং দুটি মাত্র গ্রামে এই রাগের সঞ্চরণ।

গান শেষ করে তিনি পশ্চিমাঞ্চলের সেই গায়ককে সম্বোধন করে চোস্ত হিন্দুস্থানীতে বললেন, 'এটা কি, আমায় অনুগ্রহ করে বলবেন?' অর্থাৎ গানের

রাগটির নাম তিনি জিজ্ঞেস করলেন, যে রাগের পাঁচটি স্বর আছে (অর্থাৎ দুটি স্বর-বর্জিত), দুটি গ্রাম আছে (অর্থাৎ তিন গ্রামের মধ্যে একটি একেবারে নেই, এমন শোনা যায় না) এবং পনেরটি মূর্ছনা !

এমন একটি অদ্ভুত রাগের নাম জানা বাস্তবিক পক্ষে বহু গায়কের পক্ষেই অসম্ভব। তবে সেই পশ্চিমা গায়ক ভারতপ্রসিদ্ধ এবং সত্যই একজন শীর্ষস্থানীয় সঙ্গীতবেত্তা। তাঁকে এমনভাবে প্রকাশ্য আসরে বহু গুণীর সামনে আহ্বান জানাতে বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় ভীত হলেন না। কারণ তাঁর স্থির ধারণা ছিল যে, উক্ত গায়কের পক্ষেও সম্ভব হবে না এর উত্তর দেওয়া। এটি গোপালচন্দ্রের গুপ্ত বিদ্যার সামিল। কারণ, যে সূত্রে এই গান তিনি লাভ করেছিলেন, সেই বিশেষভাবে রক্ষিত ধারার নাগাল পাওয়া ওই পশ্চিম ভারতের গায়কের পক্ষে কোনক্রমেই ঘটতে পারে না।

ওদিকে আসরের বিশিষ্ট শ্রোতৃবর্গ তাঁর এই অভিনব চ্যালেঞ্জ শুনে চমৎকৃত হলেন এবং নাটকের দুই প্রধান পাত্রের প্রতি অখণ্ড কৌতূহলে লক্ষ্য করতে লাগলেন। বিশেষ, অবাঙ্গালী গায়কের ওপর সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হল —কি নাম তিনি দেন এই অপ্রচলিত রাগটির ! এমন কোন রাগের পরিচয় তো তাঁরা আগে কেউ পান নি।

প্রশ্ন যাঁকে করা হয়েছে, তিনি ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে থেকে মুখে আপ্যায়নের হাসির প্রলেপ দিয়ে এবং উত্তরটি এড়িয়ে যাবার অছিলায় বললেন, 'ইয়ে তো বহুৎ কূট প্রশ্ন হ্যায়, লেকিন্ আপকো এ্যায়সা জবান্ কেইসে হুয়া ?' প্রশ্নটা তো বড়ই কূট দেখছি। কিন্তু আপনার এমন (চমৎকার হিন্দুস্থানী) উচ্চারণ কি করে হল (বাঙ্গালী হয়ে ?) ।

বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় তাঁর শেষের কথাটির উত্তর দিলেন, 'বাচ্‌পন্‌মে উস্তাদ লোগোঁসে কুছ্ ইলেম্ কিয়া।' (ছেলেবেলায় ওস্তাদ লোকদের কাছে কিছু শিখেছিলুম)।

কিন্তু নিজের আসল জিজ্ঞাস্যের উত্তর সেই পশ্চিমা সঙ্গীতজ্ঞের কাছে পেলেন না, আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও। শ্রোতারাও দেখলেন, গোপালচন্দ্রের প্রশ্নের জবাব দিতে এত বড় ধুরন্ধর গায়ক অপারগ হলেন।

বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় তখন জনান্তিকে 'আচ্ছা, বোঝা গেছে' বলে তাঁর পরের গান আরম্ভ করলেন।

ওস্তাদজীর অনেকদিন ধরে দেখানো উপেক্ষা আর আত্মম্ভরিতার জবাব সেদিন বেশ ভালভাবেই দিয়েছিলেন এবং শ্রোতাদের রীতিমত উপভোগ্য

হয়েছিল ব্যাপারটি।

আর একদিনের কথা। তবে এটি কোন আসরের ঘটনা নয় এবং এখানে কোন সঙ্গীতানুষ্ঠানও হয় নি। এখানে তিনি সেদিন সঙ্গীত বিষয়ে, সঙ্গীতের তত্ত্ববিষয়ে একটি উক্তি করেছিলেন যা উল্লেখযোগ্য। এবং ক্রুদ্ধ হয়ে বললেও সঙ্গীততত্ত্বের একটি পরম সত্য উচ্চারিত হয়েছিল তাঁর মুখে।

তখন একটি সঙ্গীত সম্মেলনের বার্ষিক অনুষ্ঠানের জন্যে তার কার্যকরী সমিতির বৈঠক বসেছিল। তিনিও সেখানে ছিলেন সমিতির এক সদস্যরূপে। সমিতির কার্য ও আলোচনা তখন শেষ হয়েছে। সভ্যরা এ-কথা সে-কথা বলাবলি করছেন নিজেদের মধ্যে। এমন সময় একজন বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়কে একটি প্রশ্ন করে বসলেন এবং প্রশ্নটি বিশেষ বুদ্ধিমানের মতন হল না।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, খেয়াল বড়, না, ধ্রুপদ বড়? আপনার কি মনে হয়?'

এমন একটি স্থূল প্রশ্ন যে ভদ্রলোক কি করে করলেন সভার দশজনের মধ্যে, তা ভাবতে আশ্চর্য লাগে। বিশেষ বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়ের তুল্য ধ্রুপদাচার্যকে একথা জিজ্ঞেস করা আদৌ বিবেচনার কার্য নয়। প্রশ্নটি অবান্তরও বটে।

খেয়াল টপ্পা ইত্যাদি অঙ্গে অল্পবিস্তর অভিজ্ঞ গোপালচন্দ্রের সঙ্গীতজীবন পরিণতি লাভ করেছিল ধ্রুপদের চর্চায় ও সাধনায়। প্রধানত তিনি ছিলেন ধ্রুপদগুণী। ধ্রুপদ সঙ্গীতের বিপুল ঐশ্বর্যে সম্পদশালী ও গরীয়ান, সব রীতির প্রকৃতি জানবার পর।

হঠাৎ এমন একটি প্রশ্ন শুনে তাঁর মেজাজটি চোট্ খেলে।

তিনি চটে উঠে নিজের বুকে একটি চাপড় মেরে চড়া গলায় বললেন, 'ধ্রুপদ হল বাপ!'

তার পর নাটকীয়ভাবে ডান হাতটি আন্দোলিত করে যোগ করলেন—'আর খেয়াল সব তার ব্যাটা।'

প্রশ্নকর্তা প্রাকৃত ভাষায় প্রাঞ্জল উত্তর পেয়ে অধোবদন হলেন। যথা কথা। খেয়ালের তুলনায় ধ্রুপদ বনিয়াদী। এখনকার রাগসঙ্গীতের ধ্রুপদই হল ভিত্তি। ধ্রুপদ থেকেই খেয়ালের উৎপত্তি। ধ্রুপদের ধীর গম্ভীর স্থাপত্য-কারুর ওপর অপেক্ষাকৃত গতিশীল বিস্তারে, দ্রুত লয়ের তান কর্তবে সমুচ্ছল খেয়াল কালের গতিকে জন্মলাভ করেছে। খেয়ালের জনক ধ্রুপদ। ধ্রুপদের এই গৌরবের আসন অনস্বীকার্য।

সক্রোধে এবং সংক্ষেপে বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় ধ্রুপদ খেয়ালের এই তাৎপর্য বুঝিয়ে দিলেন!

সুরের আসরে দুর্ঘটনা

সঙ্গীতকার ও সঙ্গতকারের সহযোগিতায় আসরে অপূর্ব সৌন্দর্যময় রসসৃষ্টি হয়ে থাকে। তেমনি আবার অনেক অপ্রীতিকর ও নাটকীয় ঘটনা ঘটে গেছে সুরের আসরে। এমন কি মারাত্মক দুর্ঘটনা পর্যন্ত। তিনটি আকস্মিক দুর্ঘটনার বৃত্তান্ত এখানে বর্ণনা করা হবে। সব ক'টিরই ঘটনাস্থল কলকাতা। তিনটি দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটে সঙ্গতকারের, এ এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

অবশ্য সব ক্ষেত্রেই যে রেষারেষির ফলে মৃত্যু ঘটেছে, তা নয়। আকস্মিক-ভাবে হৃদ্-ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া কিংবা করোনারি থ্রম্বসিসের (সেকালে রোগের নির্ণয় এ নামে না হলেও) মতন কোন কারণে বাদকের মৃত্যু হয়েছে, মনে হয়। সেই তিনটি কাহিনী একে একে বিবৃত করা হবে।

[১] হীরা বুল্‌বুল্‌ ও গোলাম আব্বাস

উনিশ শতকের এক সুপ্রসিদ্ধা গায়িকা ছিলেন হীরা বুল্‌বুল্‌। অসামান্য কণ্ঠমাধুর্যের জন্যে বুল্‌বুল্‌ শব্দটি তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় এবং সেই নামেই তিনি সুপরিচিতা ছিলেন সঙ্গীত-জগতে। সে আমলের গায়িকাদের মতন তিনিও ছিলেন বাঈ-শ্রেণীর এবং বিগত কালের অনেক সঙ্গীতনিপুণা বাঈজীদের মতন তিনি ধ্রুপদও গাইতেন। যেমন তাঁর পরবর্তীকালের শ্রীজান বাঈ এবং তাঁরও পরে গহরজান, আগ্রাওয়ালী মালকাজান প্রভৃতি ধ্রুপদ শুনিয়ে গেছেন আসরে। ধ্রুপদ গান তখন সঙ্গীতচর্চার ভিত্তি হিসেবে গণ্য হত।

হীরা বুল্‌বুল্‌ উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কলকাতায় বিখ্যাত ছিলেন। সঙ্গীতক্ষেত্র ছাড়া আর একটি কারণেও হীরার জন্যে এক আন্দোলন হয়েছিল রাজধানীতে। এবিষয়ে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে জানিয়েছেন, "হীরা বুল্‌বুল্‌ নামে প্রসিদ্ধ বারাঙ্গনা তখন কলিকাতা শহরে বাস করিত। ঐ হীরা বুল্‌বুল্‌ একজন পশ্চিম দেশীয় স্ত্রীলোক ছিল। হীরা শহরের অনেক ধনী ও পদস্থ লোকের সহিত সংসৃষ্ট হইয়াছিল। অনুমান করি ১৮৫২ সালের শেষে বা ১৮৫৩ সালের প্রারম্ভে হীরা

আপনার একটি পুত্রকে (নিজ গর্ভজাত কি পালিত, তাহা জানি না) তদানীন্তন হিন্দু কলেজে ভর্তি করিবার জন্য পাঠায়। ইহাতে বারাঙ্গনার পুত্রকে হিন্দু সন্তান বলিয়া কলেজে ভর্তি করা হইবে কি না, এই বিচার ওঠে।……এই বিষয় লইয়া তদানীন্তন এডুকেশন কাউন্সিল ও হিন্দু কলেজের ম্যানেজিং কমিটির মধ্যে মতভেদ ঘটে। সেই মতভেদ সত্ত্বেও বালকটিকে ভর্তি করাতে দেশীয় হিন্দু ভদ্রলোকদিগের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দত্ত-পরিবারের সুবিখ্যাত বংশধর রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয় সেই আন্দোলনের সারথি হইয়া, এই ১৮৫৩ সালের শেষে বা ১৮৫৪ সালের প্রারম্ভে হিন্দু মেট্রপলিটান কলেজ নামে এক কলেজ স্থাপন করেন। সিন্দুরিয়াপটিস্থ সুপ্রসিদ্ধ গোপাল মল্লিকের বিশাল প্রাসাদে এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতঃপূর্বে কাপ্তেন ডি. এল্. রিচার্ডসন এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি মহামতি (বীটন) বেথুন সাহেবের সহিত বিবাদ করিয়া গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগ হইতে অপসৃত হইয়াছিলেন। রাজেন্দ্রবাবু তাঁহাকে ঐ কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন।”

এই হীরা বুল্‌বুলের গানের আসর সেবার বসেছিল শোভাবাজার রাজবাড়িতে। তাঁর গানের সঙ্গে সঙ্গত করেন পাখোয়াজী গোলাম আব্বাস। সে আসরে দুর্ঘটনার কথা বলবার আগে গোলাম আব্বাসের একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। তখনকার স্বনামপ্রসিদ্ধ মৃদঙ্গবাদক গোলাম আব্বাস পশ্চিমা হলেও সুদীর্ঘকাল বাংলাদেশের সঙ্গীতক্ষেত্রে অবস্থান করেন। রামমোহন রায় তাঁর ১৮২৮ খ্রীঃ স্থাপিত ব্রাহ্মসমাজে গোলাম আব্বাসকে নিযুক্ত করেছিলেন কৃষ্ণপ্রসাদ ও বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখ গায়কদের সঙ্গে সঙ্গত করবার জন্যে। পরে গোলাম আব্বাস সঙ্গত-যন্ত্র শিক্ষা দেবার জন্যে কলকাতায় একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন বলেও জানা যায়।

হীরা বুল্‌বুল্ ও গোলাম আব্বাসের সেই শোভাবাজারের আসরে নিদারুণ দুর্ঘটনা ঘটে। বাজনা শেষ করবার পরেই সেখানে মৃত্যু হয় গোলাম আব্বাসের। কেন ও কিভাবে আসরে তাঁর আকস্মিক জীবনাবসান ঘটেছিল তার দুটি বিবরণ পাওয়া যায়। একটি জনশ্রুতি এবং আর একটি, সেকালের এক সঙ্গীতজ্ঞের লেখা বিবরণ। দুটিই এখানে উল্লেখ করা হল। মুখে মুখে প্রচলিত কাহিনীটি এইরকম শোনা যায়ঃ সে আসরে হীরা বুল্‌বুলের গানের সঙ্গে পাখোয়াজ বাজাবার আমন্ত্রণ যখন গোলাম আব্বাস পেলেন, প্রথমে নাকি তিনি সম্মত হন নি। বাঈজীর গানের সঙ্গে সঙ্গত করলে তাঁর মর্যাদার হানি হবে, এমন মন্তব্য করেও উদ্‌যোক্তাদের আহ্বানে আসরে যোগ দেন শেষ পর্যন্ত।

কিন্তু এই বিশেষ শ্রেণীর গায়িকার সম্বন্ধে তাঁর কটু মতামত কোন ব্যক্তির মাধ্যমে হীরার কানে পৌঁছেছিল। তারই প্রতিক্রিয়ায় হীরা নাকি আসরে এমন কূট তাল-লয়ে ধ্রুপদ গেয়েছিলেন যে, প্রথমে গোলাম আব্বাস সঙ্গত করতে পারেন নি। পরে হীরা নিজের বাঁ-পায়ে ঠুকে সম দেখিয়ে দেওয়ায় সঙ্গত আরম্ভ করেন তিনি। এবং বাজনা শেষ হবার পরই এই প্রচণ্ড অপমানের জ্বালায় গোলাম আব্বাসের সেই আসরে মৃত্যু ঘটে।

গোলাম আব্বাসের মৃত্যুর অন্য এক কারণ জানা যায় বিখ্যাত মৃদঙ্গী গোপালচন্দ্র মল্লিকের বিবরণী থেকে। মৃদঙ্গাচার্য মুরারিমোহন গুপ্তের শিষ্য গোপালচন্দ্রের কথা পাখোয়াজী কেশবচন্দ্র মিত্রের প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। গোপালচন্দ্রের আর একটি পরিচয় ছিল—তিনি মনীষী কৃষ্ণদাস পালের শ্বশুর। মল্লিক মহাশয়ের ওই বিবরণ কিন্তু মুদ্রিত নয়। তাঁর বোল্ ইত্যাদি সংগ্রহের খাতায়, সেকালের সঙ্গীতজ্ঞদের নানা প্রসঙ্গ কথার এক স্থানে তিনি লিখেছেন যে—গোলাম আব্বাস পাখোয়াজী শোভাবাজার রাজবাড়ির আসরে হীরা বুল্‌বুলের সঙ্গে বাজাবার পরে সর্দিগর্মিতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর মৃত্যুর কারণ নিয়ে অনেক গুজবের সৃষ্টি হয়, কিন্তু সেসব সত্য নয়। সর্দিগর্মিতেই গোলাম আব্বাসের মৃত্যু হয়েছিল, ইত্যাদি।

এই দুটি বিপরীত বিবরণের মধ্যে কোন্‌টি সঠিক বলা শক্ত। সেজন্য দুটি বৃত্তান্তই দেওয়া হল, পাঠক-পাঠিকাদের বিবেচনার জন্যে। লেখকের মনে হয়, গোপাল মল্লিকের মতামত সত্য হতে পারে। কিংবদন্তীটি মুখে মুখে পল্লবিত কাহিনী বোধ হয়। কারণ পরে যে দুর্ঘটনার বর্ণনা করা হবে তাতে দেখা যাবে যে, আধুনিককালেও এমন একটি ঘটনাকে উপলক্ষ করে কি রকম অলীক গুজবের সৃষ্টি হয়েছিল।

[২] দর্শন সিং

দ্বিতীয় দুর্ঘটনার স্থান হল ১।১ প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট, টপ্-খেয়াল-গায়ক লালচাঁদ বড়ালের বাড়ি। লালচাঁদ তখন স্বর্গত। তাঁর সঙ্গীতজ্ঞ পুত্রেরা যে-সব জলসার আয়োজন মাঝে মাঝে তাঁদের বাড়িতে করতেন, তারই একদিনের ঘটনা। 'লালচাঁদ উৎসব'-এর কোন দিনের কথা নয়, অন্য একটি আসর।

১৯২৩-এর ডিসেম্বর কিংবা ১৯২৪-এর জানুয়ারীর এক রাত্রে সেখানে জলসা বসেছে। উপস্থিত গায়ক-বাদকদের মধ্যে আছেন—ইন্দোরের বীণ্‌কার মজিদ খাঁ, বীণ্‌কার ও গায়ক লছমীপ্রসাদ মিশ্র, সরোদবাদক হাফিজ আলী খাঁ,

তবলাবাদক দর্শন সিং প্রভৃতি।

রাত তখন দ্বিতীয় প্রহর। এবার হাফিজ আলী খাঁ সরোদ বাজাবেন, তবলায় সঙ্গত করবেন দর্শন সিং। হাফিজ আলী সে-সময় সঙ্গীত জগতে এতখানি প্রসিদ্ধি লাভ করেন নি। তিনি তখন যুবক, বয়স ত্রিশের সামান্য বেশি। খুব বিখ্যাত না হলেও, তাঁর অপূর্ব মিষ্ট ও তৈরি হাত এবং গুণপনার জন্যে তিনি সঙ্গীতজ্ঞ মহলে পরিচিত হয়েছেন। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, তাঁকে কলকাতার সঙ্গীত-রসিক সমাজে আসন নিতে অনেকখানি সাহায্য করেন উক্ত বড়াল ভ্রাতারা।

তবলিয়া দর্শন সিং-এর পরিচয় অন্ধ-গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে'র প্রসঙ্গে দেওয়া হবে। সেজন্যে এখানে আর সেসব উল্লেখ করা হল না। এই আসরের সময়ে তিনি কলকাতার সঙ্গীত-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সবিশেষ প্রসিদ্ধ। বয়স তখন ষাট পার হয়ে গেছে "সঙ্গীত সঙ্ঘ"র তবলা-শিক্ষক দর্শন সিং-এর।

সেদিন সিংজীর শরীর তেমন ভাল ছিল না। বাজাবেন কি না একথাও কেউ কেউ জিজ্ঞেস করেছিলেন। বাজাতে রাজী হন্ তিনি হাফিজ আলীর সঙ্গে, শ্রোতাদের খানিক আনন্দ দেবার কথায়।

হাফিজ আলীর সরোদের সঙ্গে তাঁর তবলা বাজনা আরম্ভ হল। প্রথম দুর্ঘটনার কিংবদন্তীর মতন এখানে কোন কারণ অবশ্য দেখা দেয় নি। অর্থাৎ দুই গুণীর মধ্যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব ছিল না। সুতরাং বাজনা জমল ভালই। খাঁ সাহেবের সুমিষ্ট সুরলহরীর সঙ্গে দর্শন সিং-এর "সাথ্ সঙ্গত" আসরের সকলে বেশ উপভোগ করতে লাগলেন। বাজনা চলল প্রায় এক ঘণ্টা।

তার পর যথারীতি তাঁদের অনুষ্ঠান শেষ হল। হাফিজ আলী একটি তেহাই দিলেন এবং তবলাতেও একটি জবাবী তেহাই মেরে উপসংহার করলেন সিংজী।

পরমুহূর্তেই বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। দর্শন সিং তবলায় শেষ ঘা দিয়েই অকস্মাৎ ঢলে পড়লেন। তাঁর একপাশে বসেছিলেন লছমীপ্রসাদ, অন্যদিকে রাইচাঁদ বড়াল। দর্শন সিং তাঁর ওপর হেলে পড়তে আচমকা ভয় পেয়ে লছমীপ্রসাদ তাঁকে ঠেলে দিলেন রাইবাবুর দিকে। দর্শন সিং-এর দেহ রাইবাবুর কোলে ঢলে পড়ল—বাক্যহীন, স্পন্দনহীন। সেই মুহূর্তে লছমীপ্রসাদ বা রাইবাবু বা আসরের অন্য কেউ ভাবতেই পারেন নি যে, দর্শন সিং আর ইহলোকে নেই! এ যে অভাবিত ব্যাপার। যে সমর্থ মানুষ এক ঘণ্টা তবলা

বাজালেন প্রেমের সঙ্গে এবং যে বাজনার লয়ও এমন কিছু দ্রুত ছিল না, তিনি তেহাই মারবার পরই মৃত্যুমুখে পড়বেন, এমন ধারণা করা কারও পক্ষেই সম্ভব হয় নি।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সকলে বুঝতে পারলেন সেই শোচনীয় দুর্ঘটনার কথা। আসরে হুলুস্থুল পড়ে গেল। ডাক্তার নিয়ে আসা হতে তিনি পরীক্ষা করে জানালেন যে, দর্শন সিং-এর ইতিপূর্বেই মৃত্যু ঘটেছে।

ব্যাপারটি অতিশয় দুঃখের। কিন্তু দর্শন সিং-এর দিক্ থেকে দেখলে বলা যায়—শিল্পীর আদর্শ মৃত্যু! সঙ্গীতের আসরে বসে সঙ্গীত সাধকরূপে আপনার কর্তব্য জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সজ্ঞানে মাত্রায় মাত্রায় পালন করে ইহজগৎ থেকে তিনি বিদায় নিলেন। সঙ্গীতশিল্পীর পক্ষে এর চেয়ে কাম্য মৃত্যু আর কি হতে পারে?

এই আকস্মিক দুর্ঘটনার কথা কিন্তু গুজব-বিলাসীদের দ্বারা পল্লবিত হয়ে একটি মুখরোচক কাহিনীতে পরিণত হল। সেই অলীক কিংবদন্তী এখনও কোন কোন ব্যক্তির মুখে শোনা যায়ঃ যুবক হাফিজ আলী বৃদ্ধ দর্শন সিংকে আসরে জব্দ করবার জন্যে প্রচণ্ড দ্রুত লয়ে সেদিন বাজিয়েছিলেন এবং সেই দ্রুত সঙ্গত করতে গিয়ে প্রাণান্ত হয় সিংজীর, ইত্যাদি।

এই গুজব কলকাতার কোন কোন সঙ্গীত-মহলে এমন বিস্তার লাভ করে যে, হাফিজ আলী আসরে বাজাবার সময়ে ঠেকা দেবার তবল্‌চি পেতেন না বেশ কিছুদিন। হয়তো মুজরো এসেছে, কিন্তু সঙ্গতীর অভাবে তিনি সে আসরে যোগ দিতে পারতেন না। অনেক সময় তিনি রাইচাঁদবাবুকে (ওস্তাদ মসিদ খাঁর শিষ্য) তাঁর সঙ্গে বাজাতে অনুরোধ করতেন এবং এইভাবে তাঁর মহ্‌ফিল্ সম্ভব হত। এমন অকারণ বদনাম রটেছিল সরোদী হাফিজ আলী খাঁর।

[৩] দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য

দুর্লভচন্দ্রের সঙ্গীত-জীবনের কিছু পরিচয় দেওয়া হয়েছে 'তালাধ্যায়ে দুর্লভচন্দ্র' অধ্যায়ে। এখানে বলা হবে তাঁর শেষ বাজনার আসরের কথা। তাঁর মৃত্যুর স্মরণীয় প্রসঙ্গ।

নিখিলবঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন-এর প্রতিষ্ঠাতা, সঙ্গীতপ্রেমী ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের পাথুরিয়াঘাটার (৪৬) বাড়িতে তৃতীয় দুর্ঘটনা ঘটে। ১৯৩৮ খ্রীঃ (১৩৪৫ সালের ২৪শে আশ্বিন) তাঁর ভবনের দোতলার ঘরে সেদিন সন্ধ্যার পর গানের আসর বসেছে। উপস্থিত আছেন ধ্রুপদী গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,

ধ্রুপদী অমরনাথ ভট্টাচার্য, গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, কৃষ্ণচন্দ্র দে, নাটোর মহারাজা যোগীন্দ্রনাথ রায়, মৃদঙ্গাচার্য দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য, তবলা-গুণী হীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, অযোধ্যা পাঠক প্রভৃতি। সেদিনের আসরে দুর্লভচন্দ্রই ছিলেন প্রধান সঙ্গতকার।

প্রথমে অমরনাথ ভট্টাচার্য, তার পর গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানের সঙ্গে বাজাবার পর দুর্লভচন্দ্র মধুরকণ্ঠ ধ্রুপদী ললিতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সঙ্গত আরম্ভ করলেন। ললিতচন্দ্র হলেন রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী-শিষ্য মহীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র এবং কণ্ঠমাধুর্যের জন্যে স্মরণীয় গায়কদের অন্যতম। ললিতচন্দ্র প্রথমে পিতার এবং পরে রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর শিক্ষায় সঙ্গীত-জীবন গঠিত করেন।

ললিতচন্দ্র প্রথমে সে আসরে গাইলেন চৌতালে 'হে আদি অন্ত।' দুর্লভচন্দ্র বাজালেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নিপুণ রীতিতে। আসর সুরে, মৃদঙ্গের মেঘমন্দ্রধ্বনিতে ভরে উঠল। ললিতবাবু তার পর ধরলেন সুর ফাঁকতালে দরবারী কানাড়া—'বাজত ঝাঁঝ মৃদঙ্গ।'

তাঁর মধুকণ্ঠের সঙ্গে দুর্লভচন্দ্রের পাখোয়াজ মিলে আসর তখন জমজমাট।

হঠাৎ, যাঁরা ভট্টাচার্য মহাশয়ের সামনে বসেছিলেন, তাঁদের চোখে পড়ল—তিনি শুধু বাঁ-হাতে বাজাচ্ছেন। কিন্তু তাঁরা কেউ ভাবতে পারেন নি যে, দুর্লভচন্দ্রের ডান হাত তখন সম্পূর্ণ বিবশ হয়ে পড়েছে এবং সেজন্যেই তিনি কেবল বাঁ-হাতে ঠেকা দিচ্ছেন। তার পরই তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়লেন একেবারে। টলে পড়বার আগে জড়িতস্বরে শেষ কথা উচ্চারণ করেছিলেন—'বাজাও।'

অকস্মাৎ তাঁকে জ্ঞানহারা হয়ে লুটিয়ে পড়তে দেখে ললিতচন্দ্র বিমূঢ় হয়ে গান থামিয়ে ফেললেন। হায় হায় করে উঠলেন শোকবিহ্বল অনেক শ্রোতা। সুরের শান্ত আনন্দময় আসরে যেন বজ্রপাত হল। ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ তৎপর হয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের আনালেন অবিলম্বে। কোন কিছুরই ত্রুটি হল না। কিন্তু দুর্লভচন্দ্রের জ্ঞান আর ফিরে এল না। সেখানেই ২৮ ঘণ্টা জ্ঞানশূন্য অবস্থায় থাকবার পর শেষ নিঃশ্বাস পড়ল তাঁর। জ্ঞানের শেষ ক্ষণ পর্যন্ত মৃদঙ্গ-সাধনায় নিমগ্ন থেকে ভট্টাচার্য মহাশয় অনন্ত ছন্দ-লোকে প্রয়াণ করলেন।

মেরি নাম জান্‌কী বাঈ ছপ্পন ছুরি

আগেকার আমলের রেকর্ডে শিল্পীদের নিজ কণ্ঠে নাম ঘোষণা করবার একটা রেওয়াজ ছিল। রেকর্ডের গান বা বাজনা শেষ হয়ে যাবার পর হঠাৎ শোনা যেত শিল্পীর নাম, তাঁরই নিজের গলায়। রেকর্ড-সঙ্গীতের প্রথম যুগে যখন রেকর্ড করা হত চোঙার সাহায্যে, তখন এইভাবে প্রতি রেকর্ডে শিল্পীর নাম চিহ্নিত করবার নাকি দরকার হত। রেকর্ডগুলির labelling-এর সময় যেন কোন গোলমাল বা নামের ওলট-পালট না হয়ে যায় সে-জন্যেই ছিল এই সাবধানতা। সেই সঙ্গে শিল্পীদের নিজের কণ্ঠ বা নামকে চিরস্মরণীয় রাখবার আকাঙ্ক্ষাও হয়তো থাকতে পারে। তবে পরবর্তী কালে রেকর্ডিং-এর যান্ত্রিক উন্নতি ভালভাবে হওয়ার পর থেকে ওইভাবে নিজের নাম ঘোষণা করার প্রথাটি ক্রমে লোপ পেয়ে যায়। এমন কি, যে-সব পুরনো রেকর্ডে নাম ঘোষণা ছিল, তাদের নতুন মুদ্রণের সময়ে নামের অংশ বর্জন করা হয়। আর সে-সব শোনা যাবে না কোনদিন। (উত্তরকালের রেকর্ডে স্বকণ্ঠে নাম ঘোষণা যে একেবারে রহিত হয়ে যায়, তা নয়। তবে তখন তা কদাচিৎ ঘটত।)

কিন্তু আগেকার সেই রেওয়াজটি মন্দ ছিল না। যিনি যন্ত্রবাদক তাঁর কণ্ঠস্বরের একটি অবিকল নিদর্শন ভবিষ্যৎ কালের আগ্রহী শ্রোতাদের জন্যে থেকে যেত। যাঁরা গান গেয়েছেন তাঁদের স্বকণ্ঠে নিজেদের নাম উচ্চারণ শুনতে অনেক সময় ভালই লাগত। এই স্থায়ী শ্রুতির মূল্য খুবই বেশি। তা ছাড়া, সঙ্গীতের শেষে শিল্পীর নিজের গলায় নামটি শুনলে বেশ একটি অন্তরঙ্গ পরিবেশ সৃষ্টি হত। শ্রোতাদের তা উপরি পাওয়া লাভ।

সেতার-সুরবাহার-সাধক ইম্‌দাদ খাঁর মিষ্টি হাতের বাজনার রেকর্ড আছে —দরবারী কানাড়া, সোহিনী, জৌনপুরী তোড়ি, বেহাগ প্রভৃতি। সেই সব বাজনার শেষে জোর গলায় শোনা যেত—'ইম্‌দাদ খাঁ'। সেকালের একজন খ্যাতনাম্নী খেয়াল-ঠুংরি গায়িকা, কিরাণা ঘরানার জোহ্‌রা বাঈয়ের রেকর্ডে গানের পরে মর্দানা ঢং-এর গলায় ধ্বনিত হত—'মেরি নাম জোহ্‌রা বাঈ আগ্রাওয়ালী।' কলকাতার সুপরিচিতা বাঈজী গহ্‌রজান্ বাংলা গানের রেকর্ডেও ইংরেজীতে নাম ঘোষণা করতেন ('যদি নিমিষের দেখা পাই তোমারি' কিংবা 'হরি বল মন রসনা'র পরে)—'My name is Gahar Jan'।

তাঁদের পরের যুগে, এনায়েৎ খাঁর সেই সুরবাহারে মনোহারী বাগেশ্রী আলাপের পর শোনা যেত—'প্রোফেসর এনায়েৎ হোসেন খাঁ সেতারিয়ে।'…এমনি আরও কত সঙ্গীত-শিল্পীর নাম সেই অতীত যুগের স্মৃতির বার্তা এনে দিত।

আর শোনা যেত নারী-কণ্ঠে এক অদ্ভুত নাম—জান্‌কী বাঈ ছপ্পন ছুরি। মল্লার রাগে একটি হিন্দুস্থানী গানের রেকর্ড, তাল সেতারখানি (১৬ মাত্রার আদ্ধা কাওয়ালীরই অনুরূপ ত্রিতালী)। এই রেকর্ডের শেষ দিকে গায়িকা এক অশ্রুতপূর্ব নাম ঘোষণা করেছেন—'মেরি নাম জান্‌কী বাঈ ছপ্পন ছুরি।'

কে সেই জান্‌কী বাঈ এবং কেনই বা তাঁর নামের সঙ্গে এই অদ্ভুত বিশেষণ?

পশ্চিমাঞ্চলের পেশাদার গায়িকা জান্‌কী বাঈ পঞ্চাশ বছর আগে সঙ্গীতের আসরে এবং রেকর্ড-সঙ্গীতের জগতে সুপরিচিতা ছিলেন। কলকাতার কোন কোন ঘরোয়া সঙ্গীতসভায় কিংবা বাগান-বাড়ির আসরেও মহ্‌ফিল করেছেন তিনি। ১৯১৮ সালে কালুরাম পোদ্দারের বন-হুগলীর বাগান-বাড়িতে (এটি তার আগে ছিল মসজিদবাড়ি স্ট্রীটের বিখ্যাত সঙ্গীতপ্রেমী গুহ-পরিবারের) জান্‌কী বাঈয়ের একটি বড় আসরের কথা জানা যায়। কালুরাম ছিলেন বিখ্যাত বণিক কেশোরাম পোদ্দারের (মেটিয়াবুরুজে যাঁর নামের কটন মিল এখন বিড়লা পরিবারের স্বত্বাধীন) ভ্রাতা। সেই সব সময়ে জান্‌কী বাঈয়ের ওই নামের তাৎপর্য সঙ্গীতসমাজের কেউ কেউ জানতেন।

তারও কয়েক বছর আগে তিনি বাস করেন দ্বারবঙ্গ রাজ্যে। যুক্তপ্রদেশের কোন জায়গা থেকে এসে তিনি দ্বারবঙ্গ-রাজ লক্ষ্মীশ্বর সিংহের নতুন বাজারের সেই প্রকাণ্ড একতলা ব্যারাক বাড়িতে জোহ্‌রা বাঈ নামে আর একজন গায়িকার সঙ্গে বছর দুয়েক ছিলেন। মহারাজা লক্ষ্মীশ্বরের আনুকূল্যে তখন তিনি ভালভাবে তালিমও পান সেখানে, ওস্তাদ মৌলা বখ্‌সের অধীনে। এই মৌলা বখ্‌স্ বরোদার নন, যিনি কলকাতায় এসেছিলেন 'হিন্দুমেলা'র যুগে। এই মৌলা বখ্‌স্ দ্বারবঙ্গে অবস্থানের সময় জান্‌কী বাঈয়ের সঙ্গে জোহ্‌রা বাঈকেও সঙ্গীত-শিক্ষা দেন।

সেখানে বাসের সময়ে জান্‌কী বাঈয়ের তেমন নাম হয় নি গায়িকা হিসেবে। কিন্তু নতুন বাজারে সেই একতলা ব্যারাক বাড়িতে থাকবার সময় তাঁর গান সেখানকার লোকেরা সহজেই শুনতে পেতেন এবং তাঁকে একজন উৎকৃষ্ট গায়িকা বলে সকলের ধারণা হয়। তিনি যে-ঘরে রেওয়াজ করতেন, সেটি ছিল বাড়ির বাইরের দিকে। তা ছাড়া, বাড়িটি একতলা এবং বাড়ির সামনে মাঠ থাকায় যে-কেউ ইচ্ছা করলে বাড়ির সামনে মাঠে বসে তাঁর গান শুনতে

পেতেন। সন্ধ্যার পর তিনি প্রায় প্রতিদিন বাইরের ঘরে রেওয়াজ করতেন, মৌলা বখ্‌স্ তাঁকে শেখাতে আসতেনও সেই ঘরে।

ঘরের সামনে ফুটবল খেলার মাঠ, তার ধারে বসলে পরিষ্কার শোনা যেত জান্‌কী বাঈ মিষ্টি গলায় গান ধরেছেন। ওস্তাদ শিখিয়ে গেছেন, সেইটিই হয়তো রেওয়াজ করছেন বসে। কোনদিন হয়তো সে ঘর থেকে ভেসে আসে বাগেশ্রীর করুণ, মায়াময় সুরের বিস্তার। তার প্রাণ-কাঁদানো, মর্ম-ছেঁড়া মোচড়গুলিও স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যায় জান্‌কী বাঈয়ের গলার খোলা আওয়াজে।

তাঁর নামের যে অংশটি নিয়ে তাঁর প্রসঙ্গ আরম্ভ করা হয়েছে, তা তখনও তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত ছিল। অর্থাৎ দ্বারবঙ্গে আসবার আগেই ওই অনন্য নামটির জন্ম। এবং সেখানকার কোন কোন ব্যক্তি জান্‌কী বাঈয়ের নাম-মাহাত্ম্য, আর তার খ্যাতি বা অখ্যাতির রহস্য জানতেন। যথা, ওস্তাদ আসঘর আলী খাঁর জামাতা সরোদবাদক আবদুল আজিজ, যাঁদের কথা "খাম্বাজ থেকে ভৈরবী"তে বলা হয়েছে।

জান্‌কী বাঈয়ের প্রথম জীবনের সেই ঘটনার কাহিনী এইভাবে জানান আবদুল আজিজ: রীতিমত সঙ্গীত-চর্চা আরম্ভ করবার আগে জান্‌কী বাঈয়ের জীবনে এক সময় দুজন প্রণয়ীর আবির্ভাব ঘটে। দুজনের প্রতি সমব্যবহার বেশিদিন প্রদর্শন করতে পারেন নি বাঈজী। একজনের ওপর পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ হয়ে যায়। তখন ব্যর্থপ্রেমিক একদিন ভীষণ আক্রোশে ছুরি নিয়ে আক্রমণ করে—প্রতিদ্বন্দ্বীকে নয়—প্রণয়িনীকেই। তার ছুরির আঘাত নাকি ৫৬ বার জান্‌কী বাঈয়ের শরীরে পড়ে। বাঈজী কোনরকমে প্রাণরক্ষা করেন সেই পৌনঃপুনিক ছুরিকাঘাত থেকে। নাটকের পরিসমাপ্তি ওইখানেই ঘটে, তার জের আর চলে নি। কিন্তু তার পর থেকে তাঁর নাম হয়ে যায়—জান্‌কী বাঈ ছপ্পন ছুরি। অন্যেরা তার এই নাম প্রচার করে নি, তিনি নিজেই (সগৌরবে?) এই নামে নিজেকে চিহ্নিত করেছেন। না হলে বাইরের লোকের একথা জানবার নয়।

ঘটনাটির সত্য-মিথ্যা জানবার উপায় নেই। ছাপ্পান্ন বার ছুরিকাহত হলে কোন মানুষ, বিশেষ নারী, কি প্রাণ রাখতে পারে? বারাঙ্গনার সহ্যশক্তি কি অমানুষিক? কে জানে! কিংবা হয়তো সেই ছুরি চালনা বাংলা সংবাদপত্রের পুলিসের মৃদু লাঠি চালনার মতন কিছু?

আবার কেউ কেউ বলেন, ছাপ্পান্ন ছুরি কথাটির অন্য তাৎপর্য আছে।

'ছপ্পন্ ছুরি' নাকি মারণ প্রক্রিয়ার একটি তুক। এবং অতি শক্তিশালী তুক। কোন লোকের প্রাণনাশের চেষ্টায় নাকি ৫৬টি ছুরি মন্ত্রঃপূত করে সেই ব্যক্তির বাড়ির কোথাও গোপনে রেখে দেওয়া হত এবং কালক্রমে তুকের প্রভাবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির ওপর মারণ-ক্রিয়া ঘটত। কোন কোন মতে, জান্‌কী বাঈয়ের ওপর ওই রকম ছপ্পন্ ছুরি-র তুক প্রয়োগ করা হয়েছিল। এ বিষয়ে সঠিক কিছু জানতে পারা যায় না।

তবে জান্‌কী বাঈয়ের সেই হতাশ প্রেমিক ছপ্পন্ ছুরির তুক-তাকেও প্রণয়িনীর বিশেষ ক্ষতি বোধ হয় করতে পারে নি। কারণ, শোনা যায়, জান্‌কী বহু বছর জীবিত থাকেন এবং বাস করেন এলাহাবাদে। শুধু তাই নয়, তিনি নাকি উত্তরজীবনে বিবাহ করে পর্দানসীন হয়ে যান। তাঁকে বিবাহ করেছিলেন সেই সফল প্রণয়ী কিংবা অন্য কোন উদারপন্থী, তা অবশ্য জানা যায় না।

সে যাই হোক, সঙ্গীতজ্ঞ মহলে তিনি উত্তরজীবনে আত্মবিঘোষিত 'জান্‌কী বাঈ ছপ্পন্ ছুরি' নামেই সুপরিচিতা হয়েছিলেন। একাধিক জান্‌কী বাঈ এই পেশার ক্ষেত্রে সেকালে থাকার জন্যে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে হয়তো নীলকণ্ঠীর মতন এই বিশেষণটি নামাঙ্গে ধারণ করতে হয় তাঁকে!

তাই সেই মল্লারে মাধুর্যময় 'রুম্ ঝুম বাদরিয়া বরষে' গানখানির শেষে বায়ুতরঙ্গে স্বরধ্বনির কম্পন জাগায়—মেরি নাম জান্‌কী বাঈ ছপ্পন্ ছুরি!

সুরের আকাশে নতুন চন্দ্র

সেকালে, অর্থাৎ সঙ্গীত সম্মেলন ইত্যাদির যুগ আরম্ভ হবার আগে, ঘরোয়া আসরেই সঙ্গীতগুণীরা তাঁদের গুণপনার পরিচয় দিতেন। তখনকার কলকাতায় কয়েকটি বাড়ির জলসায় উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীতানুষ্ঠান হত। সেই সব ঘরোয়া আসরে লব্ধপ্রতিষ্ঠ কলাবতেরা যেমন তাঁদের মুন্সীয়ানা দেখাতেন, তেমনি উদীয়মান সঙ্গীতজ্ঞরা সেখানকার বোদ্ধাদের স্বীকৃতি লাভ করে প্রতিষ্ঠা পেতেন সঙ্গীত সমাজে। ক্রমে বৃহত্তর সঙ্গীত জগতে তাঁরা সুপরিচিত হতেন। সেদিক থেকে ঘরোয়া আসরগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল সঙ্গীতচর্চার শ্রীবৃদ্ধিতে।

এই সমস্ত ঘরোয়া আসর ছিল ধনী সঙ্গীতপ্রেমী ব্যক্তিদের নিজস্ব সঙ্গীত-সভা। কলকাতায় এবং বাংলাদেশের নানা অঞ্চলে সমগ্র উনিশ শতক

ধরে এই সঙ্গীতাসরগুলিতে উচ্চমানের সঙ্গীতচর্চা পুষ্টিলাভ করে। বাংলার অভিজাত ও নবোত্থিত দুই শ্রেণীর ধনীর গৃহেই সঙ্গীতসভা একটি আবশ্যিক অঙ্গ হয়ে বিদ্যমান ছিল। তাঁদের আনুকূল্যে গুণীরা সঙ্গীতসাধনার সুযোগ পেতেন এবং ফলে সঙ্গীতচর্চাও সঞ্জীবিত থাকত। উনিশ শতকের এই সব সঙ্গীতসভার ধারা বিংশ শতকের প্রথম যুগ পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে এসেছে এবং বিগত কালের সঙ্গীতসম্পদের উত্তরাধিকার লাভ করেছে বর্তমান কালের সমাজ।

এমন অনেক আসর সেকালে বাংলাদেশে ছিল। বলা যায়, খুব কম ধনী-গৃহেই সঙ্গীত-সভা ছিল না। তখনকার সম্পন্ন পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে আবার কেউ কেউ নিজেরাই ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ এবং রীতিমত সঙ্গীতচর্চা করে সম্মানিত হন গুণী বলে। কেউ কণ্ঠসঙ্গীত-সাধক, কেউ বা যন্ত্রী। যেমন, শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর (সেতার গুণী), সাতুবাবু নামে সুপরিচিত আশুতোষ দেব (সেতার শিল্পী), পাথুরিয়াঘাটার হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (ধ্রুপদী ও বীণ্‌কার), বিডন স্ট্রীটের অতুলচাঁদ মিত্র (সেতারী), শ্রীরামপুরের গোস্বামী পরিবারের রামদাস গোস্বামী (ধ্রুপদী), ঠন্‌ঠনিয়ার শ্রীরাম চক্রবর্তী (পাখোয়াজী), ভবানীপুরের কেশবচন্দ্র মিত্র (পাখোয়াজী), শোভাবাজারের বিনোদকৃষ্ণ মিত্র (ধ্রুপদী), এণ্টালির ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেব (ধ্রুপদী) প্রভৃতি।

সেকালের কলকাতার সমস্ত উচ্চাঙ্গের ঘরোয়া আসরের নাম করা সম্ভব নয়, সকলের নাম জানাও অসম্ভব। মাত্র কয়েকটি আসরের স্থান এখানে উল্লেখ করা হল: পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরগোষ্ঠীর (গোপীমোহন ঠাকুরের সময় থেকে) আসর, শোভাবাজার রাজ-পরিবারের (রাজা নবকৃষ্ণের আমল থেকে) দরবার, পাইকপাড়ার সিংহ-বংশের সঙ্গীতাসর, মসজিদ বাড়ির গুহ পরিবারের (অম্বুবাবুর কাল থেকে) সঙ্গীত-সভা, শিমুলিয়ার সাতুবাবু লাটুবাবুদের আসর, এণ্টালির দেব-গৃহের সভা, বৌবাজারের মতিলাল বাড়ির আসর, হিদারাম ব্যানার্জী লেনের দেওয়ান বাড়ির সঙ্গীত-সভা, পাথুরিয়াঘাটার হরকুটিরের আসর, তারকনাথ প্রামাণিকের বাড়ির আসর, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি, ওয়েলেস্‌লি স্ট্রীটের মহিষাদল ভবন, ঠন্‌ঠনিয়ার চক্রবর্তী বাড়ি, শিমুলিয়ার কৈলাস বসুর বাড়ি, গড়পারের নিবারণ দত্তের বাড়ি, ভবানীপুরের কেশব মিত্র ও রূপচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি, এল্‌গিন রোডের নাটোর ভবন, জোড়াসাঁকোর (রাজা) দুনী শীলের (পরে হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীলের) আসর, পাথুরিয়াঘাটার সিদ্ধেশ্বর ঘোষ ও ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষের সভা, বড়বাজার অঞ্চলের গোবিন পিঠী ও দম্‌দমার দুলীচাঁদের আসর, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীটে তাঁর বংশধরদের বাড়ি, ইত্যাদি।

কলকাতার বাইরের এই ধরনের ঘরোয়া আসরের কয়েকটি ছিল—মজিলপুরের দত্তবাড়ি, রানাঘাটের পালচৌধুরী ভবন, গোবরডাঙ্গার মুখোপাধ্যায়-গৃহ, শ্রীরামপুরের গোস্বামী ভবন, উত্তরপাড়ার প্রেমনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি প্রভৃতি। তা ছাড়া, ময়মনসিংহ, গৌরীপুর, মুক্তাগাছা, তালন্দ, ভাওয়াল, হেতম্‌পুর, কাশীপুর, বিষ্ণুপুর প্রভৃতির ভূস্বামী এবং বর্ধমানরাজ, নদীয়ারাজ, ত্রিপুরারাজ, মুর্শিদাবাদ ও ঢাকার নবাব প্রভৃতির দরবার। তবে সে সব আসরে সঙ্গীতামোদী সাধারণের প্রবেশ ছিল না।

কলকাতার উচ্চশ্রেণীর আসরগুলির মধ্যে আর-একটি ছিল বৌবাজারের বেচারাম চন্দ্র মহাশয়ের বাড়িতে। ২৩, ওয়েলিংটন স্ট্রীটে (এখনকার নির্মলচন্দ্র স্ট্রীট)। নির্মলচন্দ্রের খুল্লতাত ছিলেন বেচারাম চন্দ্র। তাঁর বাড়ির আসর এই শতকের প্রথম দিকে হত। এই আসরের সময়ে জোড়াসাঁকোর হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীলের জল্‌সার জৌলুস ম্লান হয়ে আসছে। আর বেচারাম চন্দ্রের আসরের রোশ্‌নি হচ্ছে উজ্জ্বলতর। পরে অবশ্য সে আলোও একেবারে নিভে গিয়েছিল। কিন্তু তত পরের কথা এখানকার বক্তব্য নয়। যে আসরের কথা এখন বলা তখন হবে বেচারামবাবুর জম্‌জমাট আসর বসত আর তার নাম-ডাক শোনা যেত সঙ্গীতামোদী লোকের মুখে মুখে। এ বাড়ির আসরে অনেক গুণী, অনেক ওস্তাদ সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন, আসর মাত করেছেন। এখানকার বড বড জলসা হত নীচের উঠোনে। আর একটু ছোটখাটো হলে, দোতলার হল-ঘরে। বেচারামবাবু এক-একটি বড আসরে এক রাতে দু হাজার আডাই হাজার টাকা পর্যন্ত সেকালে খরচ করতেন। সুতরাং বোঝা যায়, তিনি কি ধরনের সখ্‌দার ছিলেন। কারণ সে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা।

চন্দ্রমশায়ের বাড়ির যে জলসার কথা এখানে বলা হবে, সেও প্রায় সেই সময়ের। ১৯১৬ সাল।

সেদিনের আসরে কয়েকজন সর্বভারতীয় গুণীকে বেচারামবাবু আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন। সুরশিল্পী এবং ছন্দশিল্পী। গায়ক, যন্ত্রী এবং সঙ্গতকার। সুরশিল্পীদের মধ্যে প্রধানরূপে উপস্থিত ছিলেন ওস্তাদ করামতুল্লা খাঁ, সরদগুণী। তবলা গুণীদের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন লক্ষ্ণৌ ঘরানার বিখ্যাত সঙ্গতী, খলিফা আবিদ্ হোসেন খাঁ। যুক্তপ্রদেশের আর-একজন যশস্বী তবলিয়া দর্শন সিংহও সেদিনের জলসায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তা ছাড়া আরও কয়েকজন তবলা-বাদক সে আসরে উপস্থিত ছিলেন। যেমন সেখানে ছিলেন আরও একাধিক গায়ক। আসরের সব ক'জন সুরশিল্পীর নাম শ্রুতিস্মৃতির পথ বেয়ে

অমরত্ব লাভ করতে পারে নি। তাঁরা বিস্মৃতির অতলে লীন হয়ে গেছেন। কারণ, একটিমাত্র গায়ক সেই আসরে আপন প্রতিভার দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল হয়ে ছিলেন, যার ফলে নিষ্প্রভ হয়ে যায় সেই রাতে অন্য গায়কদের স্মৃতি। তিনি এক তরুণ গীতশিল্পী।

যে ক'জন গায়ক বা সুরশিল্পী সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে অখ্যাত। এবং সঙ্গীত-সমাজে প্রতিপত্তিহীন। আসরে তাঁর গান হবার আগে শ্রোতৃ-সাধারণ তাঁর পরিচয় বিশেষ জানত না। তিনি শান্ত মুখে করামতুল্লা খাঁর পাশে বসে ছিলেন। সুন্দর আকৃতির একটি তরুণ। বাঙ্গালীর বেশভূষা, গৌরবর্ণ, সুশ্রী। সুগঠিত দেহ, মাথার চিকন ঘন কেশ, আয়ত চক্ষু। কিন্তু সে চোখে কোন ভাষা নেই। কটাক্ষবিহীন বিবর্ণ 'দৃষ্টি'।

উনিশ বছরের সেই তরুণ গায়কের নাম বৃহত্তর সঙ্গীত-জগতে তখনও অপরিচিত। তার আগে কোন বড় আসরে তাঁকে কেউ গান গাইতে শোনে নি। তাই শ্রোতাদের বিশেষ কারুর লক্ষ্য পড়ে নি তাঁর দিকে। নিজে গান গাইবার আগে পর্যন্ত তিনি একজন সাধারণ ব্যক্তির মতন সেখানে বসে ছিলেন।

তাঁকে কিন্তু সে আসরে এনেছিলেন ওস্তাদ করামতুল্লা খাঁ। সে রাতের জলসার প্রধান আকর্ষণ ছিলেন খাঁ সাহেব। প্রধানত তাঁর সরদযন্ত্রে গুণপনার পরিচয় পাবার জন্যেই শ্রোতারা সেখানে আসেন। তিনি তখন কলকাতায় বছর খানেক অবস্থান করছেন এবং এখানকার সঙ্গীতসমাজে বিশিষ্ট প্রতিভায় বিশেষ প্রতিপত্তি অর্জন করেছেন।

(স্যর আশুতোষ চৌধুরী এবং তাঁর পত্নী প্রতিভা দেবী প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত) সঙ্গীত সঙ্ঘের প্রধান যন্ত্রসঙ্গীত শিক্ষক কৌকভ খাঁর অকালমৃত্যুতে তাঁর শূন্যস্থান পূর্ণ করতে অগ্রজ করামতুল্লা সঙ্ঘের উদ্‌যোগে এলাহাবাদ থেকে কলকাতায় এসেছিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতার অভাব তিনি দক্ষতার সঙ্গেই পূরণ করেছিলেন—শুধু সঙ্গীত সঙ্ঘে নয়, বাংলার সঙ্গীত সমাজেও। কৌকভ খাঁর কৃতী শিষ্যমণ্ডলী (সরদী ধীরেন্দ্রনাথ বসু, সুরবাহার গুণী হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল, এস্রাজী কালিদাস পাল, সেতারী ননী মতিলাল ও হীরালাল হালদার প্রভৃতি) তাঁর কাছেও তালিম নিয়েছেন। আরও অনেকেই পরে শিষ্যত্ব স্বীকার করেছেন তাঁর কাছে। আসরে তিনি সঙ্গীত-কৃতির পরিচয় দিতেন সরদীরূপে, কিন্তু সেতার, এস্রাজ ইত্যাদি যন্ত্রেও তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল এবং একাধিক যন্ত্রে তিনি শিষ্যদের শিক্ষা দিয়েছেন। কণ্ঠসঙ্গীতে, খেয়াল গানেও তাঁর কৃতী শিষ্য

হয়েছিলেন বাংলাদেশে, এমন একজনের কথা এই বিবরণের মধ্যেই পাওয়া যাবে। প্রায় সব যন্ত্রীই অন্তরালে গায়ক। কৌকভ খাঁর মতন করামতুল্লাও গান গাইতে পারতেন এবং দুই ভ্রাতারই গানের প্রচুর সঞ্চয় ছিল। তবে কৌকভ খাঁর গানে কোন শিষ্য ছিলেন না, কিন্তু করামতুল্লার তাও ছিলেন।

সে আসরে করামতুল্লার বাজনা আর অন্যান্য গায়কের গান হয়েছিল, ভাল ভাবেই হয়েছিল। কিন্তু সেসব কথা এখানে বিশেষ করে কিছু বলবার নেই। বলবার আছে সেই তরুণ গায়কের কথা, তাঁর সেদিনের গানের কথা।

ওস্তাদ করামতুল্লাই তাঁকে গানের জন্যে আহ্বান জানালেন। তখনকার আসরে আজকালকার মতন নাম ঘোষণা করে অনেক সময় শিল্পীদের পরিচয় দেওয়া হত না, বিশেষ নবীন ও অপেক্ষাকৃত অপরিচিতদের। গুণপনা দেখিয়েই তাঁরা পরিচিতি লাভ করতেন। তা ছাড়া, সেটি ছিল অ-মাইক যুগ। এমন সাড়ম্বরে তখন শিল্পীর নাম ঘোষিত হতে শোনা যেত না, রাগের নাম ইত্যাদির বর্ণনা সমেত।

করামতুল্লা খাঁ শুধু বললেন—এবার এই ছেলেটি গান গাইবে।

গান আরম্ভ হবার আগে গায়কের নাম জানবার জন্যে শ্রোতারা বিশেষ কৌতূহলীও হলেন না। কারণ, বৃহত্তর সঙ্গীত-জগতে তাঁর কোন পরিচিতি বা স্বীকৃতি তখনও পর্যন্ত ছিল না।

কিন্তু সেই তরুণের জীবনের ও সঙ্গীত-জীবনের কিছু পরিচয় দেবার আছে এবং সে আসরে তাঁর গানের কথা বলবার আগে তাঁর সঙ্গীতচর্চার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া হল।

অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। বংশে বা বাড়িতে সঙ্গীতচর্চা বা সঙ্গীতের আবহ তেমন ছিল না। ছেলেটির কিন্তু বালক বয়স থেকেই প্রকাশ পায় গান গাইবার স্বাভাবিক শক্তি। শুনে শুনে সে নানা ধরনের বাংলা গান সুরেলা গলায় গাইতে পারে। আর সেই বালকের গান ভাল লাগে সকলের। যে শোনে সে-ই মুগ্ধ হয়। গান গাইবার ক্ষমতার জন্যেই সে অতি অল্প বয়স থেকে এখানে সেখানে পরিচিত হতে থাকে। এমনই ভাবে তার পরিচয় হয় বিখ্যাত ধনী ও শৌখিন গুণী হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীলের সঙ্গে। ছেলেটির বয়স তখন মাত্র বারো-তেরো বছর।

হরেন্দ্রকৃষ্ণের অট্টালিকার জলসাঘরে উচ্চাঙ্গের আসর বসত। তবে সেখানকার জলসায় ছেলেটির গান গাইবার বয়স তখন নয়। শীল মশায়ের একটি শখের থিয়েটার ছিল। সেই থিয়েটারে তিনি মাঝে মাঝে অংশ

নেওয়াতেন তাকে। সুকণ্ঠ রূপবান ছেলেটি হরেন্দ্রকৃষ্ণের বাড়ির থিয়েটারে স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয় করত, সখীর দলে প্রধান হয়ে গান গাইত। আর সুরেলা গলার জন্যে প্রশংসা পেত সকলের।

সে যে শুধু গান-বাজনা নিয়ে থাকত, তা নয়। স্কুলে যেত, লেখাপড়া করত। আনন্দ-প্রাণ কিশোর। স্ফুটনোন্মুখ সুরশিল্পী-মন। কিন্তু হঠাৎ এক মর্মান্তিক বিপর্যয় ঘটে গেল তার জীবনে। যেমন অভাবিত, তেমনি অকরুণ।

তখন তার চৌদ্দ বছর বয়স। একদিন স্কুলের ক্লাসে বসে মাস্টার মশায়ের পড়ানো শুনতে শুনতে মাথার মধ্যে ভীষণ যন্ত্রণা অনুভব করলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই এই অসহ্য যন্ত্রণায় সে অজ্ঞান হয়ে গেল। তার পর দিন-দুপুরে নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার ঘনিয়ে এল তার দুচোখে। অবশেষে জ্ঞান তার ফিরে এল বটে, কিন্তু সে অন্ধকার আর দূর হল না। আলোর জগৎ আর ফিরে এল না তার চোখ ভরে। কোন চিকিৎসাতেই আর সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলে না।

লেখাপড়া, স্কুলে যাওয়া সমস্তই সেদিন থেকে বন্ধ হয়ে গেল। দুঃখে মনস্তাপে একেবারে ভেঙে পড়ল সে। এ আঘাত সামলাতে তার অনেক দিন লাগল। একটি বছর সে বাড়ি থেকে বেরুত না ক্ষোভে আর হতাশায়। তার পর জীবনের এই অপূরণীয় ক্ষতিও তার সহ্য হয়ে এল। নিষ্ঠুর ভাগ্যকে সে ক্রমে মেনে নিলে বাড়ির সকলের চেষ্টায়, সান্ত্বনায়। তখন স্থির হল, কি নিয়ে সে থাকবে, জীবন কাটাবে—কি হবে তার জীবনের সম্বল।

তার প্রাণ-মনের স্বাভাবিক গতি ছিল সঙ্গীতের দিকে। সুরের প্রতি তার আবাল্য আকর্ষণ। তাই সঙ্গীতকেই সে জীবনের প্রধান অবলম্বন করলে। এতদিন যা ছিল শুধু শখের শিক্ষা, এখন থেকে তা হল রীতিমত সাধনার বিষয়। তার ভালভাবে সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা হল।

এই নতুন করে সঙ্গীতচর্চার সময় তার প্রথম ওস্তাদ ছিলেন এক বাঙ্গালী সঙ্গীতগুণী। নাম শশীভূষণ দে। খেয়াল গায়ক। পেশায় তিনি আইনজীবী, কিন্তু সুরের নেশায় সঙ্গীত-সাধক। সেকালের অনেক বাঙ্গালী সঙ্গীতজ্ঞের মতন অপেশাদার, কিন্তু সঙ্গীতে যথার্থ অধিকারী।

দুজন গুণীর কাছে তিনি রীতিমত সঙ্গীতশিক্ষা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন নারী। সেকালের যশস্বিনী গায়িকা শ্রীজান বাঈ—যাঁর কাছে অঘোরনাথ চক্রবর্তী, বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, জিতেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী প্রভৃতি বাংলার কৃতী গায়ক-বাদকেরা সঙ্গীত বিষয়ে ঋণী ছিলেন—শশীভূষণ দে-কেও তালিম

দিয়েছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় সঙ্গীতগুরুর নাম (বেতিয়া ঘরানার) গুরুপ্রসাদ মিশ্র, যাঁর প্রধান শিষ্য ছিলেন রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী। শ্রীজান বাঈ ও গুরুপ্রসাদ মিশ্রের শিক্ষায় গঠিত সেই খেয়াল-গায়ক শশীভূষণ হলেন ছেলেটির প্রথম সঙ্গীত-শিক্ষক। এই তার হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে হাতেখড়ি। নতুন উৎসাহে সে নিয়ম মতন গান শিখতে আরম্ভ করলে। স্বভাবদত্ত মেধা ও নৈপুণ্যের সঙ্গে যুক্ত হল ঐকান্তিক চেষ্টা। আর সেই সঙ্গে শিক্ষকের উপযুক্ত নির্দেশ। শিক্ষার্থী অতি দ্রুত রীতিমত গায়ক তৈরি হয়ে উঠতে লাগল।

গানশিক্ষায় তার অসীম আগ্রহ আর গ্রহণ করবার শক্তি। শশীভূষণের কাছে বেশ কিছুদূর অগ্রসর হবার পর তার আর-একজন গুণীর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটল। তিনি হলেন সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সতীশচন্দ্র একাধারে টপ্পাগায়ক এবং তবলাবাদক। বাংলার এক শীর্ষস্থানীয় টপ্পাশিল্পী এবং সঙ্গীতাচার্য মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অন্যতম শিষ্য সতীশচন্দ্র রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় সঙ্গীতচর্চায় শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেন। প্রথম জীবনে টপ্পা-গায়ক রূপে যেমন তাঁর সুনাম হয়, উত্তর জীবনে তেমনি তবলায় সঙ্গতকার রূপে। সতীশচন্দ্রের কাছে সেই ছেলেটি বিশেষ করে টপ্পা গান আর তার রীতিনীতি শিখতে লাগল।

এমনি করে স্বভাব-গায়ক শিক্ষিত-গায়ক হয়ে উঠল একনিষ্ঠ সাধনায়। আর তার গুণগ্রাহী, শুভানুধ্যায়ীর চক্র ক্রমে বিস্তৃত হতে লাগল। তার এক পরম হিতাকাঙ্ক্ষী হলেন স্বনামধন্য মল্লযোদ্ধা গোবরবাবু (যতীন্দ্রচরণ গুহ)। সেই তরুণ গায়কের সঙ্গীত-জীবনে গোবরবাবুর পৃষ্ঠপোষকতা একটি উল্লেখ্য অধ্যায় হয়ে আছে এবং অপ্রকাশিত অধ্যায়। যেমন অপ্রকাশিত আছে গুহ মহাশয়ের নিজেরই সঙ্গীত-জীবন। একথা সুবিদিত আছে যে, বাংলার বীর সন্তান গোবরবাবু ইউরোপ ও আমেরিকা ভূখণ্ডে অমিতশক্তি মল্লরূপে ভারতের মুখোজ্জ্বল করেছিলেন। মল্ল-বিশ্বের 'লাইট হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন' গৌরব লাভ করে ভারতবর্ষে এক অনন্য-সাধারণ কীর্তি স্থাপন করেন তিনি। কিন্তু একথা অবিদিত আছে যে, প্রথম জীবনে তিনি রীতিমত সঙ্গীতচর্চা করেছিলেন, গুণী কলাবতের শিক্ষাধীনে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে। কৌকভ খাঁ এবং পরে করামতুল্লা খাঁর কাছে দীর্ঘকাল তিনি সেতারে তালিম নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর দেশ-বিদেশে মল্ল-প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্যে সঙ্গীতচর্চা আর নিয়মিত করবার সুযোগ পান নি। তবে সঙ্গীতপ্রেমী এবং সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক থেকেছেন বরাবর। এই গুণে তিনি তাঁর বংশীয় ধারার উত্তরাধিকারী। তাঁদের পারিবারিক সঙ্গীতসভা

এবং সঙ্গীতক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতার কথা ভাবীকালের স্মরণযোগ্য। যতীন্দ্রচরণের পিতামহ অম্বিকাচরণ (অম্বু গুহ নামে সুপরিচিত) শুধু একজন শৌখিন মল্লযোদ্ধা এবং বাংলায় কুস্তিচর্চার অন্যতম প্রচলনকর্তা ছিলেন না। তাঁর আর এক পরিচয় হল—সঙ্গীতজ্ঞদের মুক্তহস্ত পৃষ্ঠপোষকরূপে। তাঁরই আনুকূল্যে বেণী ওস্তাদ (বেণীমাধব অধিকারী) প্রসিদ্ধ খেয়াল-গায়ক আহম্মদ খাঁর কাছে সঙ্গীত-শিক্ষার সুযোগ পান। বেণীমাধব ছিলেন নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা,' 'দক্ষযজ্ঞ' ইত্যাদি নাটকের সঙ্গীত পরিচালক, সে-যুগের একজন খ্যাতিমান গায়ক এবং স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গীতগুরু। গুহ পরিবারের আর-এক সঙ্গীতপ্রেমী তারাচরণের বদান্যতায় বিখ্যাত টপ্পাগুণী মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (মহেশ ওস্তাদ নামে সঙ্গীত জগতে সুপরিচিত) সঙ্গীতাচার্য রামকুমার মিশ্রের (সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের সঙ্গীতগুরুরূপে যাঁর পরিচয় আগেই দেওয়া হয়েছে) কাছে তালিম নিতে পেয়েছিলেন। সে-যুগের অনেক সঙ্গীতপ্রেমী ধনী এমনি ভাবে প্রতিভাবান্ বাঙ্গালীদের রীতিমত ভাবে সঙ্গীত-শিক্ষার সুযোগ করে দিতেন পশ্চিমা কলাবতদের কাছে এবং তাঁদের সেই পৃষ্ঠপোষকতার ফলে বাংলায় সঙ্গীতচর্চার শ্রীবৃদ্ধি হত। উক্ত গুহ-বংশে হরি গুহ (তাঁর একটি বাড়ির বহির্ভাগে কৌকভ খাঁ বাস করতেন এবং সেখানেই তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হয়), ক্ষেতু গুহ প্রভৃতি আরও কয়েকজন সঙ্গীতপ্রেমী ছিলেন এবং যতীন্দ্রচরণও (গোবরবাবু) সেই ধারার মানুষ। তাঁর বিডন রো-র বাড়িতে যেমন অনেক উঁচুদরের গান-বাজনার আসর বসেছে, তেমনি অনেক সঙ্গীতজ্ঞদেরও পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন তিনি। সেসব বিবরণ এখানে দেবার প্রয়োজন নেই। শুধু সেই দৃষ্টিশক্তি হারানো ছেলেটির সঙ্গীত-শিক্ষার কথায় তাঁর প্রসঙ্গ অনিবার্য-ভাবেই এসে পড়ে।

যতীন্দ্রচরণের ৫২, বিডন রো-তে তখন সঙ্গীতের নিয়মিত বৈঠক হয়ে থাকে। তাঁর প্রথম ওস্তাদ কৌকভ খাঁর মৃত্যুর কয়েক মাস পর থেকে আসেন করামতুল্লা খাঁ। তবলিয়া দর্শন সিং মাঝে মাঝে আসেন। পশ্চিম থেকে কলকাতায় আসা এবং কলকাতাবাসী নানা গায়ক-বাদকদের গান-বাজনার আসর মাঝে মাঝে বসে সেখানে। এমন সময়ে সেই ছেলেটিকে তিনি দেখলেন, তার গান শুনলেন। আর বুঝলেন যে, সে একটি সঙ্গীত-প্রতিভা।

সঙ্গীত-শিক্ষার শেষ নেই। রাগবিদ্যা নিরবধি। এক একজন সঙ্গীত-সাধক সারা জীবন চর্চা করেও তো বলে থাকেন যে সঙ্গীতবিদ্যা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা গেল না। আর এক্ষেত্রে গায়কটি তো নিতান্ত তরুণ। বয়স হবে আঠারো বছর।

শশীভূষণের কাছে শিখেছেন, সতীশচন্দ্রের কাছে শিখছেন—ভাল কথা। কিন্তু এইখানেই তো শেষ হতে পারে না। এমন তৈরি গলা, এমন সঙ্গীতৈকপ্রাণ ছেলেটির আরও শিক্ষা করলে ভাল হয়। আরও সঙ্গীত সংগ্রহের প্রয়োজন।

পশ্চিমে গিয়ে সেখানকার কোন হিন্দুস্থানী কলাবতের শিক্ষা নেওয়া তার এখন দরকার। তার জন্যে দস্তুরমত ব্যয় করতে হবে। কিন্তু তার বাড়ির সে সঙ্গতি নেই। তখন গোবরবাবু নিজে থেকেই এ বিষয়ে উদ্‌যোগী হলেন। ছেলেটির পশ্চিমাঞ্চলে গান শিক্ষার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। দর্শন সিং প্রভৃতির কাছে শুনেছিলেন গয়ার প্রসিদ্ধ খেয়াল-গায়ক হনুমানদাসজীর কথা। গুণী হারমোনিয়ম-বাদক সোনীজীর পিতা সেই হনুমানদাসজীর কাছে তাঁর সঙ্গীত-শিক্ষা করতে যাওয়ার আয়োজন করা হল। গোবরবাবু তাঁর আর এক ধনী বন্ধুর সহযোগিতায় তার গয়ায় সঙ্গীত-শিক্ষার উদ্দেশ্যে বাস করবার সব ব্যাপারের ভার নিলেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত গয়ায় হনুমানদাসজীর কাছে তার তালিম নিতে যাওয়া হল না দর্শন সিং-এরই পরামর্শে। দর্শন সিং গোবরবাবুকে বললেন, "এত দূরে গিয়ে এত টাকা খরচ করে শিখতে অনেক রকম অসুবিধা হতে পারে। তার চেয়ে হাতের কাছে খাঁ সাহেব রয়েছেন। ওঁর কাছেই শেখাবার ব্যবস্থা করুন।"

কথাটি সকলেরই অনুমোদন পেলে এবং ওস্তাদ করামতুল্লা খাঁর কাছে তার খেয়াল শেখবার ব্যবস্থা হল। খাঁ সাহেব বলে নিলেন, 'প্রথম ছ' মাস ও বাইরে কোথাও গাইবে না।' অর্থাৎ তাঁর কাছে শেখা খেয়াল গান কোন আসরে সে গাইতে পারবে না। গাইবে ছ' মাস পরে, এই নতুন ঢং-এর গান গলায় ভাল ভাবে বসলে।

খাঁ সাহেবের মাসিক দক্ষিণা ধার্য হল ১০০ টাকা। শিক্ষার্থীর নাড়া বাঁধাও হল গোবরবাবুর বিডন রো-র বাড়িতে। তিনিই তার তখনকার শিক্ষার ভার নিয়েছিলেন। এই ভাবে করামতুল্লা খাঁ তাকে শেখাতে আরম্ভ করলেন গোবরবাবুর আনুকূল্যে এবং দর্শন সিং-এর প্রস্তাবে। দর্শন সিং-এর সঙ্গে খাঁ সাহেবের পরিচয় অনেক দিনের, এলাহাবাদে থাকবার সময় থেকে। এলাহাবাদেরই কাছাকাছি দর্শন সিং-এর বাড়ি এবং তিনি এলাহাবাদে করামতুল্লার সঙ্গে মাঝে মাঝে বাজাতে আসতেন, খাঁ সাহেব কলকাতায় আসবার আগে। সেখানে একবার কৌকভ খাঁ কলকাতা থেকে সপরিবারে যান এবং দর্শন সিং-এর বাজনা শোনেন জ্যেষ্ঠর বাড়িতে থাকবার সময়।

বাজানও তাঁর সঙ্গে। আর তাঁকে কলকাতায় চলে আসবার জন্যে বলেন। কৌকভ খাঁ নিজে তখন কলকাতায় কয়েক বছর থেকে এখানকার ধনীদের সঙ্গীতপ্রেমের পরিচয় পেয়েছেন। তাই দর্শন সিংকে কলকাতায় আসবার পরামর্শ দিলেন সঙ্গীতক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভের জন্যে।

তার পরই দর্শন সিং কলকাতায় চলে আসেন (করামতুল্লা খাঁ এলাহাবাদ থেকে কলকাতায় এসেছিলেন তাঁর অনেক পরে, কৌকভ খাঁর মৃত্যুর পরে) এবং কলকাতায় দীর্ঘকাল বাস করে এখানকার সঙ্গীতজগতে সম্মানের সঙ্গে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর আকস্মিকভাবে মৃত্যুও ঘটে কলকাতায় একটি সঙ্গীতের আসরে সঙ্গত করবার সময়েই, লালচাঁদ বড়াল মহাশয়ের (তিনি তখন পরলোকগত) বাড়িতে। 'সুরের আসরে দুর্ঘটনা' অধ্যায়ে তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। দর্শন সিং কলকাতায় আসবার আগে গয়ায় অনেক সঙ্গীতাসরে বাজিয়েছেন, তা ছাড়া পশ্চিমাঞ্চলের আরও নানা স্থানের আসরে। এই সমস্ত জলসায় তিনি ভারতবর্ষের বহু উচ্চশ্রেণীর গায়ক-বাদকের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁদের সঙ্গে সঙ্গতের অভিজ্ঞতার ফলে বিভিন্ন রীতির গানে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করেন, বিশেষ ঠুংরি গানে। কারণ তাঁর সুরবোধ এবং গান শুনে তা অনুকরণ করবার বা স্মৃতিতে সংগ্রহ করে রাখবার ক্ষমতাও বেশ খানিক ছিল। তাই সে-যুগের ভারতের শীর্ষস্থানীয় ঠুংরিগুণী (গোয়ালিয়রের) গণপৎ রাও (ভাইয়া সাহেব নামে সুপরিচিত), মৌজুদ্দিন প্রভৃতি এবং গয়া ইত্যাদি পশ্চিমাঞ্চলের বাঈজী সম্প্রদায়ের সঙ্গে সঙ্গত করবার ও পরিচিত হবার ফলে কয়েকটি ভাল ঠুংরি গান সংগ্রহ করেছিলেন দর্শন সিং। তাঁর বিষয়ে এখানে এত কথা বলা অবান্তর নয়, কারণ সেই তরুণ গায়কের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে। সে গায়ক উত্তর-জীবনে প্রায় সব রীতির গানের সুকণ্ঠ গায়করূপে সারা ভারতে স্বনামধন্য হয়েছিলেন—ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা থেকে আরম্ভ করে বাংলা কাব্য সঙ্গীত, এমন কি পদাবলী কীর্তন পর্যন্ত।

সেসব অবশ্য অনেক পরের কথা। কিছু উল্লেখ যখন করাই হল, তখন তাঁর উত্তরজীবনের সঙ্গীতচর্চার কথা এখানে বলে নেওয়া ভাল। তিনি যেন সঙ্গীতের আকুল পিপাসা নিয়ে প্রায় সব রীতিরই সাধনা করেছিলেন, কোন একটি পদ্ধতিতে তৃপ্ত থাকতে পারেন নি। তাই নানা অঙ্গে চর্চা করেছিলেন যুগপৎ এবং অগভীর বা অল্পবিস্তার কারবারী নিশ্চয়ই ছিলেন না। সঙ্গীতের বহুমুখী বৈচিত্র্যে মুগ্ধ হয়ে নানা রীতির চর্চা করেন অনন্য কণ্ঠসঙ্গীতের প্রতিভায়। যে গুণীর কাছে সম্পদের সন্ধান পেয়েছেন, তাঁর কাছেই তা যথাসম্ভব সঞ্চয়

করে নিয়েছেন। করামতুল্লার কাছে তিন বছর শিক্ষার পর তাই বাদল খাঁর কাছেও শিক্ষার্থী হয়ে যান এবং আরো খেয়াল সংগ্রহ করেন। যেমন খেয়াল গায়ক তেমনি উৎকৃষ্ট ধ্রুপদীও হয়েছিলেন তিনি। ধ্রুপদে প্রথম প্রেরণা পান শিব পশুপতির গান শুনে। এ বিষয়ে ধ্রুপদী-পাখোয়াজী সতীশচন্দ্র দত্ত (দানীবাবু) এবং ধ্রুপদী অমরনাথ ভট্টাচার্যের কাছেও উপকৃত ছিলেন এবং বয়সে কনিষ্ঠ হলেও দবীর খাঁর কাছে ধ্রুপদ শিখতে দ্বিধা করেন নি। সব শেষে কীর্তন শিখেছিলেন গোয়াবাগানের কীর্তনীয়া রাধারমন দাসের অধীনে। তার আগে তবলাগুণী পুরুষোত্তম ওস্তাদের কাছে রীতিমত তবলা শিক্ষা করেছিলেন। এ সমস্তই বেচারামবাবুর আসরের অনেক পরের কথা। কণ্ঠ-সঙ্গীতে এমন নানা রীতির সার্থক গায়ক সত্যই দুর্লভ। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, কীর্তন, কাব্যসঙ্গীত, গজল ইত্যাদি ছাড়া এই সর্বতোমুখী প্রতিভাবান গায়ক ঠুংরি গানেরও চর্চা করেছিলেন, ভালই গাইতেন ঠুংরি এবং তাঁর ঠুংরি শিক্ষার মূলে ছিলেন তবলা-বাদক দর্শন সিং। তিনি গোবরবাবুর বাড়িতে দর্শন সিং-এর সঙ্গে পরিচিত হন এবং দর্শন সিংই তাঁকে প্রথম কয়েকটি ঠুংরি গান দিয়েছিলেন, গলায় তুলতেও সাহায্য করেছিলেন। তার মধ্যে চারখানি গান (দর্শন সিং-এর কাছে শেখা) তিনি গোবরবাবুর বাড়িতে একটি হোলির আসরে প্রথম গেয়েছিলেন অতি চমৎকার ভাবে। তা হল, বেচারাম চন্দ্র মশায়ের সেই আসরের কিছুদিন আগেকার কথা। সেই চারটি ঠুংরি গানের মধ্যে দুটি হল—

(১) চলো গুঁইয়া আজো খেলো হোরি, কৌই শামর কোই গোরী।

(২) কেইসী ধূম বঁচায়ি।

সে আসরে তিনি শুধু ঠুংরিই গেয়েছিলেন (সে গান সবই দর্শন সিং-এর কাছে পাওয়া) আর গোবরবাবুর বিডন রো'র বাড়ির রাস্তার ধারের ঘরখানির জানলার সামনে ভিড় জমে যায় তাঁর মাধুর্যময় গানগুলি শোনবার জন্যে। পরে জমিরুদ্দিন খাঁর কাছে আরো ভাল ভাবে ঠুংরি শিখেছিলেন।

ওস্তাদ করামতুল্লার তালিমও তিনি সেই ঘরে বসেই নিতেন। খাঁ সাহেবের কাছে তিনি শিখেছিলেন তিন বছরেরও বেশি। খেয়াল আর তেলেনা। বিভিন্ন রাগের গঠন, প্রকৃতি ও পদ্ধতি। ছ-মাস খাঁ সাহেবের কাছে একভাবে শিক্ষার পর তাঁর গানের চাল অনেকখানি বদলে গিয়েছিল, তাঁর বন্ধু-বান্ধবরা সকলেই এটি লক্ষ্য করেছিলেন। সেই সময়েই হল বেচারামবাবুর সেদিনের বিশেষ আসর।

করামতুল্লা খাঁ তাঁর পাঠান জবানের উর্দুতে 'এই ছেলেটি এবার গাইবে' বলবার পর সেই তরুণ গায়ক গান আরম্ভ করলেন। দরাজ, ভরাট তাঁর গলা প্রথম থেকেই অমনোযোগী শ্রোতাদের মন আকর্ষণ করে নিলে। গলা শুধু তৈরি নয়, বড় দরদী। হৃদয়গ্রাহী ভাব দিয়ে গান করছেন এমন ভাবে যে, শ্রোতাদের মন অনুরণিত হয়ে উঠেছে সেই সুরে। তাল-লয়েও কোন খুঁত নেই। যেমন স্বচ্ছন্দ সুরবিহার, তেমনি তালেও পারদর্শিতা। অনায়াস দ্রুতগতির ও নানা রীতির তানকর্তব, রাগের সুনিপুণ বিন্যাস, প্রাণস্পর্শী কণ্ঠস্বর। প্রথম শ্রেণীর গায়কের সমস্ত গুণই সেই তরুণের মধ্যে বর্তমান। সুতরাং কলাবত ও বোদ্ধা সকল শ্রোতারাই তাঁর গানে পরিতৃপ্ত হতে লাগলেন। আসর সজীব হয়ে উঠল সুরে সুরে। তাল-লয়ের কাজেও এমন প্রবীণতা এই বয়সে সুলভ নয়। তাঁর গানের সঙ্গে ওস্তাদ আবিদ হোসেন এবং দর্শন সিং দুজনেই বাজালেন পালা করে এবং সাবাস দিলেন। তালের কঠিন পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন নবীন গায়ক। ভারতবিখ্যাত ওস্তাদদের সামনে তিনি সমান দাপটে দুঘণ্টা ধরে তেলেনা আর খেয়াল গেয়ে গেলেন। একাই আসর মাত করলেন সেদিন।

তার পর যখন গান শেষ করলেন, উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় শ্রোতারা মুখর হয়ে উঠলেন। আসরে সাড়া পড়ে গেল।

পশ্চিমা কলাবতেরা সাগ্রহে গায়কের পরিচয় জানতে চাইলেন—এ কে?

দর্শন সিং সংক্ষেপে জানালেন—একটি বাঙ্গালী ছেলে।

শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে, গায়ক বাঙ্গালী! এই বয়সের একজন বাঙ্গালী এমন সাবলীল দক্ষতায় হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীত গাইতে পারলেন—তাঁদের কাছে এ এক অভিনব অভিজ্ঞতা। উপস্থিত অনেকেই গায়কের নাম জানতে কৌতূহলী হলেন। ছোকরার নাম কি?

কৃষ্ণচন্দ্র দে।

বেচারামবাবুর বাড়ির আসরে এমনিভাবে অতি তরুণ বয়সে অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে বৃহত্তর সঙ্গীতগুণী সমাজের স্বীকৃতি লাভ করলেন। সঙ্গীতরাজ্যে তাঁর গৌরবময় জয়যাত্রা সেই আসর থেকেই আরম্ভ হল।

সেদিনের শ্রোতাদের মধ্যে যাঁরা বিচক্ষণ তারা স্পষ্টই বুঝলেন—সুরের আকাশে নতুন চন্দ্রের উদয় হয়েছে।

কৃষ্ণচন্দ্র নয়—পূর্ণচন্দ্র!

মুস্তারি বাঈয়ের রবীন্দ্র-সঙ্গীত

রবীন্দ্রনাথের রাগসঙ্গীত-প্রীতির এবং এক হিন্দুস্থানী শিল্পীর রবীন্দ্রসঙ্গীত-গীতির এ এক স্মরণীয় কাহিনী। ঘটনাস্থল কলকাতা। আজ থেকে প্রায় ৩৫ বছর আগেকার কথা।

শিল্পীর নাম হল মুস্তারি বাঈ, আগ্রা অঞ্চলের গায়িকা। আগ্রা শহর থেকে তিন মাইল দূরে ফতিয়াপুর নামে একটি আধা-গ্রাম আধা-শহরের বাসিন্দা ছিলেন। পেশা—সঙ্গীত-চর্চা। সেখানে নিজের কোঠিতে বসে রইস ব্যক্তিদের গান শুনিয়ে রোজ তিনি রোজগার করতেন ৫০।৬০ টাকা, ৩৫।৪০ বছর আগে। কিন্তু তা আসল কথা নয়। বড কথা হল, তিনি ছিলেন এক দুর্লভ সঙ্গীতশিল্পী, যদিও তাঁর নাম সঙ্গীতজগতে প্রখ্যাত হবার সুযোগ পায় নি। তার কারণ, তাঁর অকালমৃত্যু। সেসব কথা পরে প্রকাশ্য।

মুস্তারি বাঈ প্রধানতঃ খেয়াল-গায়িকা এবং তাঁর ওস্তাদ ছিলেন কবীর বক্স। তিনিও একই অঞ্চলে বাস করতেন।

ওস্তাদ কবীর বক্স কিংবা তাঁর একমাত্র কলাবতী ছাত্রী মুস্তারি বাঈয়ের নাম সঙ্গীতজগতে আজ সুপরিচিত নয়। সঙ্গীতপ্রিয় সাধারণের অনেকেরই ওই দুটি নাম জানাশোনা নেই।

কবীর বক্স কিন্তু গায়ক ছিলেন না। ছিলেন সারঙ্গী। আসরে বসে তিনি মুস্তারির গানের সঙ্গে সারঙ্গ যন্ত্রে সহযোগিতা করতেন, গায়করূপে তাঁর পরিচয় ছিল না। হয়তো সেই কারণে তিনি সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারেন নি। আর মুস্তারির যথাযোগ্য খ্যাতি না পাবার কারণ—৩১।৩২ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু, এবং তাও ৩০ বছরের অধিককাল আগে। সেই বিস্ময়কর প্রতিভার অগ্রগতিতে অপূর্ণতার ছেদ টেনে দেয় আকস্মিক মৃত্যু। যশ প্রচারের কোন প্রচলিত উপায় অবলম্বন করাও তাঁর ঘটে ওঠে নি। গ্রামোফোন রেকর্ড বা রেডিও বা সর্বভারতীয় সঙ্গীত-সম্মেলন—কোনটিতেই গুণপনা প্রদর্শনের সুযোগ আসে নি তাঁর জীবনে। তাই দেহপটের সঙ্গে নটীর গীতি-কণ্ঠও স্তব্ধ হয়ে গেছে কালের কবলে।

শুধু স্মৃতি আছে। স্মৃতি-শ্রুতিতে অনুরণিত হয়ে আছে সেই কণ্ঠমাধুর্য। সেই অনুপম সুরমাধুরী তাঁদের স্মৃতির পটে সোনার আলপনায় আঁকা আছে,

যাঁরা সেদিন মুস্তারি বাঈয়ের গান শুনেছিলেন। কলকাতায় তাঁর গানের সেই প্রথম আসর। কলকাতার আসর বটে, কিন্তু এমন সর্বভারতীয় গুণীদের সমাগম একটি আসরে সেকালে সচরাচর ঘটত না। এমন প্রথম শ্রেণীর শিল্পীসমন্বয় এখনকার অখিল ভারতীয় সঙ্গীত সম্মেলনেও কম দেখা যায়।

সেই আসরে অংশ নেবার জন্যে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের নাম উল্লেখ করলে সেকথা বোঝা যাবে। যথা, স্বনামধন্য ফৈয়াজ খাঁ (আগ্রার রঙ্গিলা ঘরানার ওস্তাদ গোলাম আব্বাসের দৌহিত্র), রামপুর ঘরানার অপ্রতিদ্বন্দ্বী খেয়ালগুণী মুস্তাক হোসেন খাঁ, সরোদ নেওয়াজ হাফিজ আলী খাঁ, ইন্দোরের খ্যাতনামা বীণ্‌কার মজিদ্‌ খাঁ, জলন্ধরের (ভাস্কর রাওয়ের শিষ্য) হরিশচন্দ্র বালী, বোম্বাইয়ের খেয়াল-গায়ক বসির খাঁ প্রভৃতি। সেই সঙ্গে কলকাতার গুণী গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, কৃষ্ণচন্দ্র দে, সেতারী এনায়েৎ খাঁ প্রভৃতি শিল্পীরাও ছিলেন। এই গুণী সমাজের দ্বারা সেদিন মুস্তারি বাঈ অভিনন্দিত হয়েছিলেন। তাঁর অতুলনীয় কণ্ঠে রাগ রূপায়ণের জন্যে স্বেচ্ছায় স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন তাঁরা।

একদিকে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের এই সব দিক্‌পাল। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ। তাঁরও অকুণ্ঠ প্রশংসায় ধন্য হয়েছিল মুস্তারি বাঈয়ের কণ্ঠমাধুর্য।

রবীন্দ্রনাথ সে আসরে উপস্থিত ছিলেন না। কিভাবে তিনি মুস্তারি বাঈয়ের গান সেদিন শুনেছিলেন এবং পুনরায় শোনবার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন তা যথাস্থানে বর্ণনা করা হবে। এখানে সেদিনকার আসরের প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলবার আছে।

সে-যুগের কলকাতার বিখ্যাত সঙ্গীতাসর 'লালচাঁদ উৎসব'-এ গায়িকার সেদিন গান হয়েছিল। বিগত শতকের বাংলার ওজস্বী টপ-খেয়াল গায়ক লালচাঁদ বড়াল মহাশয়ের স্মৃতিবাসর রূপে তাঁর তিন সঙ্গীতজ্ঞ পুত্র কিষণচাঁদ, বিষণচাঁদ ও রাইচাঁদের উদ্‌যোগে অনুষ্ঠিত হত বার্ষিক লালচাঁদ উৎসব। বর্তমান কলকাতার সঙ্গীত-সম্মেলনগুলি তখনও আত্মপ্রকাশ করে নি। এই সব সম্মেলনের অগ্রদূতরূপে তখন সঙ্গীত-সমাজে (দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রবর্তিত ও পরিচালিত) মুরারি সম্মেলন, (নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, দীননাথ হাজরা প্রমুখ প্রতিষ্ঠিত ও সংগঠিত) শঙ্কর উৎসব, উক্ত লালচাঁদ উৎসব প্রভৃতি কলকাতার সঙ্গীতসমাজের রসপিপাসা চরিতার্থ করত।

প্রধানতঃ ওই সব সঙ্গীতাসর কলকাতার সঙ্গীত সম্মেলনের পথপ্রদর্শক হয়ে তখনকার শ্রোতাদের সুযোগ করে দিত বহু গুণীর একত্র সঙ্গীত আস্বাদনের।

যে তিনটি সঙ্গীতাসরের নাম করা হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে স্বল্পকালস্থায়ী এবং বয়োকনিষ্ঠ হল—লালচাঁদ উৎসব। মাত্র চার-পাঁচ বার লালচাঁদ উৎসবের বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়েছিল। কিন্তু তার প্রত্যেকটি অধিবেশনে এমন প্রথম শ্রেণীর ও সর্ব-ভারতীয় গুণীর সমাবেশ উদ্‌যোক্তারা করতেন, যা তখনকার পক্ষে অভিনব ছিল এবং অন্য কোন আসরে দেখা যেত না। এই দিক্ থেকে লালচাঁদ উৎসবের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অনস্বীকার্য। সেজন্যে কলকাতার সঙ্গীতচর্চার ক্ষেত্রে লালচাঁদ উৎসবের নাম বিশেষ করে স্মরণীয় থাকবে। কলকাতার সঙ্গীতাসরকে লালচাঁদ উৎসব নিখিল ভারতীয় রূপ দান করতে, সর্বভারতীয় দৃষ্টি লাভ করতে সহায়তা করেছে, একথা বলা যায়।

এই বার্ষিক সঙ্গীতানুষ্ঠানের উদ্‌যোক্তারা শুধু প্রাচীন ও প্রখ্যাত কলাবতদেরই আমন্ত্রণ জানাতেন না। উত্তর ভারতের নানা জায়গায় সন্ধান করে নতুন ও অপরিচিত প্রতিভাকে আহ্বান করে আনতেন এবং সঙ্গীত-সমাজে তাঁদের সুপরিচিত করতেন। সেই শিল্পীরা সুযোগ পেতেন কলকাতার রসজ্ঞ শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে তাঁদের গুণপনা প্রদর্শন করবার। লালচাঁদ উৎসবের এমনি অনুসন্ধানের ফলেই মুস্তারি বাঈয়ের কলকাতায় আসা এবং গুণীসমাজে প্রতিভার পরিচয় দেওয়ার সুযোগ হয়েছিল।

কলকাতায় লালচাঁদ উৎসবে যদি সে গায়িকা সেবার না উপস্থিত হতেন, তা হলে তাঁর সঙ্গীতপ্রতিভা বৃহত্তর সঙ্গীতসমাজে অপরিচিত ও অপ্রকাশিত থেকে যেত এবং তিনি সম্পূর্ণ অখ্যাত অবস্থায় পৃথিবী থেকে বিদায় নিতেন। ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর বাড়ি আগ্রায়, কিন্তু তিনিও তার আগে মুস্তারির গুণপনার কোন পরিচয় পান নি। ফৈয়াজ খাঁর মতন আরও কয়েকজন সর্বভারতীয় কলাবতের সামনে মুস্তারি বাঈকে প্রথম উপস্থাপিত করে লালচাঁদ উৎসব এবং সেই উপলক্ষে তাঁকে আবিষ্কার করে কলকাতায় এনেছিলেন বিষণচাঁদ বড়াল।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে এই গায়িকা প্রথম লালচাঁদ উৎসবে এসেছিলেন এবং সেবারের আসরে তাঁর গানের কথাই এখানে বর্ণনা করা হবে।

লালচাঁদ উৎসবের অনুষ্ঠান হত দিন-রাতের অনেকখানি সময় ধরে। সকাল থেকে আরম্ভ করে প্রায় দুপুর। আবার সন্ধ্যা থেকে প্রায় মধ্য-রাত পর্যন্ত। তিন দিন ধরে উৎসব চলত। প্রথম দিন হত শুধু ধ্রুপদ গানের অনুষ্ঠান। দ্বিতীয়-তৃতীয় দিনের অধিবেশনে খেয়াল ও ঠুংরি গান এবং বীণা, সেতার, সরোদ ইত্যাদি যন্ত্রসঙ্গীতের আয়োজন করা হত। এখানে তিনটি দিনের অধিবেশনেই অনুষ্ঠিত সঙ্গীতের মান অতি উচ্চাঙ্গের ছিল, কারণ

সর্বভারতীয় নিরিখে যাঁরা ছিলেন প্রথম শ্রেণীর শিল্পী, তাঁরাই শুধু আমন্ত্রিত হতেন লালচাঁদ উৎসবের আসরে।

এই উৎসবের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আরও একটি উল্লেখ্য সংবাদ আছে, যা সে-সময়কার অন্য কোন সঙ্গীত সম্মেলনের বিষয়ে বলা চলে না। তা হল এখানকার অধিবেশনের সঙ্গীতাদি কলকাতার তখনকার বেতার প্রতিষ্ঠানের যোগে পুনঃ সম্প্রচারিত (relay) হত। কলকাতার বেতার কেন্দ্র তখন সরকারী সম্পত্তি হয়েছে ১৯৩০ সাল থেকে, Indian State Broadcasting Service নামে। আগে তা ছিল একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান: Indian Broadcasting Company (১৯২৭ খৃঃ, ২৬ জুলাই কলকাতায় স্থাপিত)। সেই বেসরকারী বেতারেও ১৯২৭ খৃঃ থেকেই outside broadcast বা স্টুডিওর বাইরেকার নানা স্থানের অনুষ্ঠান relay করবার ব্যবস্থা দেখা যায়। যা হোক, আলোচ্য যুগের কলকাতা বেতার কেন্দ্রের স্টেশন-পরিচালক ছিলেন মিঃ জে. আর. স্টেপ্‌ল্টন। ভারতীয় অনুষ্ঠানাদির প্রধান পরিচালক ছিলেন সুপরিচিত ক্ল্যারিওনেট-বাদক নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার; এবং পিয়ানো ও তবলা-বাদক রাইচাঁদ বড়াল তাঁর সহকারী। লালচাঁদ উৎসবের বেতার relay-র ব্যবস্থাও রাইচাঁদ করেন।

মুস্তারি বাঈ যখন ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে লালচাঁদ উৎসবে গিয়েছিলেন, তাঁর গানও বেতারে relay হয়েছিল।

তিনি ছিলেন খেয়াল-গায়িকা। তাই উৎসবের দ্বিতীয় দিনে তাঁর গানের ব্যবস্থা হয় এবং তিনি প্রথম গান গেয়েছিলেন সকালবেলার অধিবেশনে। সেই অনুষ্ঠানে বেশিক্ষণ তাঁর গান হয় নি। সন্ধ্যার আসরেই তাঁর জন্যে পর্যাপ্ত সময় ধার্য করা ছিল।

কিন্তু সেই সকালের অল্প সময়ের গানেই শ্রোতাদের মধ্যে একটি অসাধারণ সাড়া জাগালেন গায়িকা। বলতে গেলে, সেই প্রথম অনুষ্ঠানেই তিনি যেন সঙ্গীত-গগনে এক নতুন ধূমকেতুর মতন উদয় হলেন। শ্রোতৃমণ্ডলীর একটি অপূর্ব অভিজ্ঞতা লাভ হল—এমন তাঁর কণ্ঠমাধুর্য। অতিশয় হৃদয়স্পর্শী তাঁর সঙ্গীতের আবেদন।

এমন গান তো সচরাচর শোনা যায় না! কি নাম এই নতুন গায়িকার? কৌতূহলী শ্রোতারা প্রায় কেউই এ নাম আগে শোনেন নি। সেই প্রথম এ নামের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হল। এই নতুন গায়িকার কণ্ঠে এ কি অপরূপ সুরের লীলা!

সে আসরে উপস্থিত ছিলেন—বহুমুখী সঙ্গীত-প্রতিভাবান্ কৃষ্ণচন্দ্র দে এবং কবি, সুরকার ও গীতরচয়িতা কাজী নজরুল ইসলাম। আরও অনেক গুণীই উপস্থিত ছিলেন এবং গায়িকার গানে মুগ্ধ হয়েছিলেন সকলেই। কিন্তু বিশেষ করে কৃষ্ণচন্দ্র এবং কাজী সাহেবের নাম উল্লেখ করবার কারণ—তাঁরা গানের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন সবচেয়ে বেশি। দিনের আসর শেষ হয়ে গেলেও তাঁরা দুজন আর বাড়ি ফিরে গেলেন না। বড়াল বাড়িতেই রইলেন সারাদিন। দুপুরের বিশ্রামাদির পর বিকালে ঘরোয়াভাবে, অর্থাৎ আসরের বাইরে শুনতে লাগলেন মুস্তারি বাঈয়ের গান। দোতলার একটি ঘরে বসে রাগের পর রাগ ফরমায়েশ করে তাঁরা তাঁর গান শুনতে লাগলেন এবং গায়িকাও অক্লান্তভাবে তাঁদের অনুরোধে একটি একটি করে গান শুনিয়ে গেলেন। তেমনি হৃদয়স্পর্শী, তেমনি আকর্ষক কণ্ঠে দরদী শ্রোতৃদ্বয়কে তিনি গান শোনালেন। কাজী নজরুল এবং কৃষ্ণচন্দ্র বার বার জানালেন, এমন কণ্ঠমাধুর্য সত্যই দুর্লভ। এমন সঙ্গীতের অভিজ্ঞতা কদাচিৎ লাভ হয়ে থাকে।

সকালবেলার লালচাঁদ উৎসবে গায়িকার সেই গান বেতার-যোগে 'রীলে' করা হয়েছিল যথারীতি।

তার পর তাঁর গানের অনুষ্ঠান আবার আরম্ভ হল সেই রাতে, উৎসব-প্রাঙ্গণে। সেখানে উপস্থিত গুণীদের মধ্যে ফৈয়াজ খাঁ, মুস্তাক হোসেন খাঁ, তাঁর ভ্রাতা আসফাক হোসেন, মজিদ খাঁ, হরিশচন্দ্র বালী, বসির খাঁ, গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, এনায়েৎ খাঁ, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী প্রভৃতির নাম উল্লেখ্য। কাজী সাহেব এবং কৃষ্ণচন্দ্রের উপস্থিতির কথা বলাই বাহুল্য।

মুস্তারি বাঈ বিশিষ্ট শ্রোতাদের দিকে সেলাম করে আসরে আসীনা হলেন। কৃশ এবং প্রায় শীর্ণ শরীর, আদৌ সুরূপা নন গায়িকা। আকৃতিতে ব্যক্তিত্বের কোন চিহ্ন নেই। তাঁর সেই সকালের আসরের পর গুণীমহলে খ্যাতি রটনা হতে কিছু বাকি ছিল না। তাই এ আসরের শ্রোতারা সাগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন তাঁর গানের। শান্ত, ধীর কণ্ঠে তখন তিনি গান আরম্ভ করলেন।

গানের সুরের মধ্যে দিয়ে তাঁর সাঙ্গীতিক প্রভাব অনুভূত হল আসরে, শ্রোতাদের মনে। সে এক আশ্চর্য সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর। প্রথম গানটি তিনি ধরলেন পটদীপ রাগে। শ্রোতাদের মন আপ্লুত হয়ে উঠল সেই কণ্ঠমাধুর্যে। মাধুর্য-মণ্ডিত সুরের গুঞ্জরণে রাগরূপ তার মনোহর দলগুলি মেলতে লাগল। ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে উঠল সঙ্গীতের শতদল। আসর সুরে ভরে গেল।

কিন্তু রাগের রূপায়ণ বা তাল-লয়ের প্রয়োগ যথাযথ হল কি না সেদিকে

শ্রোতাদের মন আকৃষ্ট হল না। যদিও সে-সব বিষয়ে গায়িকার স্বচ্ছন্দ নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছিল। গানের গঠনশৈলীর কথা কারও মন অধিকার করতে পারলে না। সকলে অনুভব করতে লাগলেন এক অপার্থিব সুরবিহার। গায়িকার কণ্ঠের পাখায় ভর করে এক অনির্বচনীয় আনন্দলোকের আবির্ভাব হল। গানের কারুকৃতির চেয়ে গায়িকার কণ্ঠের অপূর্ব দরদ, তাঁর গভীর অনুভব বড় হয়ে দেখা দিলে শ্রোতাদের মনে। সেই মাধুর্যময় কণ্ঠে সুরের সুষমা 'শিক্ষিত' ও 'অশিক্ষিত' সর্বস্তরের শ্রোতাদের পক্ষেই মনোমুগ্ধকর। সেই সঙ্গে সঙ্গীত পরিবেশনের যথার্থ শিল্পীজনোচিত রীতি। সৌকুমার্যে-ভরা সুরবিহারের সঙ্গে তদ্‌গত-চিত্ত গায়িকার অন্তর মথিত করে সুরের নির্ঝরিণী প্রবাহিত হল। সুরের এক-একটি মনোরম মোচড়ে যে ব্যঞ্জনা ফুটে উঠতে লাগল তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। সুরশিল্পীর প্রাণের আবেগ তাঁর গানের মধ্যে মূর্ত হয়ে শ্রোতাদের মনে সঞ্চারিত হল। তরঙ্গের পর তরঙ্গশ্রেণী যেমন কলতান তোলে তটপ্রান্তে।

একে তো পটদীপ রাগের মধ্যেই একটি ক্রন্দনপরতার ভাব আছে। তার সঙ্গে যুক্ত হল গায়িকার হৃদয়স্পর্শী স্বর।

নিজেরই রচিত সুরের আবেদনে, স্পন্দিত হৃদয়ের আবেগে শিল্পীর চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। সঙ্গীতের মায়াস্পর্শে এমন তন্ময় শিল্পী বেশি আসরে দেখা যায় না।

পটদীপের গানখানি শেষ হল উচ্ছ্বসিত প্রশংসার মধ্যে। তার পর গায়িকা একটি মালগুঞ্জি ধরলেন। তেমনি অনন্য-দৃষ্টি, তেমনি আত্মনিমগ্ন হয়ে গাইতে লাগলেন তিনি।

পটদীপের পর মালগুঞ্জি আরম্ভ হতে বিশিষ্ট শ্রোতৃবর্গ নড়ে-চড়ে বসলেন। মালগুঞ্জির প্রথম সুর বিচ্ছুরণের সঙ্গেই সাড়া পড়ে গেল আসরে। এই জমাটি সুর শ্রোতাদের মন অধিকার না করেই পারে না। আবার সকলে গায়িকার সুরের ধারায় অবগাহন করতে লাগলেন। সমস্ত আসর যেন সুরের স্নিগ্ধ ঝর্ণাতলায় বসে মালগুঞ্জির কোমল কান্ত রস আস্বাদন করতে লাগল মুস্তারি বাঈয়ের মধুকণ্ঠে। গায়িকার গীতিকণ্ঠের এই বৈশিষ্ট্য সমঝদারেরা লক্ষ্য করলেন যে, তা গভীর হৃদয়াবেগে পূর্ণ, অতিশয় সুরেলা ও সুমিষ্ট এবং তাঁর গীতিরীতি অনিন্দ্য শিল্প-সুন্দর (artistic)।

সে গান এক সুসমঞ্জস সৌন্দর্য-সৃষ্টি। পূর্ণবিকশিত শিল্পী প্রাণের অবদান। সুরশিল্পীর সঙ্গীত-মানস যে সুর-সুন্দরের সাধনায় পরিপূর্ণতা লাভ করেছে,

তা-ই অনুবাদিত হয়েছে তাঁর এই সঙ্গীতে। তাই এমন ভাবের ব্যঞ্জনা দেখা দিয়েছে। গান তাই এমন প্রাণ পেয়েছে। শ্রোতাদের মনোবীণায় ঝঙ্কৃত হয়েছে এমন অনুরণন।

এইভাবে প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে তাঁর গান হল। গান শেষ হতে ঘড়ি দেখে বোঝা গেল, এতখানি সময় তিনি গাইলেন। কিন্তু যতক্ষণ গান চলেছিল, সেকথা জানা যায় নি! আচ্ছন্ন, একমুখী হয়ে শুনেছিলেন সবাই, সময়-জ্ঞান কারও ছিল না।

মালগুঞ্জি গেয়ে মুস্তারি বাঈ তাঁর অনুষ্ঠান শেষ করলেন। এবং তার পরই ধারণা করা গেল, তাঁর গানের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া কেমন হয়েছে। শুধু সাধারণ শ্রোতাদের ওপর নয়, সেখানে উপস্থিত বিখ্যাত কলাবতদের ওপরেও।

কারণ তখন এক সমস্যা হল—এই গানের পর কার গান হবে? শ্রোতাদের মনপ্রাণ এমন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে আছে, আসর এমন মাত হয়ে আছে মালগুঞ্জির সুরনিক্বণে—তা অতিক্রম করে কে সেখানে গান ধরবেন? এই জ্বলে-যাওয়া আসরকে আবার নতুন করে মাতাবেন কে? এই প্রশ্ন উদ্‌যোক্তাদের ভাবিত করলে।

শেষে কয়েকজন গুণীর সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির হল যে, ফৈয়াজ খাঁ সাহেব তাঁর অনুষ্ঠান এখন আরম্ভ করলেই বোধ হয় সবচেয়ে ভাল হয়। ফৈয়াজ খাঁকে সেই মর্মে যথারীতি অনুরোধও জানানো হল গাইবার জন্যে।

ফৈয়াজের তখন মধ্য বয়স এবং সঙ্গীত-প্রতিভার মধ্যগগনে তিনি তখন সগৌরবে দেদীপ্যমান। 'আফ্‌তাব-এ মুসিকী'—হিন্দুস্থানের সূর্য তিনি সঙ্গীতক্ষেত্রে। তাঁর জোয়ারিদার উদাত্ত কণ্ঠ একাধারে বীর্য ও মাধুর্য মণ্ডিত। এই আসরে সুরের আসন যদি তখন কেউ আবার পাততে পারেন, তবে তা তিনিই। এই আশায় তাঁকে গাইতে অনুরোধ করা হল।

ফৈয়াজ খাঁ যত বড গায়ক, তত বড় সমঝদারও। একজন প্রকৃত সঙ্গীত-শিল্পী, সঙ্গীতসাধক তিনি। তাঁর মনে মুস্তারি বাঈয়ের গানের প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল, তা উদ্‌যোক্তারা ধারণা করতে পারেন নি। তিনি স্বয়ং তা প্রকাশ করলেন গায়িকাকে অভিনন্দিত করে।

তাঁকে আসরে গাইতে বলার উত্তরস্বরূপ তিনি মুস্তারি বাঈয়ের গান সম্পর্কে বললেন, আমাকে আজ আপনারা গাইতে বলবেন না। এ গানের পর আমার আর গানের মেজাজ নেই। এ গানের পর আজ আর কোন গান দরকারই নেই। আমি অন্ততঃ এ আসরে এখন গাইতে পারব না। আর কারও যদি সে হিম্মত থাকে, তা হলে সে বসুক এসে আসরে।

উদ্‌যোক্তারা খাঁ সাহেবের কথায় অপ্রস্তুত হ্লেন। এর পর আর কি কথা তাঁকে বলা যেতে পারে? কলাবতের পক্ষে তিনি চূড়ান্ত কথা বলে দিয়েছেন। আর তাঁকে অনুরোধ করা যায় না।

অন্য ওস্তাদেরা প্রথমে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। তারপর স্পষ্টই জানালেন যে, এ বিষয়ে তাঁরা ফৈয়াজ খাঁর সঙ্গে একমত। এ গানের পরে তাঁদের কারও আর গান গাইবার ইচ্ছা নেই। কারণ আজ আর তাঁরা গান জমাতে পারবেন না এ আসরে।

এই সব কথার মধ্যে মুস্তারি বাঈ উঠে এসেছেন ফৈয়াজ খাঁ-র কাছে। খাঁ সাহেবের পায়ে হাত রেখে তিনি সবিনয়ে বললেন, এ কি কথা বলছেন, খাঁ সাহেব? আমার গানের জন্যে গান গাইবেন না আপনি? আমি বড় দুঃখ পাব আপনি না গাইলে। আপনার কাছে আমি কি? আপনার তুল্য গুণী পথ দেখিয়েছেন, তাই আপনাদের আশীর্বাদে আমরা করে খাই। আপনি এমন করে বলবেন না।

খাঁ সাহেব বললেন, সে যা হোক, কিন্তু আমার হাল তো দেখছ! তোমার গান শুনে চোখের জল আমি আটকাতে পারি নি। এতক্ষণ শুধু কেঁদেছি। আমার গলা বসে গেছে কেঁদে কেঁদে। আমি 'বেচাঁই' হয়ে গেছি। গান গাইব কি? তা ছাড়া, এ শুধু গানেরই কথা নয়। এখানে যন্ত্রী যাঁরা রয়েছেন, তাঁরাও কি এর পর বাজাতে পারবেন যন্ত্র ধরে? আমার তো মনে হয় না। ওঁদের জিজ্ঞেস করে দেখা হোক।

এ কথার পর ফৈরাজ খাঁকে আর মুস্তারি বাঈ বা উদ্‌যোক্তাদের আর কেউ গাইতে অনুরোধ করলেন না। তবে তাঁর কথায় বীণ্‌কার মজিদ খাঁ এবং সেতারী এনায়েৎ খাঁকে অনুরোধ করা হল বাজাবার জন্যে। কিন্তু তাঁরাও সম্মত হলেন না। সুর-সৃষ্টির চূড়ান্ত হয়ে গেছে আজ। এ আসরে আর কোন গুণীর বাজাতে বা গাইতে মেজাজ বসতে পারে না।

মুস্তারি বাঈয়ের গানের পর আসরে যখন এইসব কথাবার্তা চলেছে, তখন আর একটি ঘটনা ঘটেছে তাঁর গান উপলক্ষে।

তাঁর সেই রাতের গানও কলকাতা বেতারকেন্দ্র মারফত 'রীলে' করা হয়েছিল এবং সেই সূত্রে মুস্তারির গান বেতার শ্রোতাদের কর্ণগোচর হয়।

রবীন্দ্রনাথ তখন কলকাতায় অবস্থান করছিলেন এবং বেতারে তিনিও শোনেন গায়িকার সেই গান। আসরে মুস্তারি বাঈয়ের গান শেষ হবার কিছুক্ষণের মধ্যেই উৎসব বাড়ির টেলিফোন বেজে উঠল। ফোন ধরতে, তার

অপর প্রান্ত থেকে শোনা গেল—রবীন্দ্রনাথ এখানে একবার কথা বলতে চান রাইচাঁদবাবুর সঙ্গে। তাঁকে একবার ডেকে দিন।

রাইচাঁদ এসে রিসিভার নিয়ে পরিচয় দিলেন, ও-প্রান্ত থেকে যিনি যোগাযোগ করেছিলেন, তিনি এবার ফোন দিলেন রবীন্দ্রনাথকে।

বিশ্ববন্দিত কণ্ঠস্বর যন্ত্রে ভেসে এল—কে এই দেবী, যিনি এখন তোমাদের ওখানে গান গাইলেন ?

তাঁকে জানান হল, গায়িকার নাম-ধাম পরিচয়-কথা।

শুনে রবীন্দ্রনাথ বললেন—এ তো অপূর্ব কণ্ঠ। এমন গান বিশেষ শোনা যায় না। আমি অভিভূত হয়েছি এঁর গান শুনে। আর একদিন আমি ভাল করে শুনতে চাই, সামনে বসে। কিভাবে তা হতে পারে, একটু ব্যবস্থা কর।

—সেজন্যে কোন অসুবিধা হবে না। গায়িকাকে একদিন আপনার ওখানে নিয়ে গিয়ে আপনাকে গান শোনান যেতে পারে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। শীগ্‌গিরই এ ব্যবস্থা করা হবে।

কয়েকদিন পরে রবীন্দ্রনাথকে গান শোনাবার জন্যে মুস্তারি বাঈকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবার কথা হল।

রবীন্দ্রনাথকে গান শোনাবার কথা স্থির হবার পর রাইচাঁদবাবুদের মনে এল আর একটি কথা। কবির যখন এই গায়িকার হিন্দুস্থানী গান এত ভাল লেগেছে আর তিনি যখন এঁর গান আর একদিন সামনে বসে শুনবেন, তখন কবির নিজের গানও তাঁকে সেই সঙ্গে শোনাবার ব্যবস্থা করলে কেমন হয় ? মুস্তারি বাঈ যদি রবীন্দ্র-সঙ্গীত গান করেন, কবি নিশ্চয় আনন্দ পাবেন।

তখন স্থির হল, গায়িকা রবীন্দ্রনাথকে তাঁরই দুখানি গান শোনাবেন। বলা বাহুল্য, আগ্রা অঞ্চলের বাসিন্দা এবং হিন্দুস্থানী পেশাদার গায়িকা আগে রবীন্দ্রনাথের বা অন্য কোন বাংলা গান গান নি কখনও। বাংলা ভাষাও তাঁর একরকম অজানা। এবং বাংলাদেশে, কলকাতায় এই তাঁর প্রথম আসা। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের গান তাঁকে নতুন করে শিখতে হবে। শুধু তাই নয়, সে গান যেমন-তেমন গাইলে চলবে না, কারণ শুনবেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। নিখুঁতভাবে আয়ত্ত না করে তাঁর গান তাঁকে শোনান চলবে না। এ বিষয়ে কোন ত্রুটি থাকলে সমস্ত আয়োজনই পণ্ড হবে।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের একটি বিশিষ্ট মেজাজ ও প্রকৃতি আছে। সেই বিশেষভাবে না গাইলে তার রূপ সঠিক থাকে না। রবীন্দ্রনাথ নিজেও পছন্দ করেন না তাঁর সুর বা গীতিরীতি বিচ্যুত করলে। রবীন্দ্র-সঙ্গীত কবিকে শুনিয়ে সন্তুষ্ট

করা তাই সহজ কাজ নয়। একাধিক লব্ধপ্রতিষ্ঠ গায়ক রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশনে ব্যর্থ হয়েছেন, বলা যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের গান শুনে আনন্দ পান নি, বরং মনঃক্ষুন্ন হয়েছেন তাঁর গানের ক্ষুন্নতা দেখে। বলেছেন—"কেমন যেন ধাক্কা দিয়ে দিয়ে·গাইলে।"···কিংবা—"আমার গানের ওপর দিয়ে অমন করে 'স্টীম রোলার' চালিও না।"

মুস্তারি বাঈকে সেজন্যে রবীন্দ্রনাথের গান বিশেষভাবে শেখাবার ব্যবস্থা রাইচাঁদবাবু করলেন হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগিতায়। হরিপদবাবু ছিলেন তখনকার একজন সুকণ্ঠ গায়ক এবং বিশেষ করে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের নিষ্ঠাবান শিল্পী। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের শুধু স্বরলিপি অনুসরণ নয়, তার গায়কী যথাযথ রূপায়িত করতেন যাঁরা, শ্রীচট্টোপাধ্যায় ছিলেন তাঁদের অন্যতম। বড় প্রাণস্পর্শী ছিল তাঁর গান।

মুস্তারি বাঈয়ের কণ্ঠে দুখানি রবীন্দ্রনাথের গান তুলতে সহায়তা করলেন তাঁরা দুজন—হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ও রাইচাঁদ বড়াল, যিনি শুধু ওস্তাদ মসিদ খাঁর কাছে তবলা শিক্ষাপ্রাপ্ত উদীয়মান তবলা-বাদক তখন নন, রাগ-সঙ্গীতে অভিজ্ঞ এবং সুরকারও। তাঁরা দুজনে গায়িকাকে যথাক্রমে শেখালেন—আজি দখিন দুয়ার খোলা এবং মন্দিরে মম কে (আড়ানা), এই গান দুখানি।

উত্তর প্রদেশের সেই গায়িকার পক্ষে রবীন্দ্রনাথের দুটি গান আয়ত্ত করা সহজ ছিল না। এ খেয়াল গান নয় যে রাগের রূপায়ণে বিচিত্র তানকর্তবে পূর্ণ সুরসৃষ্টির ধারায় সঙ্গীতের চরমোৎকর্ষ দেখাবেন। ভিন্ন প্রদেশের ভাষায় রচিত এই কাব্যসঙ্গীতের অর্থ ও তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা চাই। তার মর্মের সন্ধান ও পরিচয় লাভ করা প্রয়োজন। এ কাব্য-সঙ্গীতে কথা ও সুরের মোহন-মিলন ঘটেছে। দুয়েরই সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গী, কোন একটির গুরুত্ব কম নয়। কোন একটিকে উপেক্ষা করবার নেই। সুর ও ভাব, সঙ্গীত ও কাব্য এখানে বর-বধূর মতন একাত্ম, গ্রন্থিযুক্ত। পরস্পরের সহযোগিতাতেই তারা সঙ্গীতকে সার্থক ও রসসিদ্ধ করবে। কেউ কারও অধীন নয়, কিন্তু অপরের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করেও স্বাধীন নয় কেউ। সুসঙ্গত পরিমিতি বোধ এবং সুসমঞ্জস সৌন্দর্যসৃষ্টি কথা ও সুরের সানন্দ সম্মেলনে। বাংলার মহান কবি-সুরকারের এই সঙ্গীতধারার সঙ্গে হিন্দুস্থানী গায়িকার আগে কোন পরিচয় ছিল না। গানের ভাবের আবেদনকে সুরের ব্যঞ্জনায় ফোটাতে হলে সে ভাষায় অভিজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন এবং সেখানেই তাঁর প্রধান বাধা।

কিন্তু মুস্তারি বাঈ সত্যকার সঙ্গীতশিল্পী এবং জাত-শিল্পী। ললিতকলার

স্বভাববোধ থেকে তিনি সেই বাধা অতিক্রম করলেন। গান দুটি শেখবার সময় প্রশ্ন করে করে প্রত্যেকটি কথার অর্থ ও মর্ম জেনে নিলেন। তার পর সমগ্র গানের বক্তব্য বুঝে নিয়ে অনুভব করলেন তার অন্তর্নিহিত ভাবটি। গান দুটির সুর আত্মস্থ করা অবশ্য কঠিন হল না তাঁর পক্ষে। দ্বিতীয় গানটি তো খেয়াল অঙ্গেরই।

এমনিভাবে তিনি 'আজি দখিন দুয়ার খোলা' এবং 'মন্দিরে মম কে আসিল হে' গান দুখানি কণ্ঠে প্রস্তুত করলেন কবিকে শোনাবার জন্যে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আর সে গান শোনা হল না। মুস্তারি বাঈ আর সুযোগ পেলেন না তাঁকে শোনাবার। রবীন্দ্রনাথকে গান শোনাবার দিন ও সময় ধার্য করতে গিয়ে শোনা গেল যে, তিনি হঠাৎ জরুরী প্রয়োজনে শান্তিনিকেতনে চলে গেছেন। তখন শান্তিনিকেতনে গিয়ে তাঁকে গান শোনান আর সম্ভব হল না গায়িকার পক্ষে। এ প্রসঙ্গের অকস্মাৎ এইভাবেই ছেদ পড়ল।

এত যত্নে ও আগ্রহে গান দুটির অনুশীলন করবার পর কবিকে তা শোনাবার সুযোগ না পেয়ে গায়িকা হতাশ বোধ করলেন। এবং যাঁরা গান শিখিয়েছিলেন তাঁরাও।

তার পরে স্থির হল যে, রবীন্দ্রনাথকে তাঁর গান শোনান না যাক, কলকাতায় সাধারণের জন্যে একটি সঙ্গীতাসরে মুস্তারি বাঈয়ের একদিন অনুষ্ঠান হোক। কলকাতার বৃহত্তর সঙ্গীতপ্রিয় সমাজ তা হলে গায়িকার গুণপনার পরিচয় লাভ করবে। সেই উদ্দেশ্যে বিশেষ করে তাঁর গানের জন্যে একটি জলসার আয়োজন করা হল স্টার থিয়েটারে।

স্টার মঞ্চের আসরে তাঁর গান শোনবার জন্যে অনেক সঙ্গীতশিল্পী ও সঙ্গীতজ্ঞকে আমন্ত্রণ করে আনা হল। আর বিশেষ করে এলেন কলকাতার তওয়ায়েফ সম্প্রদায়। তাঁদের সকলের নাম করবার প্রয়োজন নেই এবং নাম করা সমীচীনও নয়। কারণ, এই নবাগতার গান শোনবার পরে তাঁরা প্রায় কেউই তাঁকে সুনজরে দেখেন নি। গহর জান্ তখন সঙ্গীতের আসর থেকে অবসর নিয়েছিলেন, তিনি উপস্থিত হন নি এখানে। তা ছাড়া কলকাতার খ্যাতনাম্নী তওয়ায়েফরা মুস্তারি বাঈয়ের সেদিনের গানের আসরে প্রায় সকলেই কৌতূহলী হয়ে এসেছিলেন। কয়েকদিন আগেই লালচাঁদ উৎসবে তাঁর অসাধারণ সাফল্যমণ্ডিত সেই আসরের কথা মুখে মুখে তাঁদের অনেকেরই কানে পৌঁছেছিল।

স্টার থিয়েটারে সেদিনকার সমবেত শ্রোতাদের মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র দে, কাজী

নজরুল প্রভৃতিও ছিলেন। কলকাতার সঙ্গীত-রসিক সমাজে ইতিমধ্যে গায়িকার লালচাঁদ উৎসবে গুণপনার কথা ভালভাবেই প্রচারিত হয়ে গেছে, কারণ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন সে আসরে। সুতরাং বিশেষ করে সেই গায়িকার জন্যেই স্টারে যে সঙ্গীতানুষ্ঠান, সেখানে শ্রোতৃবর্গের বিপুল সমাগম হল।

সেই পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে মুস্তারি বাঈ গান আরম্ভ করলেন। প্রথমে ধরলেন খেয়াল। তেমনি দরদী কণ্ঠে সুরের আলপনায় রাগরূপ বিকশিত করতে লাগলেন। তদ্‌গত চিত্তে গাওয়া তাঁর সেই মাধুর্যময় স্বরে গান অন্তর স্পর্শ করল শ্রোতৃমণ্ডলীর। লালচাঁদ উৎসবে যেমন সার্থক হয়েছিল তাঁর সঙ্গীত, এখানেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটল। এখানেও তেমনি মন্ত্রমুগ্ধ করলেন শ্রোতাদের।

বরং এক হিসাবে তার চেয়েও বেশি। কারণ, খেয়াল শেষ করে তিনি আসরে আরম্ভ করলেন রবীন্দ্র-সঙ্গীত। অপ্রত্যাশিত আনন্দে শ্রোতা-সাধারণের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে গেল। কলকাতার আসরে নবাগতা এবং প্রায় অপরিচিতা এই হিন্দুস্থানী শিল্পীর কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গান হঠাৎ শুনে বিস্ময়ের সীমা রইল না সকলের। এ কি আশ্চর্য ঘটনা!

কাজী সাহেব এবং কৃষ্ণচন্দ্র উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন গায়িকাকে রবীন্দ্রনাথের গান আরম্ভ করতে শুনে। বিস্মিত পুলকে তাঁরা শুনতে লাগলেন কলাবতী খেয়াল-গায়িকার কণ্ঠে 'আজি দখিন দুয়ার খোলা' এবং 'মন্দিরে মম কে আসিল হে।' আর তাও এমন হৃদয়গ্রাহী ধরনে! অবশ্য বাংলা উচ্চারণে কিছু ত্রুটি আছে। 'অ-কার' জাতীয় উচ্চারণে কিছু পার্থক্য লক্ষণীয়। কিন্তু কলকাতার আসরে এবং তাঁর জীবনে প্রথম বাংলা গান পরিবেশনরতা হিন্দুস্থানী গায়িকার পক্ষে সে ত্রুটি নিশ্চয় মার্জনীয়ও! এবং যে অনায়াস-নৈপুণ্যে গাইছেন, তাতে গানের কোন হানি ঘটে নি, বরং তার সৌন্দর্য অতিশয় উপভোগ্য হয়েছে। প্রকৃত শিল্পীর উপযুক্ত এই উপস্থাপনা। কারণ, রবীন্দ্রনাথের গান শুধু নির্ভুলভাবে গাওয়া নয়, তার সঙ্গে মিলেছে গায়িকার নিজস্ব অনুভব। সেই গান দুটি সেজন্যে তার কাব্যের সুষমা ও সুরের কমনীয়তায় (বিশেষ 'আজি দখিন দুয়ার খোলা' গানটি) রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মর্মগ্রাহী শ্রোতাদের পরিতৃপ্ত করলে।

সে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার কথা। রবীন্দ্রনাথের গানের এত ব্যাপক প্রচলন ও জনপ্রিয়তা তখন কলকাতায় হয় নি। তাই একজন হিন্দুস্থানী খেয়াল-গায়িকার কণ্ঠে কবির দুখানি গান এমন সুচারুভাবে গীত হতে শুনে সেদিন অনেক শ্রোতাই অপরিসীম বিস্ময় বোধ করেছিলেন, আনন্দের সঙ্গে।

আর সেই তওয়ায়েফদের মধ্যে সেদিন প্রতিক্রিয়া হয়েছিল আর একরকম। এ গায়িকার গান তাঁদের ভাল লেগেছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু সে ভাল লাগার ফলে তাঁদের মনে অবিমিশ্র আনন্দ জাগে নি। সমব্যবসায়িনী সেই নারীদের অনেকের মধ্যে কিঞ্চিৎ অসূয়ার উদয় হয়েছিল, শোনা যায়। তাঁদের নাকি ভাবনা হয় যে, আগ্রা থেকে এই গায়িকা যদি কলকাতায় এসে অধিষ্ঠান করেন, তা হলে তাঁদের প্রতিষ্ঠার পক্ষে হানিকর হবে।—এমন কণ্ঠ! উপরন্তু বাংলা গান পর্যন্ত শিক্ষা হয়েছে এরই মধ্যে!

সেবার আর মুস্তারি বাঈ কলকাতায় বেশিদিন না থেকেই আগ্রায় ফিরে গিয়েছিলেন। তার দুবছর পরে আবার তাঁকে কলকাতায় আনবার ব্যবস্থা করেন লালচাঁদ উৎসবের উদ্‌যোক্তারা। এবার তাঁর গান গ্রামোফোনে রেকর্ড করবারও আয়োজন হয়।

উৎসবের সঙ্গীতাসরে যোগ দেবার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়ে যথাসময়ে লিপি যায় তাঁর কাছে। কিন্তু উত্তরে তাঁর সেই কোঠি থেকে টেলিগ্রাম আসে—মুস্তারি বাঈ আর ইহলোকে নেই। তাঁর যক্ষ্মারোগে মৃত্যু ঘটেছে!

সমাপ্ত